আত্মপ্রকাশ

সকালবেলা পরিতোষ এসে বললো, এসব আপনারা কি আরম্ভ করেছেন? সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত !

তখনও দ্বিতীয় কাপ চা খাওয়া হয় নি। খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে বারবার ভুলে যাচ্ছি। চোখ দুটো আঠার মতন। এই রকমই হয়, দিনের প্রথম চোখ মেলেই দুটো ইচ্ছে জাগে, খাটের নিচ থেকে জলের গ্লাশটা টেনে ঢকঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে শেষ করা, যতবারই জল খাই মনে হয়, আঃ, জলই তো জীবন, কত রকম পানীয়ই তো চেখে দেখলুম, কিন্তু সকালবেলার জলের মতন এমন চমৎকার স্বাদ আর কিছুতে পাই নি। — তারপরই খবরের কাগজের জন্য মন ছটফট করে। কিন্তু তখনও ঘুমে মুখ জড়ানো, চোখ আঠা, মাথা ঝিমঝিমে, প্রথম পাতা শেষ করে সাতের পাতায় গিয়ে আবার প্রথম পাতাটা ভুলে যাই। মনে হয়, আজকের প্রধান খবরটা কী ? প্রধান খবর জানতে গোড়ার দিকে ফিরে এসে ততক্ষণে ফের ঝিমুনি এসে যায়।

বারান্দা থেকেই পরিতোষকে আসতে দেখেছিলাম। অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ছাতা মাথায় পরিতোষ বকের মতো পা ফেলে ফেলে আসছিল।

আমি জোর করে চোখ খুলে রেখে বললুম, ব্যাপারটা কি ?

— কাল রাত্তিরে আপনারা কোথায় ছিলেন ?

আমি পরিতোষকে তেমন পছন্দ করি না। বন্ধুর ছোট ভাইরা যে-রকম সাধারণত হয়ে থাকে, ভদ্র ও বিনীত, কচি—পরিতোষ তার থেকে আলাদা নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কেউ ইকনমিক্স-এ এম.এ. পড়ে এবং যদি ভালো ছাত্র হয়, তবে সে তার দাদার বন্ধুদের কাছে এসে হঠাৎ চাপা অহঙ্কারী হয়ে যায়। এইটাই নিয়ম। পরিতোষের ধারণা, ওর অস্তিত্ব পৃথিবীর পক্ষে খুব উপকারী। আর আমরা, থাকলেও হয়, না থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সকালবেলা সবাইকেই ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয়। আমার ইচ্ছে হয়, পরিতোষকে খুব আন্তরিকভাবে যত্ন করি।

আমি বললুম, কাল রাত্তিরে ? কাল রাত দেড়টা পর্যন্ত নানা জায়গায় ছিলাম। তুমি কোন সময়টার কথা বলছো ?

পরিতোষ স্থিরচোখে আমার দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা সুরে বললো, দাদা কাল রাত্রে বাড়ি ফেরে নি !

শুনে আমার খুব অস্বস্তি হলো। সকালবেলাতেই কেন অপরের সমস্যা আসবে আমার কাছে ! এই তো এইটুকু সময়, সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা, এর মধ্যে খুব একা গুটিসুটি মেরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, খুব ইচ্ছে করে চেয়ার, খাট, বইয়ের আলমারি ও ঘুরন্ত পাখা সমেত নিজেকে ভালবাসতে। বুঝতে পারি জলের অপর নাম জীবন, মানুষ পৃথিবীতে বড় সুখে আছে। খুবই ইচ্ছে করে, পরিতোষ যা খুশি বলে যাক্, আমি গোপনে অন্যমনস্ক থাকি, আমি কিছুই শুনবো না। কিন্তু পরিতোষের গলার ক্ষুব্ধ অভিমান বাঁশির সুরের মতন নিরেট, উপেক্ষা করা যায় না। আমি বললুম, শেখর কাল ফেরে নি ? কেন ?

— আপনি জানেন না ?

— না, শেখরের সঙ্গে তো দু'তিন দিন আমার দেখাই হয় নি।

— তা হলেও আপনি আন্দাজ করতে পারবেন হয়তো, দাদা কোথায় গেছে।

— তুমি এত সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লে কেন ? এতক্ষণে হয়তো ফিরে এসেছে। কোথাও আটকে গিয়েছিল বোধ হয়।

— মা কাল সারা রাত ঘুমোন নি। ভোর থেকে আমায় তাড়া দিচ্ছেন খোঁজ করার জন্য।

— শেখর তো আগেও দু'একবার রাত্রে বাড়ি ফেরে নি। তাস-পাশা খেলায় মত্ত হয়ে ...। চিন্তা করার কিছু নেই।

— আপনি ভুল করছেন। বাড়ি না ফেরা দাদার পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু সহ্য করা মায়ের পক্ষে স্বাভাবিক হবে কি করে ? মা প্রত্যেকবারই দুশ্চিন্তা করবেন !

আমার সামান্য হাসি পেল। যেন আমিই রাত্রে বাড়ি ফিরি নি, পরিতোষ এমনভাবে বলছে যেন আমিই মাকে কষ্ট দিচ্ছি। অথবা আমিই শেখরের বাড়ি না ফেরার জন্য দায়ী। সকালবেলাতেই এরা এমন যুক্তি সাজিয়ে কথা বলে কী করে ? ইকনমিক্স পড়লে বোধ হয় সবই পারে, ওর গলায় অবিকল ইকনমিক্সের ছাত্রসুলভ গাম্ভীর্য, পৃথিবীর উপকার করার জন্য জন্মেছে তো ! আমরা তো, থাকলেও হয়, না থাকলেও ক্ষতি নেই ! শেখরের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দেবো কিনা বুঝতে পারি না। শেখরের রাত্রে বাড়ি না-ফেরা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ? শেখর একটা দশাসই জোয়ান, পকেটে টাকাও থাকে প্রায়ই, মাথাখানা এমন যে ময়দানের যে-কোনো টুকরো যে-কোনোদিন নিলামে বিক্রি করে দিতে পারে, খাল দেখে কোনোদিন নদী বলে ভুল করবে না, সে এক রাত্তির বাড়ি ফেরে নি, তাই নিয়ে আবার দুশ্চিন্তা! তা হলে তো তিব্বতে কেন চিনি তৈরি হয় না, তা নিয়েও দুশ্চিন্তা করতে হয়। কিন্তু বন্ধুরা মানুষকে যে-রকমভাবে চিনতে পারে বাড়ির লোক তো তা পারবে না। একথা ঠিক। সকালবেলা আমিও তো যুক্তি বুঝতে পারি দেখছি ! সুতরাং আমি চিন্তিত ভঙ্গি করে বললুম, শেখর কাল কখন বেরিয়েছিল বলো তো ?

— রোজ যেমন হয় দশটার সময় খেয়েদেয়ে অফিসে গিয়েছে। বিকেলে তো কোনোদিনই বাড়ি ফেরে না, ফিরতে দশটা-এগারোটা। কাল ফেরে নি, কোনোরকম খবরও দেয় নি।

— তুমি প্রথমেই আমার কাছে এলে কি করে ? বরং —

— তাপসদার কাছে আগে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, আপনার কাছে খোঁজ নিতে।

এটা শুনেও আমার হাসি পাবার কথা। এই তা হলে নিয়ম, একজন আরেকজনের কাছে চালান করে দেবে। তাপস আমার কাছে পাঠিয়েছে, আমি ওকে অবিনাশের কাছে, অবিনাশ আবার পরীক্ষিতের। কিন্তু পরিতোষের জন্য আমার মায়া হলো। ছাতাটা পাশে মুড়ে রেখে চেয়ারে ঋজু

হয়ে বসে আছে। মুখে উদ্বেগের বদলে অভিমানই বেশি। যেন পরিতোষও জানে, শেখরের কিছুই বিপদ হয় নি, কিন্তু তার সেই বেপরোয়া নিয়ম-না-মানা ব্যবহার সে পছন্দ করছে না। আমি সাবধানে বললুম, নিশ্চয়ই হঠাৎ কোথাও আটকে গেছে। এতক্ষণে ফিরেও এসেছে বোধ হয়। যাই হোক, এর মধ্যে যদি না-এসে থাকে, তবে দুপুরে তুমি আমাকে অফিসে টেলিফোন করো। আমি বিকেলে খোঁজখবর করবো। তোমাকে এখন আর কোথাও যেতে হবে না, চা খাও।

— না, চা খাবো না, আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

— সত্যি, কয়েকদিন শেখরের সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি। শেখরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আলগা হয়ে গেছে ! তবে, বিকেলবেলা আমি খোঁজখবর নেবো।

— আপনাদের আড্ডাগুলোরই কোনো একটায় —

— সে সব জায়গায় আমি অবশ্য আজকাল প্রায় যাই-ই না।

— বিশ্বাস হয় না।

আমি একটু দুর্বলভাবে হেসে বললুম, তুমি জানো না পরিতোষ, এখন আমি অনেক বদলে গেছি।

পরিতোষের মুখ নিচের দিকে, ও বললো, কতটুকু সময়ে মানুষ কতটা বদলায় আমি জানি। সুনীলদা, জীবন নিয়ে আপনারা যে-রকম খেলা করছেন, তার সত্যিই কতটা মূল্য আছে, আমার সন্দেহ হয়।

— তুমি ছেলেমানুষ —

— খুব ছেলেমানুষ নই। আপনার চেয়ে মাত্র পাঁচ-ছ' বছরের ছোট হবো হয়তো।

— জীবনের এই সময়টায় পাঁচ-ছ' বছর কম সময় নয়। এক একটা বছর বড় লম্বা।

— আচ্ছা চলি। দুপুরে টেলিফোন করবো অফিসে।

— হয়তো তার দরকার হবে না। বাড়ি ফিরেই দেখবে শেখর ফিরে এসেছে। ফিরে এলেও আমাকে একটা টেলিফোন করে জানিয়ে দিও খবরটা।

পরিতোষ চলে যেতেই বৃষ্টিটা জোরে এলো এবং রকম দেখে মনে হয় সহজে থামবে না। অর্থাৎ, আজ আর কাচা ইস্ত্রি করা জামা পরা চলবে না। জুতোটা পালিশ করারও মানে হয় না, কারণ কাদা তো লাগবেই। সুতরাং কালকের ঘামের গন্ধঅলা জামা আর কাদামাখা জুতো পরে বেরুতে গেলে দাড়ি কামানোটা অনর্থক। অনেকগুলো কাজ বেঁচে গিয়ে হাতে বেশ সময় পাওয়া গেল। এইসব বৃষ্টির দিনে সাধারণত অনেক লোকের অফিসে না-যাবার শখ হয়। কিন্তু আমার অফিসে যেতে বড় ভালো লাগে আজকাল, চৌকো টেবিলের সামনে পা তুলে দিয়ে চা খাবার যে আনন্দ, তার তুলনায় বাড়িতে খাটে শুয়ে থাকা কিছুই না। কিছুদিন আগে অফিসে আমার একটা উন্নতি হয়েছে, হলঘরে সকলের সঙ্গে বসার বদলে এখন একটা ছোট ঘরে আর দু'জনের সঙ্গে বসি। টং টং করে বেল বাজালে বেয়ারা ঝরি সিং তখুনি হাজির, তাকে যা ইচ্ছে হুকুম করা যায়। লে আউট সেকসনের তিনটে লোক সরাসরি আমার অধস্তন, ওর মধ্যে বনমালীবাবু আমার ঠাকুরদার ছোট ভাইয়ের বয়েসী—সে লোকটাকে কথায় কথায় দাবড়াতে বেশ লাগে, একটু সুযোগ পেলেই বলি, চোখের মাথা খেয়েছেন, আর কতদিন কলম-তুলি চালাবেন ? এবার রামায়ণ-মহাভারত পড়ুন গে যান! — মানুষকে হুকুম করা কিংবা ধমকাবার মধ্যে যে মজা আছে তা আমি সদ্য পেতে শুরু করেছি।

তিনটে আন্দাজ সুবিমল এসে হাজির হলো। আর, তার একটু পরেই পরিতোষের টেলিফোন। ওঃ, শেখরের কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। পরিতোষের গলায় আশঙ্কা বা ভয়ের

লেশমাত্র নেই, বরং অভিমান আরও গাঢ়। বললো, দাদা এখনো ফেরে নি। আপনি কোনো খবর পেয়েছেন ?

আমি বললুম, দাঁড়াও, এক মিনিট। তারপর টেলিফোনের মুখটা চেপে সুবিমলকে জিজ্ঞেস করলুম, শেখরের কিছু খবর জানিস ?

— কি খবর ?

— তোর সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল ?

— না।

শেখর কাল রাত্রে বাড়ি ফেরে নি। আচ্ছা দাঁড়া —

আমি পরিতোষকে আবার বললুম, না। আমি তো কোনো খবর জানি না। ও কোনো খবরও পাঠায় নি বাড়িতে ?

— না। আমি দাদার অফিসে ফোন করেছিলুম, কাল দুটো আন্দাজ বেরিয়েছে অফিস থেকে। আজও কোনো খবর নেই। সমস্ত হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছি – সেখানে কিছু জানে না।

— থানায় খোঁজ নিয়েছিলে ?

— থানায় ? থানায় কেন ?

— নানা কারণে। যাক্‌গে, থানায় ও নিশ্চয়ই নেই। আমি দেখছি।

— মা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বারবার আপনার কথা বলছেন। দাদার বন্ধুদের মধ্যে মা তো আপনাকেই বেশি চেনেন !

— মাকে ভাবতে বারণ করো। আমরা তো আছিই। আমি এখুনি বেরুচ্ছি, দেখি, আমার মনে হয় ও বহরমপুরে অনিমেষের কাছেও যেতে পারে। মাঝে মাঝে তো যায় ওর কাছে— অফিসে ছুটি নেয় নি ?

— না।

— আচ্ছা, আমি দেখছি। যদি পারি, সন্ধের পর তোমাদের বাড়িতে যাবো একবার, ছেড়ে দিচ্ছি, অ্যাঁ ?

ফোন নামিয়ে আমি সুবিমলকে বললুম, শেখরের কী হলো বল তো ?

সুবিমল পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কান খুঁটছিল, বললো, কী আবার হবে, মাথায় আমবাত হয়েছে নিশ্চয়ই।

— তুই কাল চণ্ডীর দোকানে গিয়েছিলি ?

— হুঁ।

— শেখর ছিল না সেখানে?

— না।

— চল্ বেরোই, শেখরের একটু খোঁজ করা দরকার। অবিনাশ কিংবা পরীক্ষিৎ বোধ হয় জানে।

— অবিনাশ আর পরীক্ষিৎ কাল আমার সঙ্গে চণ্ডীর দোকানে ছিল। ওদের সঙ্গে শেখরের দেখা হয় নি।

— চল্ বেরুনো তো যাক্। আবার এক ঝঞ্ঝাট !

— বেরিয়ে কোথায় যাবি ?

— কে জানে ! চল, খড়ের গাদায় আলপিন খুঁজি গিয়ে।

সুবিমল চকিতে আমার ঘরের অন্য দুটো টেবিলের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললো, শেখরকে খোঁজার আগে চল একটু বিয়ার খেয়ে নি। ঠাণ্ডা মাথায় ওসব খোঁজা–ফোঁজা চলে না।

কত জায়গায় যেতে হবে খেয়াল আছে ?

আমি ততক্ষণে ড্রয়ারে চাবি বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। বললুম, এই বৃষ্টির দিনে বিয়ার ? তোর মাথা খারাপ !

সুবিমল সারা মুখ ভর্তি হেসে বললো, যা বলেছিস্ ! এই কথাটাই শুনতে চাইছিলুম, বৃষ্টির দিনে বিয়ার ভদ্দরলোকে খায় ! আজ একেবারে টিপিক্যাল হুইস্কি ওয়েদার।

— কে খাওয়াবে ?

— গৌরী সেন।

— আজ গৌরী সেন কে ?

— তুই হবি না বুঝতে পারছি। তা হলে চল অবিনাশের কাছে যাই।

দরজা দিয়ে বেরুবার মুখে বনমালীবাবু এলেন। হাতে ট্রেসিং পেপারে কয়েকটা ড্রয়িং, ভদ্রলোক কোনো বুড়ো মানুষ আঁকবার সময় সব সময় নিজের মুখটা আঁকেন। বললেন, মিঃ গাঙ্গুলি, আপনি চলে যাচ্ছেন ? সাইমন্‌স কোম্পানির কপিটা —

মুহূর্তে গলার রুক্ষ ভাবটা টেনে এনে বললুম, কাল প্রেস বন্ধ, আজ কপি নিয়ে হবেটা কি ? এতে আপনার কিছু করারও নেই, প্রেস টাইপ কম্পোজ করে বসিয়ে দিতে হবে। আপনি ড্রয়িংগুলো আমার টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে যান ! মিঃ মৈত্র ফিরে এসে আমাকে ডাকলে বলবেন, আমি রাইটার্স বিল্ডিং–এ গেছি। বুঝলেন ? জরুরি কাজে যাচ্ছি, বলতে ভুলবেন না।

মিঃ মৈত্র, অর্থাৎ আমার বড় জামাইবাবু, যাঁর দৌলতে আমি এই বিনা কাজের, মাঝারি মাইনের এবং মানুষকে হুকুম করার ও ধমকাবার অধিকার সমেত এই চাকরিটা পেয়েছি, মাঝে মাঝে তাঁর নামটা উচ্চারণ করে বেশ মনের জোর পাই। অফিসে আত্মীয়স্বজন থাকলেও একটা দূরত্ব রাখা উচিত, আমি সে সব গ্রাহ্য করি না, মাঝে মাঝে মিঃ মৈত্র না বলে ইচ্ছে করেই বলি, বড় জামাইবাবু। অ্যাকাউণ্টেণ্টের কাছে গিয়ে হয়তো কখনো বলি, বড় জামাইবাবুর ঘরের পাখাটায় ওরকম কিচকিচ করে শব্দ হয় কেন ? উনি কাজের লোক — এসব খেয়াল করেন না, আপনি তো একটা ব্যবস্থা করতে পারেন ! — এ আপিসের খোদ বড় সাহেবের আমি আপন শালা — আমার ওপর এখানে কথা বলে কোন্ শালা ? এই যে আমি মিঃ মৈত্রর নাম বললুম, এর ফলে বনমালীবাবুকে অফিসে বসে থাকতে হবে ছ'টা পর্যন্ত।

বৃষ্টিটা বিশ্রী ধরনের, দস্তা রঙের আকাশ, দেখলেই বোঝা যায় সারা বিকেল–সন্ধে এই রকমই টিপ্‌টিপ্ চলবে, জোর বর্ষণও হবে না, থামবেও না। সুবিমল জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি দেখলো। রিসেপসান কাউণ্টারের ইহুদি মেয়েটার দিকে আমি হালকা চোখ তুলে বললুম, মিস নাওমি, টেলিফোন এলে বলো, আমি আজ ফিরবো না। তুমি বিকেলের মেলগুলো সর্ট করে রেখো। তুমি তো কাল পরশু দু'দিনের ছুটি নিয়েছো, না?

— হ্যাঁ, একটু —

— ইস্, এ দু'দিন অফিসটা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা লাগবে !

মেয়েটা চিড়িক করে হেসে তৎক্ষণাৎ বললো, আপনি চলে যাচ্ছেন, আজ বিকেলটা আমারও ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।

আমি কাউন্টারের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বললুম, তাই নাকি ? তুমি ফ্রি আছো আজ? একটা ডেট হতে পারে ?

মেয়েটা তখনও ঠোঁটে হাসি চালিয়ে যাচ্ছে, বললো, না, মাত্র বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ফ্রি !

একটু বেঁটে, মুখে বসন্তের দাগ—কিন্তু ফর্সা রঙে মানিয়ে গেছে, হলদে রঙের চুল ও

মেয়েটার দু' চোখের রং দু'রকম। একটা চোখের মণি নীল, আর একটা কালো। আমার পিসিমার বাড়িতে একটা বেড়ালের এই রকম দু'রঙের চোখ দেখেছিলাম।

সুবিমল বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় পা দিয়ে বললো, মেয়েটাকে পাওয়া যায় ?

— চেষ্টা করে দেখছি।

— অরুণদের অফিসে একটা টেলিফোন অপারেটর ছিল, বাঙালি মেয়ে, সে অন্য রকম গলা করে অরুণকে প্রায়ই প্রেমের কথা শোনাতো।

— যাঃ, অরুণের বাজে গুল যত সব।

— না রে, আমি পুরো ব্যাপারটা জানি। অরুণ যখন একা থাকে, তখন মেয়েটা প্রথমে নীরস গলায়— অপারেটরদের গলা যেমন হয়,— বলে, মিঃ দাসগুপ্ত, হিয়ার ইজ এ কল্ ফর য়ু। তারপরই, একটু থেমে, অন্য রকম গলায়, হ্যালো, অরুণ, বলেই মিষ্টি হাসি। অরুণ বলে, কে ? তখন সেই রহস্যময় কণ্ঠ প্রশ্ন করে, আমায় চিনতে পারছো না ? অরুণটা তখন তো তো করে বলে, না, ঠিক, কে তুমি ? মেয়েটি তখন বলে, যদি চিনতে না পারো, তবে থাক্। এই বলেই লাইন কেটে দেয়। পরের দিনও আবার সেই রকম, আমায় চিনতে পারছো না ? অরুণটা পড়েছিল ফ্যাসাদে, টেলিফোনে গলার আওয়াজ একটু বদলে যায়, এখন কোন্ মেয়েকে অন্য কোন্ মেয়ের নাম বলে দেবে — সে এক কেলেঙ্কারী ! — দু'তিনদিন এ রকম চলার পর ও চোখ কান বুজে একদিন বলে ফেললো, তুমি কে, মালতী?

ওপাশ থেকে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস, তারপর, এতদিনে যা হোক চিনতে পারলে !

অরুণ বললো, মালতী, তুমি কানপুর থেকে কবে ফিরলে ? মেয়েটা বললো, তিন দিন ফোন করছি, তুমি আমাকে চিনতেই পারলে না, মাত্র এই ক'দিনে —। অরুণ বললো, মাত্র এই ক'দিন নয়, তিন বছর পর —। মেয়েটা বললো, তিন বছরেই বুঝি মানুষ সব ভুলে যায়— তারপর এই রকম চললো কয়েকদিন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, এখন কি অবস্থা ?

— শোন্ না মজা। অরুণ তখনও কিছুই বুঝতে পারে নি। অপারেটরের কথা ও চিন্তাও করে নি। টেলিফোনের রহস্য নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। একদিন এই রকম টেলিফোনের সময় আমি গিয়ে উপস্থিত। অরুণ আমাকে সব ব্যাপারটা খুলে বলে কাঁচুমাচুভাবে জিজ্ঞেস করলো, এখন কি করি বলতো ? আমি বললুম, মালতী তোর পুরানো বান্ধবী বুঝি ? তার সঙ্গে দেখা কর না ! অরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ভাগ্ শালা, আমি মালতী বলে কস্মিনকালেও কারুকে চিনি না। আমি বানিয়ে নাম দিলুম, আর ওপাশের মেয়েটাও মালতী সেজে গেল। এখন, কোন্ মেয়ের দায় পড়েছে, আমার সঙ্গে রোজ রোজ ইয়ার্কি করার বল তো ?

আমি বললুম, অরুণের নিজের বউ নাতো ?

— না, সেদিকটা চেক্ করা হয়েছে। অরুণের বউ একদিন দুপুরের শো-তে আত্মীয়দের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিল, সেদিনও টেলিফোন এসেছে। আর এদিকে ব্যাপারটাকে পুরো ঠাট্টাও বলা যায় না, এতদিন ধরে নিছক ঠাট্টা চালিয়ে যাওয়া, তা ছাড়া মেয়েটা যে-সব কথা বলে, তার মধ্যে কিছু বেশ নরম নরম ব্যাপার আছে। অরুণ কোনো চেনা অল্প-চেনা মেয়েকেই সন্দেহ করতে পারছিল না, তখন টেলিফোন অপারেটরের কথা আমারই মাথায় আসে। অরুণদের অফিসে দু'জন অপারেটর আছে, শিফট ডিউটি। এদের মধ্যে কোন্‌জন ? একজন কালো ধুমসী, আরেকটি বেশ ফর্সা ছিপছিপে। কালো ধুমসীটারই হবার চান্স বেশি, এরকম মেঘের আড়াল থেকে খেলছে যখন ! একদিন হাতে হাতে ধরে ফেললুম ! চল্, এত কাছাকাছি এসে গেছি, অবিনাশের কাছে যাবার আগে এক রাউন্ড খেয়ে যাই।

কথা বলতে বলতে আমরা ওয়েলিংটন থেকে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলা পর্যন্ত এসে গিয়েছি। বৃষ্টিতে এখন সর্বাঙ্গ ভেজা। অবিনাশের অফিস বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে, আরও অতটা হাঁটতে হবে। সুবিমলকে বললুম, আমার কাছে বেশি টাকা নেই রে।

— চল্ না। আমার কাছে দশ টাকা আছে। তোর কাছে কিছু হবে না ? আর, একটা কাজ করলেই তো হয় ! এতক্ষণ এ কথা ভাবি নি কেন ? তোর মাথায় একদম বুদ্ধি খেলে না ! অবিনাশের অফিস পর্যন্ত যাবার দরকারটা কী, ওকে টেলিফোন করে এখানে ডাকলেই তো মিটে যায় !

টেলিফোনে অবিনাশকে পাওয়া গেল। আমরা দু'জনে একটা ছোট মতন বারে গিয়ে ঢুকলুম। বেয়ারাকে যাতে টিপ্‌স না দিতে হয়, সেইজন্য সুবিমল নিজেই কাউন্টার থেকে দু'গ্লাস হুইস্কি আর সোডা নিয়ে এলো টেবিলে। তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, আহা, রাগ করছিস কেন ? ইচ্ছে করেই বেশি সোডা মিশিয়ে এনেছি। এসব এখন শিখে নে একটু একটু। দিনের প্রথম পেগটা খেতে হয় অনেক সোডা মিশিয়ে, খুব আস্তে আস্তে। তারপর, রাত্রের দিকে যা ইচ্ছে কর না !

প্রথম চুমুক দিয়েই আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। সুবিমলকে মিথ্যে কথা বলেছিলুম, আসলে আমার পকেটে অনেক টাকা আছে। কালকের জামাটাই গায়ে দিয়ে এসেছি আজ, কাল বিকেলে পাওয়া অনেক টাকাই পকেটে রয়ে গেছে। সুবিমলের সঙ্গে এই যে শুরু হলো, আজ কোথায় থামবো জানি না। অথচ, আজ পালিয়ে যাবো ভেবেছিলাম। ঠিক করে রেখেছিলাম, আজ সন্ধেবেলা স্বাভাবিক মানুষের মতন তিনটে সরল কাজ করবো। একা স্বাধীনভাবে কলকাতার সন্ধেবেলার হাওয়ার মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমি তিনটে জায়গা ছুঁয়ে আসবো। প্রথমেই হাসপাতালে, মাঝে মাঝে হাসপাতালে গেলে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা খুব জোরালো হয়ে ওঠে, কিন্তু শুধু সেজন্য নয়, আমার দাদামশাই হাসপাতালে আছেন, [illegible] বছর তাঁকে দেখি নি, তাঁকে শেষবার একবার আমি খুবই দেখতে চাই। কিন্তু আজ আর আমার মুক্তি নেই, আমি প্রথম চুমুক দিয়েই বুঝতে পেরেছি।

সুবিমল বললো, কিরে, হঠাৎ অমন গুম মেরে গেলি কেন ?

আমি মুখ তুলে বললুম, শেখরের কথা ভাবছি। কোথায় যে গেল !

— কোথাও আছে ঘাপটি মেরে ! আমার কি মনে হয় জানিস্, শেখর ঐ মৃচ্ছকটিক নাটকের সেই লোকটার মতো, কি যেন ক্যারেকটারটার নাম, বসন্তসেনার প্রেমিক ছিল ?

— চারুদত্ত ?

— হ্যাঁ, সেই চারুদত্ত'র মতন জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে কোথাও নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে!

— খুব জুয়া খেলছে বুঝি আজকাল ?

— ও যখন যে নেশা ধরে, জানিস তো ব্যাপার ? এখন তো আর মদ খায় না, এখন শুধু জুয়ার নেশা, জুয়ায় হারার নেশা ! জিতলে ওর আনন্দ হয় না, হারতেই ওর উত্তেজনা। ছেড়ে দে শেখরকে। সেই অরুণের ব্যাপারটা শোন্।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন্ অপারেটরটা ? কালো ধুমসী না ফর্সা দোহারা ?

— শোন্ না ব্যাপারটা ! একদিন আমি ওর টেবিলের উল্টোদিকে চুপ করে বসে আছি, সেই সময় টেলিফোন আর সেই নকল মালতী। কিছুক্ষণ কথা চলার পর আমি অরুণের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে হুঁ-হাঁ দিয়ে চালাতে লাগলুম, আর অরুণ চট্ করে চলে গেল পিবিএক্স যে ঘরে থাকে। তখুনি হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল। সেই দোহারা ফর্সা মেয়েটা! তারপর কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড হলো। মেয়েটা মোটেই ঠাট্টা করে নি, খিলখিল করে হেসে ওঠার বদলে লজ্জায় মাথা নুইয়ে

ফেললো। অরুণের সঙ্গে আর কথাই বলতে চায় না। মুখের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটা; অরুণকে বললো, আমায় ক্ষমা করুন, এ ঘরে থাকবেন না, প্লিজ ! আমার অন্যায় হয়ে গেছে ! অরুণ তো অবাক হয়ে ফিরে এলো। এদিকে আমি যেটুকু সময় ফোন ধরেছিলুম, তখন মেয়েটা বলছিল, আমি আর পারছি না অরুণ, এই আমার শেষবার, তুমি যদি দূরে ঠেলে দাও, তা হলে আমি কোথায় নেমে যাবো জানি না ! মাইরি, সে গলার আওয়াজে ঠাট্টার ঠ–ও নেই। শুনে আমার শরীর শিউরে উঠেছিল।

— মেয়েটির নাম কি ?

— সাবিত্রী। সাবিত্রী হালদার। রিফিউজি মেয়ে, চাকরি করে একটা বড় সংসার চালায়। কিন্তু মেয়েটা ঠিক টেলিফোন অপারেটরের টাইপ নয়, মুখে একটা অন্য ধরনের লাবণ্য আছে। যখন তাকায় মনে হয় যেন খুব দূর থেকে তাকিয়ে আছে, কিংবা কাছে বসেও খুব দূরের জিনিস দেখছে।

— আর একটা রাউন্ডের অর্ডার দে। গেলাস খালি। উঠতে হবে না, বেয়ারাকে বলে দে না।

— তোর আর সোডা লাগবে ?

— না।

— মেয়েটাকে অফিসের সবাই জ্বালাতন করে, একটু সুযোগ পেলেই মাঝবয়সী অফিসারদের ইশারা–ইঙ্গিত। ছোকরা কেরানিরা তো আছেই। তুই আজ তোর অপারেটরের সঙ্গে যেমন করছিলি —

— আমি কিছু করি নি ! আমি ইয়ার্কি করছিলুম।

— ঐ তো। টেলিফোন অপারেটরের সঙ্গে সবাই শুধু ইয়ার্কি করে, আর সে ইয়ার্কি শুধু একটু গোপনে ফূর্তি করার ইঙ্গিত। আর কিছু না। মেয়েটার ডিউটি শেষ হয় সাড়ে ছ'টায়, আমি আর অরুণ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম। আমি একটু দূরে। অরুণ কথা বলতে গেল। একটু বাদেই ফিরে এলো। মেয়েটা লজ্জায় অস্বস্তিতে কোনো কথাই বলতে পারে নি, খালি বলেছে, আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন। আমার এমন মায়া হলো, আমার বুকটা মুচড়ে উঠলো। আমার ইচ্ছে হলো মেয়েটাকে আমি বিয়ে করি —

— তুই? তুই আবার এর মধ্যে এলি কি করে ?

— বাঃ! মেয়েটা তো জানে না যে অরুণের বিয়ে হয়ে গেছে ! অরুণের ঐ রকম লালটুমার্কা চেহারা আর ঠাণ্ডা স্বভাব দেখে মেয়েটা অরুণের প্রেমে পড়েছিল। তাই বলেই তো আর মেয়েটার সর্বনাশ হতে দেওয়া যায় না ! বরং আমি বিয়ে করলে —

— মেয়েটা ভালবাসে অরুণকে, হঠাৎ তোকে বিয়ে করতে যাবে কেন ? তা ছাড়া, মেয়েটা অরুণকে ভালবাসে জেনেও তুই তাকে বিয়ে করবি কি করে ?

— অরুণকে ভালবেসেছিল বলে সে আর পরে আমাকে ভালবাসতে পারে না ? আমিও তো এর আগে সতেরোটা মেয়েকে ভালবেসেছি, তা বলে আর কারুকে পারবো না ? আমি তো সেইদিনই মেয়েটাকে অসম্ভব ভালবেসে ফেললুম। সাবিত্রী—এই নামটা ভাবলেই আমার বুকের মধ্যে এখন একটু একটু ব্যথা করে। এর নামই তো ভালবাসা, তাই না ?

— কে জানে ! যাই হোক, তুই মেয়েটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলি ?

— না — সাবিত্রী তো আমাকে চেনেই না। অরুণ যদি আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতো, আমি সাবিত্রীর কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতুম। আঃ, টেলিফোনে ওর সেই করুণ গলা এখনও আমার কানে ভাসছে, তুমি যদি দূরে ঠেলে দাও, তা হলে আমি কোথায় নেমে যাবো

জানি না। আমার মনে হলো, নদীর স্রোতের মধ্যে ভেসে যাওয়া সেই মেয়েটির নরম হাত দুটো আমাকে ধরতেই হবে। আমি অরুণকে সব বললুম। ও কি করলে জানিস ? অরুণটা একটা তিলে খচ্চর ! ডগ ইন দি ম্যানজার, যাকে বলে ! আমার কথা শুনে, অরুণ রেগে বলে উঠলো, আমি যেন কোনোদিন ওর অফিসে না যাই ! আমি আর কোনোদিন গেলে, ও দারোয়ান দিয়ে আমাকে বার করে দেবে—

— অরুণকে খুব দোষ দেওয়া যায় না ! কি করে তোকে বিশ্বাস করবে ?

— কেন করবে না ? এক মুহূর্তে মানুষের জীবন বদলায় না ? আমি সেদিন ওই এক মুহূর্তে—

— হ্যাঁ, এক মুহূর্তেও বদলায়। কিন্তু কোন্ মুহূর্তটা সেই বিশেষ মুহূর্ত তা চেনা বড় মুশকিল। তোর এর আগের সতেরো বার —

— আঃ ! আমি তো জানি ! এই মুহূর্তটাই রিয়েল ! তা বলে অরুণ আমাকে ওর অফিসে যেতে বারণ করবে ! এটা একটা ছোট লোকের মতন ব্যবহার নয় ?

সুবিমল এক চুমুকে পুরো গেলাসটা শেষ করে ঠক্ করে টেবিলে রাখলো। ঠোঁট দুটো সামান্য বেঁকানো, যেন ও গেলাসটা উপভোগ করে নি। মাথার চুলের মধ্যে চিরুনির মতো আঙুল চালিয়ে তেতো গলায় সুবিমল বললো, এর পরের রাউন্ডটা তুই খাওয়া।

সুবিমলকে দেখে মনে হয়, ও সত্যি আহত হয়েছে। ঠিক কি জন্য ? অরুণ ওকে অপমান করেছে তাই, না সাবিত্রীর সঙ্গে ওর পরিচয় হয় নি বলে ? আমি গলার আওয়াজ নিচু করে বললুম, সুবিমল, তুই আর কতদিন দুপুরে বন্ধুদের অফিসে অফিসে ঘুরবি ? তোর ভালো লাগে ?

ক্লান্ত ভঙ্গিতে সুবিমল বললো, কী করবো, দুপুরে বাড়িতে বসে থাকতে একদম ভালো লাগে না ! একা থাকলে মাথায় যত রাজ্যের কু-চিন্তা আসে। শরীর খারাপ হয়ে যায়!

— কিন্তু, রোজ রোজ বন্ধুদের অফিসে এসে আড্ডা দিতে একঘেয়ে লাগে না তোর ? একটা চাকরি-টাকরি খুঁজে নে না—

— দিচ্ছে কে ?

— অবিনাশকে বল্ না ? ওর তো অনেক —

— যা যাঃ ! অবিনাশ দেবে চাকরি, আর তাই নিয়ে আমায় বাঁচতে হবে ? জানিস, দেশে থাকতে অবিনাশরা আমাদের প্রজা ছিল ? অবিনাশের বাবা আমার ঠাকুরদার কাছে রোজ সকালে এসে হেঁ হেঁ করতো —

— ওসব চালিয়াতি ছাড়্। পুব বাংলা থেকে যারা এসেছে, সবাই আগে এক একজন জমিদার ছিল— এসব ঢের শুনেছি ! এখন ওসব ভুলে —

— তুই বিশ্বাস করলি না ? তোরা কোথাকার ?

— আমিও ইস্টবেঙ্গলের, কিন্তু আমার ঠাকুরদা ছিলেন টুলো পণ্ডিত, আমরা খড়ের ঘরে থাকতুম ভাই, এখন কলকাতার দোতলা বাড়িতে থাকি। আমি খারাপ নেই। যাকগে, অবিনাশকে না বলবি তো অন্য কোথাও চাকরি দেখ না —

— একশো তেইশ জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন করেছি এ পর্যন্ত, সতেরো জায়গায় ইন্টারভিউতে ডেকেছিল, তার মধ্যে এক জায়গায় মাত্র অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলাম একশো সতেরো টাকা মাইনের ! তারপর থেকে ও পাট চুকিয়ে দিয়েছি—। এর চেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-ফিঞ্জিনিয়ারিং পড়লে কাজ হতো ! সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস— এসবের তো আর দরকার নেই দেশের—

— কোথাও মাস্টারির চেষ্টা করলে তো পারিস ?

— এঁদো গাঁয়ে গিয়ে ? পারবো না। তাছাড়া, ছোট ছেলেদের সঙ্গে জোচ্চুরি আমার পোষাবে

না। অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মাস্টারি, তার মানে ক্লাসে গিয়ে টেবিলে পা তুলে দিয়ে, ড্যাফোডিলের সাবসটান্স লেখো তো বাপু, এই বলে ঘুমোনো, আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি মন দিয়ে পড়াতেও পারবো না, ফাঁকি মারতেও পারবো না। তা হলে ?

— মন দিয়ে পড়াতে পারবি না কেন ?

— তুই আমায় জেরা করছিস্ কেন রে শালা ? দে, আরেক রাউন্ডের অর্ডার দে। তুই তো শালা জামাইবাবুর জোরে চাকরি পেয়েছিস্ ! অফিসে গিয়ে ফুটানি করিস্ খালি। সবাই সব জিনিস পারে না, আমার দ্বারা মাস্টারি-ফাস্টারি হবে না ! মানুষকে আমার কিছুই শেখাবার নেই ! তুই তো ভালো চাকরি পেয়েছিস্, তুই কাজ করিস না কেন ?

— আমি কাজ করি না, তার কারণ কাজ নেই বলে। অফিসে অন্য লোকেরা সারাদিন টেবিলে বসে, ফাইল নাড়াচাড়া করে যে-কাজ করে, তা আসলে এক ঘণ্টার কাজ। এর আগে আমি গভর্নমেন্ট অফিসে কেরানিগিরি করতুম। সেখানেও কোনো কাজ নেই। সাত দুগুনে চোদ্দর চার নামিয়ে হাতে পেন্সিল নিয়ে বসে থাকা। তাকিয়ে দেখ না, সারা দেশটা থেমে আছে। আসলে এখন প্রত্যেকদিন ভারত-বন্ধ। ওসব কাজ-টাজের কথা ভাবিস্ না। কোনোরকমে একটা চাকরি খুঁজে নে। টাকাটা তো দরকার। সবাই কাজ না করে টাকা নিচ্ছে, তুই-ই বা নিবি না কেন ?

সুবিমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, চাকরি-ফাকরি আর পাবো না। ভাবছি, কবিতা লেখা ছেড়ে এবার নভেল-টভেল লিখতে শুরু করবো।

আমি হেসে উঠে বললুম, তাতেই তোর সব সুরাহা হয়ে যাবে ? কত লোকই তো নভেল লিখছে ! তুই নভেল লিখে দু'দিনেই বুঝি তুরুপ মারবি ? পারবি বিমল মিত্তিরের মতো লিখতে ?

এই সময় দরজার কাছে অবিনাশের লম্বা চেহারাটা দেখা গেল। একটা দামি সুট হাঁকিয়েছে, এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে খুঁজছে আমাদের। দেখতে পেয়ে, বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে এসে টেবিলে বসলো। সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, কি রে এত দেরি ? আমি বললুম, অবিনাশ, তুই শেখরের খবর জানিস্ ?

— কেন, শেখরের কি হয়েছে ?

— কাল রাত থেকে বাড়ি ফেরে নি !

— চুলোয় যাক্। বাড়ি ফেরে নি, ওর কি বাড়ির অভাব আছে ? চল্, এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে, একবার বারীনদার আখড়ায় যাবো।

সুবিমল বললো, আমি বারীনদার ওখানে যাবো না। আমার ভালো লাগে না।

— চল্ না। আজ একটা মারামারি হতে পারে।

— আমি মারামারির মধ্যে নেই !

— তুই আমার সঙ্গে থাকবি। সুনীল থাকবে, পরীক্ষিৎ আসবে, তোর ভয় কি ! আজ বারীনকে টিট্ করতে হবে !

আমি বললুম, কিন্তু শেখরের একটা খোঁজ নেওয়া দরকার। ওর ভাই এসেছিল সকালে, কোথায় যে যেতে পারে—

অবিনাশ ধমকে বললো, তুই শেখরকে কোথায় খুঁজবি ? ওর কোনো জায়গা ঠিক আছে ! চল্, বারীনদার ওখানে যদি খোঁজ পাওয়া যায়—।

যখন ঢুকেছিলাম, তখন দোকানটা নিরিবিলি ছিল। অন্ধকার হয়ে আসার পর এখন গম্‌গম্ করছে। কোণের টেবিলে একটা বিশাল জোয়ান মাতাল হয়ে গিয়ে শিশুর মতন গলায় গান

ধরেছে। মাঝে মাঝে লোকটা চিৎকার করে বলে, শের–ই–পাঞ্জাব ! ইউ নো, হু ওয়াজ মাই ফাদার ? শের–ই–পাঞ্জাব ! হিন্দুস্থান কা বুলবুল ! মাই ফাদার ওয়াজ কে এল সাইগল ! শের কা বাচ্চা শের !—এরপর সে গুমগুম করে বুকে শব্দ করে। লোকটাকে অনেকদিন ধরে চিনি, একটু পরেই ঐ শেরের বাচ্চাকে এক পাল শেয়ালের মতন এই বেয়ারার দল ঠেলতে ঠেলতে দরজা দিয়ে বার করে দেবে। একটা গেলাস ভাঙার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দিক থেকে ভরাট গলায় হো–হো করে হাসি।

২

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু বাতাসে এখনো মিহি জলকণা। কিসের একটা বিরাট প্রসেশন বেরিয়েছে, ট্রাম–বাস সমস্ত জমাট। এখন ট্যাক্‌সি পাওয়াও অসম্ভব। ভিজে রাস্তা দিয়ে সপ্‌সপ্‌ করে হাঁটতে হাঁটতে প্রসেশনের লোকরা কী নিয়ে যেন খুব রাগারাগির শ্লোগান দিচ্ছে। কান পেতে শুনলুম, ভিয়েৎনাম। ছেলেবেলার মতো এখনো আমার শোভাযাত্রা দেখতে খুব ভালো লাগে। লক্ষ করে দেখেছি, প্রত্যেক শোভাযাত্রার লোকদের ঠিক একরকম দেখতে হয়। ঠিক, তিনটে প্যাণ্ট–পরা লোকের পর দু'জন ধুতি, একটি বেঁটে লোক লাইন মেক–আপ করার জন্য আধা–দৌড়োয়, এরপর কয়েকটি বুক–প্লেন মেয়ে, দু'টি পায়জামা–গেরুয়া পাঞ্জাবী চুলে তেল নেই, পিছনে আবার তিনজন প্যাণ্ট পরা। এই একই মানুষ দেখি প্রত্যেক শোভাযাত্রায়, অবিকল এই সব মুখ। ভিয়েৎনামের বদলে খাদ্য চাই, ঠিক এই প্রসেশন, ঠিক তিনজন প্যাণ্টের পর দু'জন ধুতি, একটা বেঁটে লোক আধা–দৌড়ানো। আবার এরাই আসবে পুজো বোনাস কিংবা ডি–এ বাড়াও আন্দোলনে, ছাঁটাই চলবে না—তাও একই লোক, তিনটে প্যাণ্ট, দুটো ধুতি একজন বেঁটে, কাশ্মীর দেবো না, এরাই, ডি–আই–আর প্রত্যাহার করো, তাও এরা, আমি খুব ভালো করে লক্ষ করে দেখেছি। শোভাযাত্রার লোকেরা খুব সুখী, আমার মনে হয়, কারণ এদের দাবি আছে। ওদের নিশ্চিত আশা আছে, অন্তত দশটা দাবির মধ্যে জীবনে একটা না একটা পেয়ে যাবেই। আমার কোনো দাবি নেই, তাই আমাকে পাশে দাঁড়িয়ে প্রসেশন দেখতে হয়।

সুবিমল বললো, দাঁড়া, আমি আমার দিনের গুড টার্ন–টা সেরে আসি।

অবিনাশ বললো, সে আবার কিরে ?

— আমি ঠিক করেছি, সারা দিনে একটা না একটা ভালো কাজ করবো। তাতে মনটা বেশ পরিষ্কার থাকে।

সুবিমল একটি মধ্য–বয়স্ক লোকের কাছে গিয়ে বললো, চলুন ! লোকটি ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলুম সে অন্ধ, হাতে একটা সাদা লাঠি। লোকটি অস্বস্তির সঙ্গে লাঠিটা মাটিতে ঠুকছিল। সুবিমল বললো, আপনি রাস্তা পার হবেন তো ? চলুন, এ প্রসেশন এত বড় যে শেষ হতে ঢের সময় লাগবে, আপনাকে আমি পার করে দিচ্ছি।

লোকটি বললে, হ্যাঁ, আর দেরি হলে আমি ট্রেন ধরতে পারবো না !

অন্ধ লোকরাও একা ট্রেনে ওঠে, আগে জানতুম না। সুবিমল লোকটির হাত ধরে রাস্তায় নামলো, বিশাল মিছিল, অসংখ্য গলায় ক্রুদ্ধ চিৎকার, তার মধ্য দিয়ে একটি অন্ধ লোক পার হয়ে গেল।

আমরা চৌরঙ্গি ধরে হাঁটতে শুরু করলুম তিনজনে। কিছুক্ষণ চুপচাপের পর সুবিমল

অবিনাশকে জিজ্ঞেস করলো, বারীনদার সঙ্গে তোর ঝগড়া হলো কী নিয়ে ?

অবিনাশ তীব্র গলায় উত্তর দিল, ওটা একটা মহা শয়তান ! শ্মশানের পাশে ব্যবসা করে, বুঝলি না ? কাল খেলার সময়—

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম, ওদের কথায় আর কান রইলো না। শরীরটা চনচনে লাগছে, ঠিক নেশা হয় নি, কিন্তু মাথায় কিছুটা রক্ত উঠেছে। পায়ের শব্দ বেশ ভারি, জিবটা শুক্‌নো। এখন আর থামা যাবে না। অথচ, সন্ধেবেলাটা অন্যরকম কাটাবার ইচ্ছে ছিল আজ। ভেবেছিলাম, প্রথমেই একবার হাসপাতালে যাবো। দাদামশাই আর বাঁচবেন না, আট বছর তাঁকে দেখি নি, দাদামশাইর কথা মনে পড়লেই চোখে ভাসে একাত্তর বছরের একটি দীর্ঘ ঋজু শরীর, বুক ভরতি সাদা লোম। দাদামশাইয়ের গায়ের রং কালো, মাথার চুল এখনো অনেক কালো আছে, কিন্তু বুকের রোম সব সাদা। দাদামশাই মানেই আমার কৈশোরকাল। ওঁর কাছে যখন বহরমপুরে থাকতুম, উনি বলতেন, সংস্কৃত আর অঙ্ক— এই দুটো মন দিয়ে শেখো, বুঝলে! এই দুটো শিখলে বেঁচে থাকা সম্পর্কে কোনো দ্বিধা আসবে না, পৃথিবীকে মনে হবে না ভয়ের স্থান, যা-কিছু অজ্ঞাত তাকেই মনে হবে না জ্ঞানের অতীত, বরং ইচ্ছে হবে তার মধ্যে প্রবেশ করতে। বুঝলে ?— আমার ও-দুটোই শেখা হয় নি, সংস্কৃত আর অঙ্ক আমার শেখা হয় নি, তাই কি আমার এত দ্বিধা ?

দাদামশাই আর বাঁচবেন না। আট বছর তাঁকে দেখি নি, ইচ্ছে ছিল এই যৌবনে এসে আমার কৈশোরের সেই আদর্শ পুরুষটিকে একবার দেখে রাখি। স্মৃতিরও কিছু যুক্তি আছে। দাদামশাইকে এখন একবার না দেখে রাখলে, ওঁর সম্পর্কে আমার স্মৃতিটা সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু আজ যাওয়া হলো না, আর দেখা হবে কি ? কাল বড়দির মুখে যা শুনলুম, তাতে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, আর আয়ু নেই ওঁর। দাদামশাই এতদিন ছিলেন ওষুধ খাবার পোকা, নিজেই নানান্ মেডিক্যাল জার্নাল পড়ে নিজের চিকিৎসা করতেন, সামান্য সর্দি-কাশিতেই টপাটপ ওষুধ খেতেন, অন্যদেরও খাওয়াতেন। হার্ট অ্যাটাক হবার পর কয়েকদিন কোমার মধ্যে কাটিয়ে এখন তিন-চারদিন আবার জ্ঞান ফিরেছে হাসপাতালে। সেখানেও ওষুধ দিতে দেরি হলেই আর সহ্য করতে পারতেন না। নার্সকে টেবিলের ওপর রাখা পকেট-ঘড়ি দেখিয়ে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলতেন, সাতটা বেজে তিন, তোমার তিন মিনিট দেরি হয়েছে মা। এসব সেবার কাজ, এ বড় কঠিন দায়িত্ব। মানুষের জীবন বাঁচাবার জন্য সময়টা বড় দামি !

কিন্তু বড়দির মুখে শুনলুম, কাল বিকেলবেলা ওঁরা যখন দেখতে গিয়েছিলেন, তখন দাদামশাই ঘুমোচ্ছেন। অনেকটা সুস্থ, এবার ভালো হয়ে ফিরে আসবেন, এই সকলের আশা। নার্স ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি দেখে ওষুধ এনে ওঁকে জাগিয়ে তুলেছে। ঘুম ভেঙে দাদামশাই খানিকক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিছানার ওপর সোজা হয়ে বসে নার্সের দিকে হাতজোড় করে অন্যরকম গলায় বললেন, মা, আমাকে আর ওষুধ দেবেন না। আমার আর ওষুধের কোনো দরকার নেই। এবার আমি বাড়ি যাবো। আমাকে ক্ষমা করুন !

সকলে বিষম অবাক। অনেক পীড়াপীড়ি করা হলো, কিন্তু উনি আর ওষুধ খেলেন না, ওঁর গলায় যেন অন্য লোক কথা বলছে, উনি বারবার শিশুর মতন বলতে লাগলেন, আমি বাড়ি যাবো !

এই বাড়ি মানে মৃত্যু ? দাদামশাইকে দেখে ব্যাপারটা জেনে নেওয়া দরকার। হাঁটতে হাঁটতে আমরা যেখানে এসেছি, কাছেই পি জি হাসপাতাল, কিন্তু এখন আমার পক্ষে যাওয়া চলে না। এখন আমার জিব শুকনো, মাথা চনচনে, পায়ের শব্দ ভারি। দাদামশাই, তুমি আর একদিন অন্তত বেঁচে থেকো। তোমাকে আমার দেখা খুবই দরকার। আমি কাল যাবো।

আমি অবিনাশকে বললুম, চল্ এবার ট্যাক্সি ধরি, আর হাঁটতে পারি না ! ওরা দু'জন গল্পে মশগুল ছিল। সুবিমল বললো, বেশি তো রাত হয় নি, চল্ কালীঘাট পর্যন্ত হেঁটেই যাই।

আকাশের দিকে তাকালেই মনে হয় সাড়ে সাতটার বেশি বাজে নি। ভিজে জামা-প্যাণ্ট গায়েই শুকিয়ে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল, পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলুম। আমার চোখ একটুতেই লাল হয়ে যায়।

ভবানীপুরের কাছে রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়েছি, রাস্তার ওপারে চার-পাঁচটি অল্পবয়েসী মেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, সেই দিকে চোখ পড়লো। প্রথমে রুটিন চোখে তাকিয়েছিলাম, মেয়েদের দিকে যে-রকম একবার তাকাতেই হয়, এক পলক দেখেই এ-পাশের অন্য দু'টি বেণী-ঝুলোনো মেয়ের দিকে দেখলুম, আবার চোখ ফেরালুম ওদের দিকে। ওদের দিকে তাকিয়ে কী রকম যেন অন্য রকম লাগছে, কিছু যেন একটা আমার মনে পড়ার কথা। আবার চোখ সরিয়ে চলন্ত বাসের জানলার কাছে হলদে শাড়ি পরা এক বিশাল মহিলাকে দেখে নিতে না-নিতেই আবার পাশ দিয়ে দু'জন শালোর পরা পাঞ্জাবী কুমারী, তাদের আঁট শরীর দু'টিও ভালো করে দেখে নিতে হয়, তারপর আবার ঐ দলটার দিকে তাকালাম। পাঁচটি বাচ্চা মেয়ে, পনেরো-ষোলোর মতো বয়েস, হাত-পা নেড়ে কল্‌কল্ করে কথা বলছে। আমি ওদের মুখগুলোর ওপর দিয়ে চোখ ঘোরাতে লাগলাম, কী যেন একটা আমার মনে পড়ার কথা, ঘড়ির অ্যালার্মের মতো একটা রিনরিন শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ওদের মধ্যে একটি লাল শাড়ি পরা মেয়ের দিকে দু'তিনবার তাকিয়ে আমার চোখ আটকে গেল। মুহূর্তে মনে পড়লো সেই দৃশ্য, ওকে আমি দেখেছিলুম দু'বছর আগে। একটা বিয়েবাড়িতে বহু আলো ও লোকজন, তার মধ্যে আমি ঐ মেয়েটিকে, ওর নাম যমুনা, ওকে দেখেছিলাম। সেই দেখা আমার বুকে লেগে আছে। বিয়ের দিনে লোকজনের সট্‌সট্ ছোটাছুটি, সানাইয়ের চিৎকার আর গণ্ডগোলের সুর, ঘেমোমান ঝলমলে পোশাকে অসংখ্য কুৎসিত নারী, তার মধ্যে আমি যমুনাকে দেখেছিলাম, এখনও সেই ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, বিশাল সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে ঐ বালিকাটি দাঁড়িয়েছিল, একটি সাদা ফ্রক পরা, হালকা শরীরে ঝক্‌ঝকে স্বাস্থ্য, আমি নিচ থেকে দেখছিলাম, মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তলার মানুষদের দিকে তাকিয়েছিল। ওর চোখে কী রকম যেন একটা অবাক হবার ভাব ছিল, ঐ বয়েস, ঐ হাঁসের মতন শরীর, দেবীর মতন মুখের ঢৌল, সাদা ধপধপে ফ্রক, ওর চোখের বিস্ময়—সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছিল যেন একটি সরলতা স্থির মূর্তি, যার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই সুন্দর, যে নিজের শরীরের জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে সুন্দরের জেগে ওঠাকে দেখছে। সুন্দরী স্ত্রীলোক তো কম দেখি নি, কাছ থেকে, দূর থেকে, কখনো সাজানো, কখনো অনাড়ম্বর, এমন কি সেই বিয়েবাড়িতেও, যাদের ঠিক স্ত্রীলোক বলে—সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে শুধু যাদের শরীরই প্রকট, তাদেরও দেখছিলাম, কথা ও ফষ্টিনষ্টি করা হয়েছিল কম নয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি সরলতার জন্য হঠাৎ কাঙাল হয়ে পড়েছিলুম। আমার ইচ্ছে হয়েছিল ওকে দু'হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি, দেখি, ছুঁয়ে দিলে ওর গা থেকে রং উঠে আসে কিনা, সরল বিস্ময়ভরা জীবনের পবিত্র রং।

ও যে খুব সুন্দরী, তা নয়। অথবা, ঐ বয়েসে সব মেয়েই আশ্চর্য সুন্দরী, তাছাড়া আর কিছু খুব আলাদা নয়, ওর রং খুব ফর্সা নয়, একটু চাপা, টেবিল ল্যাম্পে নীল রঙের ঢাকনা থাকলে ওপর থেকে তার আলো যেরকম দেখায়—অনেকটা সেই রকম। আমি বহুক্ষণ সেদিন ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, ওকে আগেও দেখেছি, কিন্তু সেদিনের সেই অবাক পবিত্রমুখ, তা মূর্তি গড়িয়ে পুজো করার মতন। আমি ওকে বলেছিলাম, খুকু, তুমি একটা ফুল নেবে ? ও বলেছিল, আমার নাম খুকু নয়, আমার নাম যমুনা। আমায় চিনতে পারলেন না ? আমি বরুণের বোন।

স্থির চোখে তাকিয়ে দেখলুম, লাল শাড়ি পরেছে, তবু যমুনার মুখ এখনো পবিত্র সরল। ঝরনার জলের মত ঝকঝকে শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সুবিমল আর অবিনাশকে বললুম, তোরা একটু এগিয়ে যা, আমি পরে আসছি।

অবিনাশ বললো, কেন ?

— আমাকে একটা ওষুধ কিনতে হবে বড়দির জন্য। ভুলেই গিয়েছিলাম, এখন না কিনলে আর পরে হবে না।

— কিনে আন না, আমরা দাঁড়াচ্ছি।

— না, একটা মিকশ্চার আছে, বানাতে একটু দেরি হবে। তোরা এগো না, আমি যাচ্ছি।

সুবিমল বললো, চল্, ও পরে আসবে। অবিনাশ আমার খুব কাছে সরে এসে বললো, ঠিক আসবি তো ? না, কেটে পড়ার তালে আছিস্ ?

আমি বললুম, কাটবো কেন ? তোরা যা না। আমি মিনিট পনেরো–কুড়ির মধ্যেই বারীনদার ওখানে আসছি। এই বলে আমি সামনের ওষুধের দোকানে ঢুকে পড়লুম। ঢুকে সোজা কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ালুম ভিড়ের পাশে। একটু পরে একজন চোখ দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী চাই ? আমি বললুম, একটা টেলিফোন করতে দেবেন দয়া করে?

টেলিফোন তোলার পর লক্ষ করলুম আমার হাত কাঁপছে। কেন ? কে জানে ! ইচ্ছে করেই সাবধানে আমি মাত্র পাঁচবার ডায়াল ঘোরালুম। সুতরাং অনেকক্ষণ এনগেজ্ড টোন। হতাশার ভঙ্গি করে রিসিভারটা নামিয়ে বেরিয়ে এলুম ডাক্তারখানা থেকে। সতর্কভাবে উঁকি দিয়ে দেখলুম, অবিনাশ আর সুবিমল সত্যি চলে গেছে।

কিন্তু রাস্তার এপারেও ফাঁকা। সেই পাঁচটি মেয়ের কেউ নেই। কোথায় গেল ওরা, হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ? এই তো দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, দু'মিনিটের মধ্যে সবাই চলে গেল ? ভোজবাজি ! নাকি ওরা কেউ এখানে ছিলই না, আমিই কল্পনা করেছিলুম। যমুনাকে আমি দেখি নি ?

মুহূর্তে দপ করে রাগ জ্বলে উঠলো আমার শরীরে। মাথায় ছলাৎ করে রক্ত চলে এলো। আমি কঠিন মুখে ভস্ম করার চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে মনে মনে বললুম, যমুনাকে ফিরিয়ে এনে দাও ! যমুনাকে আমি দেখতে চাই একবার, এখুনি, যমুনাকে দাও ! নইলে আমি সর্বনাশ কাণ্ড বাধাবো, আমি ট্রামের লাইন উপড়ে ফেলবো, ছিঁড়ে ফেলবো টেলিগ্রাফের তার, মাঝ রাস্তায় আগুন জ্বালাবো। কোথায় যমুনা ? দাও ! ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়লো। যেন কেউ তাকে অদৃশ্য করে দিয়েছিল, আবার সত্যিই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। অল্পদূরে বাস স্টপে যমুনা একা দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে আমার টান্‌টান্ শরীরটা শিথিল হয়ে এলো, কোমল হলো মুখের ভঙ্গি, যেন আমি অনেকক্ষণ পর নিঃশ্বাস ছাড়লুম।

নিঃশব্দে যমুনার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, কেমন আছো ? চমকে ফিরে তাকিয়ে যমুনা বললো, একি ! সুনীলদা ! আপনি এখানে ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এখানে কী করছো ? তোমরা এখন এখানেই থাকো নাকি ?

— না, আমাদের বাড়ি তো লেক প্লেসে। এখানে গান শিখতে আসি। ঐ তো ঐটা আমার গানের ইস্কুল।

— তুমি শাড়ি পরেছো তো, তাই তোমাকে প্রথমে চিনতে পারি নি।

— বাঃ, শাড়ি তো আমি অনেকদিনই পরি। আপনি আগে দেখেন নি বুঝি ?

— কি জানি ! আমার মনে পড়ে, সেই বুলুদির বিয়ের দিন তোমাকে দেখেছিলুম ধপধপে সাদা একটা ফ্রক পরা।

— ওমা কি মিথ্যে ! বুলুমাসীর বিয়ের সময় আমি মোটেই ফ্রক পরতুম না। তখন আমি শাড়ি পরি রীতিমতো। বুলুমাসীর বিয়ে এই তো সেদিন হলো —

— সেদিন নয়, দু'বছর আগে। তখন তুমি—

— মোটেই না, বুলুমাসীর বিয়েতে আমি গোলাপী রঙের মুর্শিদাবাদ সিল্ক পরেছিলুম।

— সে হয়তো বউভাতের দিন। কিন্তু বিয়ের দিন তুমি সাদা ফ্রক পরেছিলে আমার স্পষ্ট মনে আছে।

— আপনার কিচ্ছু মনে থাকে না ! সে তো নরেশদার বিয়েতে, তিন বছর আগে। বুলুমাসীর বিয়ে তো হলো মোটে গত বছর জুনে। বুলুমাসীর বিয়েতে তো আপনি আসেনই নি ! মেয়েদের শাড়ি পরার কথা ঠিকই মনে থাকে।

— ও বাবা ! 'মেয়েদের' ! শাড়ি পরেই বেশ বড়ো হয়ে উঠেছো দেখছি! তুমি তো একটা খুকী !

— মোটেই খুকী নই।

— আচ্ছা বেশ, খুকী নও। তুমি আমায় চিনতে পারলে কী করে ?

— বাঃ, পারবো না ? তবে, আপনার চেহারা অনেক বদলে গেছে ! আগে আপনি অনেক ভালো দেখতে ছিলেন, সত্যি !

— এই তো তুমি এখনো খুকী আছো ! 'মেয়েদের' মধ্যে একজন হয়ে উঠলে কি কোনো ছেলের সামনা–সামনি তার চেহারা ভালো বলতে হয় ? একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে।

পরিষ্কার ছন্দে যমুনা হেসে উঠলো। সে হাসির মধ্যে কোথাও একটুকরো কঠিন পদার্থ নেই। এই হাসি যেন ওর সর্বাঙ্গ দিয়ে আসে। হাসতে হাসতেই বললো, এখন তো ভালো দেখতে বলি নি ! এখন কি বিচ্ছিরি —

— কী রকম বিচ্ছিরি ?

— রং কালো হয়ে গেছে। দাড়ি কামানো নেই। জামা প্যাণ্ট কী রকম যেন !

— বৃষ্টিতে ভিজেছিলুম তো ! কালকেই দেখবে আবার অন্যরকম। কালকেই।

— আপনি জোরে জোরে কথা বলছেন কেন ?

আমি চমকে উঠে বললুম, জোরে কথা বলছি ? তোমার অসুবিধা হচ্ছে ?

যমুনা ওর বিশাল কালো চোখ আমার দিকে মেলে বললো, না, আপনি আগে এ রকম জোরে কথা বলতেন না। আপনার চোখ লাল দেখাচ্ছে কেন ? আপনার শরীর খারাপ ?

— না, না। চোখে এমনি বালি পড়েছিল। তুমি বাসে উঠবে ? চলো না, একটু হেঁটে যাই, আমি কালীঘাটে যাবো, তুমি ওখান থেকে বাসে উঠবে।

— চলুন ! আপনি আমাদের বাড়িতে আসেন না কেন ? আজ যাবেন ? চলুন না —

— উঁহু। আর একদিন। তোমার দাদা বরুণ তো আমেরিকা থেকে এখনো ফেরে নি ?

— দাদা এই নভেম্বরে ফিরবে। আমার জন্য একটা টেপ রেকর্ডার আনতে বলেছি।

লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ, লাল রঙের চটি, তার মধ্যে যমুনার কচি নিটোল শরীর, এতগুলো লাল রঙের মধ্যেও কোনো আগুনের আভা নেই, এই হচ্ছে সুন্দর, যা দেখলে মন অবনত হয়। এক পলক আমার মনে হলো, যমুনা, তুমি সত্যি সুন্দর— এই কথা বলে আমি ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। ওর ভিতরে যে সুন্দর আছে, তা প্রণাম পাবারই যোগ্য। কিন্তু তা করা যায় না, না ? লোকে পাগল বা মাতাল বলবে ! আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আমি বললুম, যমুনা, তোমাকে হঠাৎ দেখে আমার মনটা খুব ভালো লাগছে।

— বাড়ি চলুন না, বাবা ! কী এমন কাজ ?

— না, আজ নয়। তার আগে আরেক দিন আমি তোমার এই গানের ইস্কুলের সামনে দেখা করবো।

— গানের ইস্কুলের সামনে ? কেন ?

— এমনি। আজ এখানে তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগলো তো ! আরেক দিনও বোধ হয় ভালো লাগবে। তুমি এখন কী গান শিখছো, পাতার ভেলা ভাসাই ?

— ও মা, আপনি জানলেন কী করে ? ওটা তো বিগিনারদের গান। আমি এখানে সেকেন্ড ইয়ার।

— ও, তাহলে তো এখন, শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে, তাই না ? যমুনা আবার সর্বাঙ্গ দিয়ে হেসে উঠলো। বললো, আপনি এসব জানলেন কী করে ? গান শিখতেন বুঝি ?

— না। কোনোদিন না। আমাদের পাশের বাড়ির একটা মেয়ে গানের ইস্কুলে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে আর রোজ সকালে হারমোনিয়ামে সেই সব গান গায়, গায় না ঠিক, চেঁচায় ! সেইজন্যে, কোন্ গানের পর কোন্ গান শেখানো হয় সব আমার মুখস্থ।

— ভালোই তো, আপনারও গান শেখা হয়ে যাচ্ছে !

কী মুখ, পরিষ্কার, কোথাও একটু সামান্য দাগ নেই, পবিত্র চোখ দু'টিতে নেই সামান্য দ্বিধা, গাঢ় কালো রঙের ভুরু। গাছ থেকে পেড়ে আনা সদ্য টাটকা নিটোল আপেল বা পেয়ারা হাতে নিলে যেরকম ভালো লাগে, যমুনার মুখ দেখে আমার সেই রকম মনে হতে লাগলো। ধরিত্রীর যা-কিছু শ্রেষ্ঠ—তা যেন আমি ওর মুখে দেখতে পাচ্ছি। সমস্ত শরীরটাই নিখুঁত, কোথাও একটুও অতিরিক্ত বা কম নেই, একটা বাচ্চা ঘোড়া কিংবা একটা বাজপাখির শরীরের প্রতিটি অংশ যেমন সুষম আর ছন্দোময়, ঠিক সেই রকম, এমন কি আকাশে একটি এরোপ্লেন উড়ে যাবার মধ্যে যে স্মার্টনেস আছে, যমুনাকে দেখে একবার আমার সে-কথাও মনে হলো। মসৃণ গলার নিচে সদ্য জেগে ওঠা বুক, একটা হাত ধরে আছে বুকের কাছে গানের খাতা। স্তন কথাটার মানে—যা শব্দ করে যৌবনকে আগমন ঘোষণা করে— এই রকমই যেন কোথায় শুনেছিলাম। আমি যমুনার মুখ ও বুকের দিকে তাকিয়ে যৌবনের জেগে ওঠার শব্দ শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট। খুবই ইচ্ছে করছে, এই পথের উপর দাঁড়িয়ে আমি যমুনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। কিন্তু, তা করা যায় না, না ? লোকে পাগল কিংবা মাতাল বলবে।

জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের গানের ইস্কুল কবে-কবে ?

— মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার। ছ'টা থেকে আটটা। আপনি গান শিখবেন ? শিখুন না, আপনাদের মতোও অনেকে শেখে।

— যাঃ ! তা নয়, আমি তো এই দিকে মাঝে মাঝে আসি। হঠাৎ হয়তো তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে। আজ তোমাকে দেখে এমন ভালো লাগলো।

— মাকে বলবো আপনার কথা। কবে আসবেন বাড়িতে ?

— যাবো, যাবো। ঐ যে তোমার বাস এসে গেছে। উঠে পড়ো, নইলে বাড়িতে তোমার জন্য ভাববে। হয়তো ভাববে, তুমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছো।

— ইস্, কী যে বলেন ! আমি একা একা কত জায়গায় যাই।

— বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি খুব বড়ো হয়ে গেছো। এবার উঠে পড়ো বাসে।

যমুনা এগিয়ে বাসে উঠলো। তারপর ফিরে হাসলো আমার দিকে। ওর সর্বাঙ্গের লাল পোশাকের জন্য ওর হাসিতেও একটা লাল আভা এসেছিল। বাস ছাড়ার মুহূর্তে ও রিনরিনে গলায় শুদ্ধ ধৈবত সুরে চেঁচিয়ে বললো, আসবেন কিন্তু ! যমুনা এখনো 'মেয়েদের' মধ্যে একজন হয়ে ওঠে নি, সে রকম কোনো মেয়ে বাসে ওঠার পর রাস্তায় দাঁড়ানো পুরুষের প্রতি চেঁচিয়ে কথা

বলে না। নিয়ম নেই।

কালীঘাট বাজারের ওপরে একখানা ঘর নিয়ে বারীনদা থাকে। বারীনদার সঙ্গে কী করে বা কোন্ সূত্রে যে আমাদের চেনা হলো তা আজ আর মনে নেই। কিন্তু দেখেছি ওর ঘরে অনেক ফিল্মস্টার কিংবা ফুটবল খেলোয়াড়ও আসে। বারীনদার ঘরে তাসের জুয়া খেলতে খেলতে অনেক রাত ভোর করেছি। কোনো কোনো রাতে সর্বস্বান্ত হয়ে হেরে গেছি হয়তো, কিন্তু বারীনদা সকালে ডিমসেদ্ধ আর চা খাইয়ে— বাড়ি ফেরার গাড়ি ভাড়া পর্যন্ত দিয়েছে। বারীনদা লোকটা দুর্দান্ত ধরনের, কিন্তু নিছক অর্থলোলুপ নয়। জুয়া খেলার সময় একটা পয়সা ছাড়ে না, কিন্তু অন্য কোনো সময় ধার চাইলে সঙ্গে সঙ্গে দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর ফেরত চায় না। বেঁটে, কিন্তু সবল চেহারা, হাত দু'খানা বিষম ভারী, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মুখখানা নেপালি ধরনের। মুখের ভাবে রাগ কিংবা দুঃখ সহজে বোঝা যায় না। কেওড়াতলা শ্মশানের পাশে বারীনদার একটা ফুলের দোকান আছে, দিনের বেলায় সেখানে বসে। এটাও অদ্ভুত, ঐ ফুলের দোকানে ওর কতই বা লাভ হয়, বারীনদার যা কিছু লাভ সবই তো রাত্রে, জুয়া, তা ছাড়া ওর ঘরে সব সময়ই তিন চার রকমের মদ থাকে —পয়সা দিয়ে খেতে হয়। কিন্তু দোকানটার ওপর ওর খুবই যত্ন, কারুর প্রতি যথার্থ স্নেহ দেখাতে গেলে বারীনদা বলে, যাঃ, তুই মরলে, আমার দোকান থেকে বিনা পয়সায় ফুল দেবো এখন ! যত লাগে।

আমি ঢুকে দেখলুম, ঘরে অনেক লোক। প্রথমেই চোখ বুলিয়ে দেখে নিলুম, শেখর আছে কিনা। নেই। খাটের ওপর জুয়া বসে গেছে, বারীনদা, অবিনাশ, তাপস আর একটি অচেনা লোক। জানলার কাছে বসে নূরুল আর সুবিমল। এক কোণে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে পরীক্ষিৎ, হাঁটু মোড়া ও হাত ছড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারা যায়— ও আর সারা রাত্রে উঠবে না। আমি জিজ্ঞেস করলুম, বারীনদা শেখরের কোনো খবর জানো ?

— না ভাই। সে তো দিন পনেরো হলো এখানে আসে না ! আর আসবেও না কোনোদিন বলে গেছে।

— আর আসবে না ? কেন ?

— আরে, ওসব লোক কি খেলতে জানে ? ও মাসে শেখর পরপর চারদিন জিতলো, অনেক, প্রায় পাঁচশো টাকা। তারপর একদিন হারলো ছ'শো টাকার মতন। সেদিনই বললো, ও নাকি টাকাটা ইচ্ছে করে হেরেছে। ওর আর খেলায় মন নেই। দূর, দূর, ওসব লোককে নিয়ে খেলা হবে না। খেলে বটে অবিনাশ মিত্তির।

— অবিনাশ ? কিন্তু কাল নাকি ওর সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে ?

— অবিনাশ কোনো কথা না বলে নিবিষ্টভাবে তাশের দিকে তাকিয়েছিল। বারীনদা হো-হো করে হেসে বললো, কাল অবিনাশ একটু বেশি জিতছিল কিনা, তাই মেজাজটা একটু গরম হয়ে গিয়েছিল। আরে ভাই, কুড়ি বছর ধরে তাসের খেলা খেলছি— একটা জিনিস দেখলুম, হেরে গেলে যত না মাথা গরম হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি হয় জেতার সময়। নতুন ডিল করছি, তুমি বসবে নাকি ?

— না, আমি না।

তাপস বললো, আয় সুনীল, বোস না। ঘণ্টাখানেক খেলবো।

আমি বললুম, না-রে। তোরা খেল।

— কেন ? টাকা নেই ?

— সেজন্য না। আমার ইচ্ছে নেই আজ। তোরা খেল না। আমি এলুম শেখরের জন্য। তোরা কেউ শেখরের খবর জানিস না ? তা হলে তো একটু চিন্তারই কথা দেখছি !

— শেখরটা একটা স্বার্থপর। ও কারুর খবর নেয় না, আমরা ওর খবর কেন নিতে যাবো?

— কিন্তু বাড়ি ফেরে নি কাল রাত্তিরে, কোনো পাত্তা নেই, হারিয়ে গেল না কি? কিছুটা খোঁজ খবর তো করা দরকারই—

অবিনাশ মুখ তুলে সামান্য জড়িত গলায় বললো, মনে কর না আমরাই হারিয়ে গেছি। শেখরকে বল্ আমাদের খুঁজতে।

— তাকে পাচ্ছি কোথায় যে বলবো ?

— বীণার ওখানে খোঁজ করেছিলি ? আমার নিশ্চিত ধারণা ও— (ছাপার অযোগ্য) বীণার ওখানেই পড়ে আছে।

— বীণার ওখানে ? শেখর তো ওখানে আর যায় না শুনেছি। তা ছাড়া ওখানে গেলেও পরের দিন বাড়ি ফিরবে না কেন ?

— মারামারি করেছে না বাঁধা পড়ে আছে, তার কিচ্ছু ঠিক আছে ! তুই ওখানে গিয়ে দেখ, ঠিক পাবি !

আমি খানিকটা চটে উঠে বললুম, আমার দায় পড়েছে। আমাকেই একা খোঁজ করতে হবে— তার কি মানে আছে ?

অবিনাশ দাঁতে দাঁত ঘষে তেতো গলায় বললো, তা হলে তোমায় এখানে এ প্রস্তাবটা কে আদুরে আদুরে গলায় উথাপন করতে বলেছে মানিক ? খেলতে হয় খেলো, না হয় এখান থেকে কাটো।

বারীনদা বললো, তাস দিচ্ছি, বসবে নাকি দু'এক রাউন্ড ?

আমি বললুম, না। আপনারা খেলুন, আমি দেখি। কত করে বোর্ড ?

— ছোট বোর্ড। দশ–পয়সা, কুড়ি পয়সা।

— লিমিট ?

— বারো টাকা। দু'জন হয়ে গেলে আনলিমিটেড।

বারীনদা তাস দিতে দিতে বললেন, দাও দাও বোর্ড মানি দাও। নাও, মুভ !

তাপস প্রথমেই তাস তুলে দেখে নিয়ে ঠোঁট উল্টে বললো, প্যাক ! অচেনা লোকটি একটি টাকা রেখে বললো, দশ। অবিনাশ বললো, দশ। বারীনদা বললো, দশ। তারপর তিনজনেই আবার, দশ, দশ, দশ। দশ, দশ, দশ।

এই সময় হীরালাল এক গ্লাস সোডা মেশানো রাম এনে বললো, এই লিন সুনীলবাবু, তিন টাকা পনেরো দিন।

আমি বললুম, এ কি ! কে দিতে বললো ? আমি চাই নি তো ?

— খাবেন না ?

— না। তা ছাড়া আমি হুইস্কি খেয়ে এসেছি, এমনিতেই খেতুম না।

— হুইস্কি শেষ। রাম আর জিন আছে। বাংলাও আছে, খাবেন ?

— না, আমার আজ কিচ্ছু চাই না। তুমি এটা নিয়ে যাও !

— ঢেলে ফেলেছি যে। আপনি না খান, অন্য কেউ খাবে—আপনি দামটা দিয়ে দিন না।

বারীনদার এই পেয়ারের চাকরটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। কথাবার্তা বিষম কাঠখোট্টা। এক একদিন ইচ্ছে করে ধরে দু'ঘা কষিয়ে দি। কিন্তু যা ষণ্ডামার্কা চেহারা, সাহসও হয় না। আর বিনা বাক্যব্যয়ে আমি পয়সা বার করে দিয়ে, গেলাসটা নিলাম। একটা চুমুক দিয়েই

মুখটা বিশ্রী হয়ে গেল। আমি বললুম, কী হীরালাল, এ যে একেবারে স্পিরিট ! দাম বেশি নিচ্ছো, আবার ভেজালও মেশাচ্ছো ?

— কী বলছেন ? খাঁটি ফাইভ ইয়ার্স দিয়েছি। আপনি পুরোনো লোক —

বারীনদা সোহাগ করা গলায় বললেন, সত্যি হীরালালটা কি যে করে ! মাঝে মাঝে আমাকেও এমন মাল দেয় যে মনে হয় ভেজাল মেশানো ! কি রে হীরু ? দে, আমাকে দে এক গ্লাস।

আরেকটা চুমুক দিয়ে আমার সত্যিই খারাপ লাগলো। আমি বললুম, এ আমি খাবো না, ফেলে দিচ্ছি !

অবিনাশ হাত বাড়িয়ে বললো, ফেলিস না, আমাকে দে। গেলাসটা নিয়ে অবিনাশ এক চুমুকে সবটা শেষ করে বাঁ হাতের উল্টো দিক দিয়ে ঠোঁট মুছলো। অবিনাশের কপাল ভর্তি ঘাম, চুলগুলো খাড়া–খাড়া, নাকের ডগাটা চক্‌চকে। মেরুদণ্ড সোজা করে অবিনাশ উঁচু হয়ে বসে বললো, ব্লাইন্ড এক টাকা হিট্‌, রাজি ? বারীনদা মুচকি হেসে বললো, রাজি ! অচেনা লোকটি অন্য বিষয়ে একটিও কথা বলছে না, গম্ভীর গলায় বললো, রাজি।

সুবিমল আর নূরুল জানলার কাছে প্রায় নিঃশব্দে বসে আছে। নূরুল একটা সিগারেট নিয়ে দু' আঙুলে ডলছে। দেশলাই কাঠি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সিগারেটের ভেতর থেকে তামাক বার করে ফেলেছিল। তারপর বাঁ হাতের তালু থেকে অন্য একটা মশলা সিগারেটের মধ্যে ঢোকালো। নূরুল বললো, কী সুনীলবাবু, বড় তামাক চলবে নাকি একটান ?

আমি বললুম, না, আমি গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

নূরুল ছোট করে হাসলো। ভারি মধুর ওর হাসি। মুখ নিচু করে বললো, সবার কাছেই এক কথা শুনি। ছেড়ে দিয়েছি ! ছাড়ার জন্য নিজেকে কোয়ালিফাই করলেন কবে ? ভালো করে ধরেছেন কখনো, যে ছাড়বেন ? উপনিষদের কথাটাও আছে না, পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ! তার মানে, পর্যাপ্ত কাম্য বিষয় ভোগ করে তবেই তো ভোগ্যবস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়। বুঝলেন, ভোগ্যবস্তুর স্বরূপজ্ঞান হলে তখনই সংসারের সমস্ত কামনা দূর হয়ে যায়। তা নয়, আগে থেকেই এটা খাবো না, ওটা ছোঁবো না, ওটা করবো না, এতে কি আত্মা পরিষ্কার হয় ? সংসারে সাধনা করতে এসেছি, পুরো সাধনা করে যেতে হবে। আগে সব জিনিসগুলো যাচিয়ে দেখে নিতে হবে তো ! গাঁজা যে ছেড়েছেন বললেন, তার আগে গাঁজা কী তা বুঝতে পেরেছেন ?

নূরুল প্রত্যেকটি শব্দ জোর দিয়ে উচ্চারণ করে। আমি ওর ব্যাখ্যা শুনে অল্প হাসছিলুম, সুবিমল বললো, না, সুনীলটা এক সময় নেশা ভাং কম করে নি কিন্তু ! ঐ যে দেখছিস না, ওর রোগা সিড়িঙ্গে চেহারা আর আমসির মতো মুখখানা, তোবড়ানো গাল— এক সময় ওর চেহারা কিন্তু পাঞ্জাবী মুলোর মতন লালটু ছিল। গাঁজা টেনে টেনে ঐ হাল হয়েছে ! আর ঐ যে চোখের কোণে কালো চাকতি— এক সময় মরফিয়া নিতো কিনা — মাথার চুল উঠে যে মাথাখানা খোলার খাপরা হয়ে গেছে, তার কারণ —

আমি হাসতে হাসতে বললুম, ভাগ ! মোটেই আমি অত নেশা করি নি কোনো দিন। আর মোটেই আমার চেহারা অত খারাপ নয় ! আজই একটা মেয়ে আমার চেহারার প্রশংসা করছিল।

সুবিমল তড়াক করে সোজা হয়ে বসে বললো, আজ তোর সঙ্গে কোনো মেয়ের দেখা হলো কোথায় ? আমি সারাদিন তোর সঙ্গে আছি —

আমি বললুম, সকালবেলা —

সুবিমল চোখ ঘোলা করে চেঁচিয়ে উঠলো, সকালবেলা ? তুই আজকাল সকালবেলা মেয়ে পেয়ে যাচ্ছিস ? ব্যাপারটা কি ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অ্যাঁ ? সকালবেলাই তোর সঙ্গে

কোনো মেয়ের দেখা হয় কী করে ? অ্যাঁ ?

আমি নূরুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, সুবিমলটা অনেকখানি গাঁজা খেয়েছে বুঝি?

নূরুল সেই রকম মধুর হেসে বললো, খুব বেশি না, তবে হিট করে গেছে। আপনি একটা টাকা দেবেন না ?

— না, আপনি খান। আমার ইচ্ছে নেই আজ। অ্যালকহলের পর গাঁজা আমার সহ্য হয় না। আমি সবই একটু একটু চেখে দেখেছি, ঠিক স্বরূপ বুঝেছি কিনা জানি না, তবে আসক্তি হয় নি, কোনোটাই মনে হলো না আমার জীবনকে আরও একটু এগিয়ে দেবে —

সুবিমল ধরা গলায় বললো, টেনে দেখ না একবার আজ। জীবনটা বদলে যাবে —

আমি উত্তর দিলাম, গাঁজা খেয়ে আমার আজ আর স্বপ্ন দেখার দরকার নেই। আমি একটা অন্য স্বপ্ন পেয়ে গেছি।

নূরুলের মুখখানা আবার বিষণ্ন হয়ে গেল। খুবই দুঃখিত স্বরে বললো, এই তো আর একটা ভুল কথা বললেন ! স্বপ্ন দেখার জন্য গাঁজা খাবেন কেন ? গাঁজা খাবেন শুধু গাঁজারই জন্য ! যেমন নারীর কাছে যাবেন— তার মধ্যে কোনো ঈশ্বরী বা প্রকৃতিকে খোঁজার জন্য নয়, নারীরই জন্য ! রূপকে রূপান্তরিত করার কোনো দরকার নেই। প্রত্যেকটি অস্তিত্বেরই একটা নিজস্ব শুদ্ধ সৌন্দর্য আছে, তাকে অন্য জিনিসের সঙ্গে তুলনা না করে, বুঝলেন, কিছু আরোপ না করে, তাকেই মূল পর্যন্ত আস্বাদ করা উচিত। সেই যে মহর্ষি আরুণি শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন, ত্বং হোবাচ —

সুবিমল যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, আঃ, জ্বালালে ! এই শালা, লেড়ের লেড়ে পাতি লেড়েটা আজকাল কথায় কথায় সংস্কৃত ঝাড়ছে। এই নূরুল, তুই শালা মোছলমানের বাচ্চা, তোর অত সংস্কৃত আওড়াবার দরকারটা কি রে ? এক দিন দাঁত ভেঙে যাবে বলছি, এখনও ছাড়।

নূরুল বললো, তুই চুপ কর্ শুকনি বামুন ! চাল–কলা খেয়ে খেয়ে তো রক্তটাও টিকটিকির মতন সাদা করেছিস, আবার হিঁদুগিরি ফলানো ! সুনীলবাবুতে আমাতে জ্ঞানের কথা হচ্ছে, তুই এর মধ্যে মাথা গলাতে আসিস কেন রে, মুখ্যু ?

সুবিমল চোখ পাকিয়ে বললো, দাঁড়া, একদিন ছুরি দিয়ে তোর পেট ফাঁসাবো। দে, সিগারেটটা দে, আর একটা টান দি !

নূরুল সিগারেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বললো, একদিন এর মধ্যে গাঁজার বদলে বিষ ভরে দেবো তোকে, বুঝলি ?

সুবিমল হাত মুঠো করে আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা ভরে চোখ বুজে একটা লম্বা দম টানলো। তারপর ধোঁয়াটা বার না করে দম বন্ধ গলায় ফিসফিস করে বললো, দে ভাই, তাই দে, বেঁচে যাই। নিজের হাতে বিষ খাবো, সে সাহস নেই, তুই যদি হাতে তুলে দিস— টপ করে খেয়ে ফেলবো। খেয়ে নিজেও মরবো, তোকেও ফাঁসিতে ঝোলাবো — যাঃ, ল্যাঠা চুকে যাবে !

আমি নূরুলকে বললুম, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু রূপকে রূপান্তর না করে বাঁচা বড় শক্ত। তার জন্য, কি জানি, বোধ হয় অনেক সাধনা করা দরকার। সেই আদিকালে মানুষ যেমন টোটেমের পুজো করতো, সূর্যকে মনে করতো ঈশ্বর, গাছকে মনে করতো দেবতা— এখনও তার রেশ রয়ে গেছে।— এখনও নদী দেখলে মনে হয় নৃত্যচঞ্চলা নারী, নারীকে মনে হয় নদী। রোদ্দুর দেখলে মনে হয় বর্শার ফলার মতো, আবার বর্শার ফলাকে মনে হয় রোদ্দুর দিয়ে তৈরি। এই রকম সব সময় তুলনা দিয়ে–দিয়ে আমরা কিছুই সত্যিকারের দেখতে পারি না, কিছুই বুঝতে পারি না। কোনো একটা বস্তুর মূল দেখবো কী করে, সব সময়ই তো চোখ সরে যাচ্ছে,

সব সময়ই তো অন্য একটা কিছু এসে তার ওপর ছায়া ফেলছে।

— এই জন্যই দরকার আগে নিজের সম্পর্কে ঠিকঠাক হয়ে নেওয়া। নিজের সম্পর্কে যদি ভুল ধারণা না থাকে, নিজের সম্পর্কেও যদি উপমা না মনে আসে, ইতিহাস থেকে নিজেকে আলাদা করে নেওয়া যায়, তবে বুঝলেন, অন্য জিনিসের মূল পর্যন্ত যাবার একটা পথ পাওয়া যায়। ফলকে ভাঙুন, তার মধ্যে বীজ, বীজকে ভাঙুন, তার মধ্যে কিছু না। পেঁয়াজ কিংবা বাঁধা কপি পরতের পর পরত খুলে যান, ভেতরে কিছু না। এই বিশ্ব-সংসারের সবগুলো কিছু না জানার জন্য সব কিছুকে আলাদা করে দেখতে হয়।

— সব কিছুকে দেখতে গেলে কোথাও একটা স্থির কেন্দ্র রাখাও দরকার। এলোমেলোভাবে দেখা যায় না। কিন্তু সেই কেন্দ্রটা কী বলুন তো ? ভালবাসা ?

— ভালবাসা তো বটেই ! কিন্তু কাকে ? নিজেকে, না আপনি মেয়েছেলের কথা বলছেন?

— নিজেকে ভালবাসা কথাটার কোনো মানেই হয় না। নিজেকে ভালবাসা হচ্ছে কি জানেন, হাওয়ার অস্তিত্ব বা জলের রং বা তুলোবীজের গতিপথের মতন— ঠিক টের পাওয়া যায় না। অন্য একটা কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগানো দরকার। সেই অন্য একটা কিছু স্ত্রীলোক হওয়াই ভালো। নারী হচ্ছে পাথরের দেবতার মতো, যে সাড়া দেবে না, বিচলিত হবে না— তার কাছেই বারবার নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে। কখনো এক বিছানায় শুয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা, কখনো মন্দিরে গিয়ে গোপন প্রার্থনার মতো। এই কথাটা আমার এইমাত্র মনে পড়লো জানেন, আগে কখনো ভাবি নি।

নূরুল হেসে উঠে বললো, সে কি, গাঁজা না খেয়েও এসব কথা মনে পড়ে নাকি ? এমনি এমনিই মনে পড়ে ?

আমিও হেসে উত্তর দিলুম, এগুলো গাঁজাখুরি কথা বলছেন ? হতেও পারে। কিন্তু যখন গাঁজা খেতুম পুরো দমে, তখন কিন্তু আমার কোনো কথাই মনে পড়তো না। শুধু গা ব্যথা, গলা শুকনো, আর চোখে কিছু রঙিন ডিজাইন দেখতুম। দিন, আপনার সাজা এক ছিলিম টেনে দেখি।

নূরুল হাত বাড়িয়ে শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা দিল। আমি তারপর দুটো লম্বা টান দিয়ে খক্‌খক্ করে কেশে উঠলুম। বিশেষ মশলা ছিল না, শেষটা শুধু সিগারেটের তামাক। আমি বললুম, নেই কিছু এতে। শুধু সোডা !

— আর একটা বানাবো ?

তাসের টেবিল থেকে তুমুল হৈ-হৈ শব্দ উঠলো। তাপসের গলাই সবচেয়ে উঁচুতে, অ্যাঁ, ট্রায়ো ? জোচ্চুরি ! কোনো মানে হয়, জোচ্চুরি !

বারীনদার কঠিন গলা, জোচ্চুরি ?

তাপস থতোমতো খেয়ে বললো, না, না, তুমি জোচ্চুরি করছো, তা বলছি না ! ভগবানের জোচ্চুরি। আমার হাতেও তো উঠতে পারতো, আমি টপ্ রান নিয়ে বসে আছি, যাঃ মাইরি, আমি আর খেলবো না। আমার সব টাকা খতম্ ! বাড়ি চললুম।

— বাড়ি চললুম।

অবিনাশ বললো, বোস্ না ! কোথায় যাবি ? জমে উঠেছে খেলা, হীরালাল, আমাকে আর এক গ্লাস দাও তো !

তাপস দাঁড়িয়ে উঠলো, না, তোরা খ্যাল্, আমি যাই।

— এক্ষুনি কি যাবি ?

— এরপর গেলে ছায়া বিষম কান্নাকাটি করবে। বেচারা একা একা থাকে — সাড়ে এগারোটা বাজলো !

অচেনা লোকটি জুতোর ফিতে বাঁধছিল, সেও দাঁড়িয়ে বললো, আমিও যাই। আবার কাল আসবো ! তারপর আর কোনো কথা না বাড়িয়ে তাপস আর সে বেরিয়ে গেল। অচেনা লোকটি ভারি রহস্যময়, এতক্ষণ আর একটিও কথা বলে নি, জুয়ার দান দেওয়া ছাড়া, শুধুমাত্র খেলতে এসেছিল, খেলা শেষ করে চলে গেল, ঘরের অন্য লোকদের সম্পর্কে সামান্য কৌতূহলও দেখালো না। আমি চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করলুম, কে রে লোকটা ! অবিনাশ বিরক্ত ভঙ্গি করে বললো, কে জানে ! তাপস কোথা থেকে মক্কেল ধরে এনেছে।

বারীনদা পয়সা গুনছিল। বললো, আর খেলা হবে না তো ?

অবিনাশ এক চুমুকে আবার গেলাস শেষ করে বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে, তোমাতে আমাতে কিছুক্ষণ হোক।

আমি বললুম, অবিনাশ, আমিও তা হলে এবার বাড়ি যাই। ভালো লাগছে না।

অবিনাশ ব্যাকুল হয়ে বললো, না, তুই যাস নি। প্লিজ, একটু বোস্, কয়েক দান খেলেই—

— না, রাত্তির হয়ে যাচ্ছে। এখন বাড়ি না গেলে—

অবিনাশের গলা নেশায় জড়ানো এবং করুণ। ও বললো, কি যে তোরা বাড়ি বাড়ি করিস ! ভাল্লাগে না ! যাঃ ! সেই রোজ এক রকম বাড়ি ফেরা, ফিরে গিয়ে পঞ্চাশ বছরের পুরনো কাঁসার থালায় ভাত, ঠাকুমার বিয়েতে পাওয়া খাটে গিয়ে শুয়ে পড়া, উফ্ ! আর পারি না। সকালে দাড়ি কামানো, অফিস, বাড়ি ফেরা, মা–ফা, মাসি–পিসী হ্যানো ত্যানো গুষ্ঠির পিণ্ডি যতো সব, আ হক্ থুঃ ! দাও বারীনদা, তাস দাও। তোমার জন্যই বেঁচে আছি। তবু এখানে এলে একটু মাথায় রক্ত খেলে—

— অবিনাশ, তুই খেল না ! সুবিমল তো রইলো, আমি এবার যাই—

অবিনাশ কোমর সমান উঁচু হয়ে খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেললো। তারপর করুণ কান্নাকান্না গলায় বললো, তোর পায় ধরছি, যাস নি মাইরি। আর একটু, তিন চার দান, তারপর বেরুবো, বাড়ি যাবো নাকি ভেবেছিস্, এরপর অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যাবো তোকে, দেখবি কি জিনিস —

সুবিমল আবার নূরুলের সঙ্গে ওদিকে বসে গুজ গুজ করছে, যথেষ্ট নেশা হয়েছে ওর। বারীনদা তিনখানা করে তাস দিল, আমি চৌকির কোণটায় সরে দাঁড়ালুম, যাতে দু'জনের কারুরই হাত না দেখা যায়। অবিনাশ চেঁচিয়ে উঠলো, উঁহু, ও কী, ও কী ! আগের বার তুমি ট্রায়ো পেয়েছো, এবার চার তাস।

বারীনদা হেসে বললো, তোমার মনে আছে দেখছি !

অবিনাশ বললো, এসো বারীনদা, এখন দু'জন হয়ে গেছি, পুল বাড়ানো যাক। এক টাকা-দু' টাকা। রাজি ?

— ঠিক আছে। নাও, তোমার মুভ।

অবিনাশ তাস তুললো না। বললো, ব্লাইন্ড এক। বারীনদাও তাস না তুলে বললো, এক ! দুই ! তিন !

বারীনদা তাস না তুলেই বললো শো !

অবিনাশ একটু অবাক হয়ে লাল চোখে তাকালো। চার তাশে এর মধ্যেই শো ? অবিনাশ নিজের তাস ওল্টালো। টেক্কার পেয়ার। বারীনদার কিছুই না, বিবি টপ।

অবিনাশ টাকাগুলো টেনে নিয়ে বিড়বিড় করে বললো, তুমি নমস্য লোক বারীনদা, যেবার নিজের হাত খারাপ থাকে কী করে না দেখেই বুঝতে পারো, বলো তো !

বারীনদা সামান্য হেসে উত্তর দিলো, বেশিরভাগ সময়ই আমার মনের মধ্যে কেউ যেন

ফিসফিস করে বলে দেয়। তাস বাঁটবার পরই খানিকক্ষণ আমি চুপ করে বসে থাকি, সেই কথা শুনতে পাই কিনা। যেবার পাই না, সেবার হারা-জেতার ঠিক থাকে না। পেছন দিক থেকে মানুষকে চেনা যায় না কিন্তু তাশের আমি পেছন দিক থেকেও চিনতে পারি!

— অ্যাঁ, ফোঁটা কাটা আছে নাকি? অবিনাশ প্যাকের অন্য একটা তাস তুলে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো —

— ওসব এখানে পাবে না। আমি তো জুয়া খেলি না। আমি তাস খেলি। বাহান্নখানা তাস নিয়ে আমার সংসার। সংসারের মানুষ যেমন কেউ একজন অন্যজনের চোখে খারাপ, কিন্তু আরেকজনের কাছে সে ভালো, কোনো লোক যেমন বউয়ের কাছে মহাপাজী, কিন্তু পাড়ায় সে মহাপুরুষ, অপিসে যে-লোকটা এক নম্বরের ফাঁকিবাজ সেই হয়তো ক্লাবের জন্য জান দিয়ে খাটে, সেই রকমই বুঝলে, সবারই একটা নিজের জায়গা আছে, কাকে কোথায় মানায় দেখতে হবে! অধিকাংশ লোকই হচ্ছে দুরি-তিরির মতো, ভুষিমাল, কিন্তু তাদের তুমি চৌকো কিংবা টেক্কার পাশে বসাও না, কেমন রূপ খুলে যায়।

— থাক্ তোমাকে আর বুকনি ঝাড়তে হবে না। তাশ দিয়েছি, মুভ দাও। ধ্যান করে জেনে নাও, এবার তুমি জিতবে নাকি!

সেবারও অবিনাশ জিতলো, বারো টাকা। আবার তাস দেওয়া হলো, এবার বারীনদা উপুড় করা তাস আলতোভাবে ছুঁয়ে দিয়ে বললো, এবার আমি জিতবো।

অবিনাশ বিদ্রুপের হাঃ-আওয়াজ তুলে বললো, তাই নাকি? দেখা যাক্। এবার আমি সর্বস্ব বাজি ধরবো। নাও, প্রথমেই পাঁচ টাকা হিট।

বারীনদা মৃদুস্বরে বললো, আমারও পাঁচ।

— দশ।

— দশ।

— কুড়ি।

— কুড়ি।

— তিরিশ।

— তিরিশ।

— পঞ্চাশ।

— পঞ্চাশ।

— পঁচাত্তর।

— পঁচাত্তর।

— একশো।

— উঁহু। টাকা কোথায়? মুখে বললে হবে না, বোর্ডে টাকা ফেলো।

— দিচ্ছি টাকা, তুমি দাও না —

— না, বোর্ডে টাকা না রেখে খেলা হবে না।

অবিনাশ পকেটে হাত দিয়ে সারা শরীর খুঁজলো। আর টাকা নেই। অবিনাশ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই সুনীল, তোর কাছে টাকা আছে?

আমি বললুম, আছে, গোটা ষাটেক।

— দে, আমাকে দে।

বারীনদা বললো, না, তা হয় না। তোমার টাকা শেষ হয়ে গেলে, তোমার খেলা শেষ, তুমি প্যাক করে দিয়ে উঠে যাও। খেলার সময় ধার হয় না।

— বাঃ ! ধার না দিয়ে আমি যদি ঘড়ি কিংবা কলম বন্ধক দিয়ে টাকা নিই, তোমার তাতে আপত্তি কি আছে ?

— আমার ঘরে ও সব কারবার চলে না। যতক্ষণ বুকের পাটা আর পকেটে টাকা আছে ততক্ষণ খেলা হবে। ফুরিয়ে গেলে উঠে যাবে। নিয়ম অনুযায়ী তোমার প্যাক করে উঠে যাওয়া উচিত, কিন্তু ঠিক আছে, তোমাকে আমি শো দেবার চান্স দিচ্ছি। পকেটে যা খুচরো আছে, তাই দিয়ে শো দাও। জিতবো তো এবার আমিই —

— তুমি জিতবে ? হাঃ — অবিনাশ ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো — তুমি জিতবে, মাইরি আর কি ? তুমি তাসের সংসার চেনো, আর আমি চিনি না ? অবিনাশ আলতোভাবে তাস তিনটের গায়ে হাত বুলালো। আঃ — হালকা, হালকা, যেন হাওয়ায় উড়ছে, বুঝলি সুনীল, সরস্বতী পুজোর দিন যেমন এক বাড়ির পিঠোপিঠি তিন বোন তিনজনেই বাসন্তী রঙের কাপড় ছুপিয়ে মাথা ঘষে চুল এলো করে রাস্তা দিয়ে উড়তে উড়তে যায়, তিনজনকেই দেখতে এক রকম লাগে— এরাও তাই, না ট্রায়ো বলছি না তিন বোন কী করে ট্রায়ো হবে, বয়সের তফাত নেই ? রানিং ফ্ল্যাশ — দে, টাকা দে, লড়ে যাই।

বারীনদা বললো, না, সুনীল, তুমি টাকা দিও না।

আমি একটু অবাক হয়ে বললুম, তুমি কেন দিতে বারণ করছো, কিছু বুঝতে পারছি না। খেলতে ইচ্ছে হয়, খেলুক না। ইচ্ছেটা চেপে দেবার কি দরকার ?

— নিজের টাকায় খেলুক !

— নিজের এক পকেটের টাকা ফুরিয়ে গেলে যদি অন্য পকেটের টাকা নিয়ে খেলা যায়, তবে বন্ধুর পকেটের টাকা নিতেই বা আপত্তি কি ?

— না, এসব জুয়াড়ির স্বভাব। আমি জুয়া খেলি না, তাস খেলি। টাকার লোভেও খেলি না। আমি তো ওকে শো দেবার চান্স দিচ্ছিই। জিততে হয়, এই বোর্ডের পঁচাত্তর দুগুনে দেড়শো টাকা জিতে নিক না।

অবিনাশ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, চান্স দিচ্ছি মানে ? দয়া করছো ? অ্যাঁ ? খালি বড়ো বড়ো কথা, জুয়া নয়, তাস খেলা ! এই ক'মাসে ক'হাজার টাকা খিঁচে নিয়েছো ? অ্যাঁ ? এখন আমি তাস চিনতে পেরেছি, ওমনি ভয় ?

বারীনদা আহত মুখে বললো, আমি ভয় পাই নি মোটেই। আমি তোমাদের কাছ থেকে টাকা মোটেই খিঁচে নিই নি, তোমরাই হেরেছো। আমার ঘরে বসলে আমার নিয়মেই খেলতে হবে— না ইচ্ছে হয়, এসো না। আমার অন্য অনেক পার্টি আছে, তোমাদের মতো ফালতু লোকদের আমার দরকার নেই —

— এক এক দিন তোমার এক এক রকম নিয়ম ? শ্মশানের পাশে ব্যবসা করো তুমি, এক নম্বরের শকুনি। আজ তোমার চালাকি ভাঙছি, আজ শেষ পর্যন্ত খেলতে হবে।

একটা খালি সিগারেটের টিনে বারীনদার টাকা আর খুচরো রাখা ছিল, চোয়াল শক্ত করে বারীনদা সেটা বাঁ হাতে চেপে ধরলো। তারপর বললো, তোমাকে দু'বার চান্স দিলুম, তুমি নিলে না। আজ খেলা শেষ। —বারীনদা ডান হাত বাড়িয়ে বোর্ডের টাকাগুলো নিতে গেল।

— খবরদার ! অবিনাশ আর বিন্দুমাত্র সময় না দিয়ে শক্ত ঘুষি মারলো বারীনদার চোয়ালে। বারীনদা একপাশে হেলে পড়তেই খুচরোগুলো ঝনঝন করে ছিটকে গেল মাটিতে। আর সময় না দিয়ে অবিনাশ আর একটা ঘুষিতে ওকে খাট থেকে ফেলে দিল। বারীনদা পড়ে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো।

সুবিমল আর নূরুলও উঠে দাঁড়িয়েছে। আমার হয়তো তখন উচিত ছিল, ওদের বাধা দেওয়া,

তাহলে পরে আমাকে অতটা সহ্য করতে হতো না। কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন আমার মনে হলো, শুধু আজকের ঘটনার জন্যই নয়, বারীনদা আর অবিনাশের যেন একটা পুরোনো ঝগড়া আছে। সেটা ওদেরই মিটিয়ে ফেলা ভালো। দু'জন সমর্থ পুরুষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে— সেখানে আমার কোনোই কথা বলার মানে হয় না; নূরুল নেশাচ্ছন্ন গলায় দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে বললো, আমি কোনো দলে নেই। আমি—। সুবিমল চুপ করে দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে। খাটের ওপাশে অবিনাশের লম্বা ভয়ঙ্কর চেহারা। খাটের এপাশে বারীনদা, ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত পড়ছে, লোহার মতো দু'হাত ছড়িয়ে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললো, আয় কুত্তা ...

অবিনাশও হিংস্রভাবে বললো, আয়—

পর্দার ওপাশ থেকে হীরালাল বেরিয়ে এলো, বোধহয় ভাত খাচ্ছিল, এক হাত তখনো এঁটো। অবিনাশের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, এই ওবনাশবাবু কী করছেন কি ! বড্ড নেশা হয়ে গেছে আপনার, যান বাড়ি যান—

অবিনাশ তাকে বাঁ হাতের এক ঝটকা মেরে বললো, সর—

বারীনদাও বললো, তুই সর হীরালাল।

হীরালাল তবু অবিনাশের একটা হাত চেপে ধরলো। এই সময় হঠাৎ কী হয়ে গেল, সুবিমল ছিটকে ওপাশে গিয়ে হীরালালকে বললো, এই, তুই গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন, ছাড় না —

হীরালাল সুবিমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাঁ হাত দিয়ে এক ধাক্কা দিল, নেশায় হালকা শরীর সুবিমলের, টলে পড়ে গেল দরজার কাছে, হীরালাল ঘরের দরজা খুলে হুকুমের সুরে অবিনাশকে বললো, যান, চলে যান। অবিনাশ বললো, চোপ ! এবং সেই সঙ্গেই সুবিমল মাটি থেকেই হীরালালকে একটা লাথি মারলো। হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে এমন জোরে সুবিমলকে লাথি মারলো যে, ধপ্ করে প্রচণ্ড শব্দ হলো তার, সুবিমল দরজা দিয়ে গড়িয়ে গেল বাইরে। সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে পর্দার ওপাশ থেকে হীরালাল একটা বারো ইঞ্চি ছোরা নিয়ে আসতেই অবিনাশও সট্ করে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

তখুনি আমি আঘাতটা পেলাম। আমাকে কিছু ভাববার সুযোগ না দিয়ে বারীনদা চকিতে ঘুরে গিয়ে আমার কানের ওপর একটা এক মণ ওজনের ঘুষি মেরেছে। আমার যন্ত্রণা আর বিস্ময়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশি ছিল, বলা যায় না। আমি এ রকম আক্রমণের কথা কল্পনাই করি নি, আমার মাথার মধ্যে ঝন্ করে উঠলো, এমন ব্যথা পেয়েছিলাম যে, প্রথমে ভেবেছি যে, আমার পিঠে বোধহয় ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। আমি টলে গিয়ে পড়তে পড়তে জানলাটা ধরে সামলে নিলাম। চোখ ঝাপসা, আস্তে আস্তে মুখ তুলে দেখি, দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে নূরুল— মুখ ফ্যাকাশে, মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পরীক্ষিৎ সুবিমল আর অবিনাশ নেই, হীরালালও নেই, খোলা দরজা অনেক দূরে, ইস্ মাটিতে কত খুচরো পয়সা ! একেবারে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে বারীনদা, এমনিতে বারীনদা শান্ত ধরনের মানুষ— এখন অকল্পনীয় নিষ্ঠুর মুখে চুপ, চোখ জ্বলছে, ঠোঁটের পাশে রক্ত। এরই মধ্যে বোধহয় একবার রক্তটা মুছবার চেষ্টা করেছিল, তাই বাঁ গালে একটা রক্তের পোঁচ।

আমি তো কখনো কারুকেই মারতে পারি নি। জীবনে অনেককে মারতে চেয়েছি, ভেবেছি কঠিন শাস্তি দেবো, কিন্তু তাদের সকলেরই হয় আমার চেয়ে গায়ের জোর বেশি, অথবা অনেক কম। সমান সমান কারুকেই তো পাই নি। কারুরই গায় হাত তোলা হয় নি তো এ পর্যন্ত। আর—

কোনো দরকার ছিল না, তবু বোধহয় মারার ঝোঁকেই বারীনদা আমাকে আবার মারলো চোয়ালে। খুব জোর নয়, তবু বুঝতে পারলুম, থুতনির কাছে কেটে গেছে, মাটিতে এক ফোঁটা

রক্ত দেখে মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা না করলে হয়তো এরা আমাকে মেরেই ফেলবে। কিন্তু প্রথমেই আঘাত করে বারীনদা আমাকে বিষম দুর্বল করে দিয়েছে। আমি মাথাটা না তুলেই বারীনদার দিকে একটা হাত চালালুম অনির্দিষ্টভাবে। বারীনদার কাঁধের পাশ ঘেঁষে একটু আলগাভাবে লাগলো, বারীনদা খপ করে আমার সেই হাতটা চেপে ধরলো। ধরেই মুচড়ে দিলো অসম্ভব জোরে।

আমি কুকুরের মতন আ–আ করে প্রবলভাবে চেঁচিয়ে উঠলুম। বারীনদা আমার মুখ চাপা দিয়ে বললো, চোপ ! তারপর দু'হাত দিয়ে বারীনদা আমার বাঁ হাতটা পিছন দিকে নিয়ে এসে এমনভাবে মুচড়ে ধরলো যে, আমি যেন মৃত্যুযন্ত্রণা পেলাম। আমি ফিসফিসিয়ে বললুম, বারীনদা, আমাকে আর মেরো না, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ছি —

তখনই আমি একটা জিনিস লক্ষ করেছিলুম যে, বারীনদা আমার বাঁ হাতটা মুচড়ে ধরেছিল, কিন্তু আমার ডান হাতটা তখনও সম্পূর্ণ মুক্ত, সেটাও অবশ হয়ে আছে। ডান হাতটা দিয়ে আমি বারীনদাকে একটা মারতে পারতুম, কিন্তু ডান হাতটা তোলারই কোনো সামর্থ্য নেই, সেটা এমনি ঝুলছে, কোনো কাজেই লাগলো না, যেন আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, ডান হাতটা নূরুলের মতো নিস্পৃহ বা পরীক্ষিতের মতন অজ্ঞান, সে মারামারির মধ্যে যেতে চায় না।

বারীনদা বললো, খুব বন্ধুত্ব দেখাচ্ছিলি, অ্যাঁ ?

— বারীনদা ছেড়ে দাও, তোমার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই। আঃ, ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে ধরছি।

— ধর্, পায়ে ধর্ ...

— নিচু হতে পারছি না।

বারীনদা হাত সামান্য আলগা করলো। আমি মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে অসহায়ভাবে মুখ তুলে বললুম, বারীনদা, আমাকে অপমান করে তোমার কি লাভ ?

— ধর, পায়ে ধর আগে। এবার নাক খৎ দে।

বিষম দুঃখে আমার বুকটা খুব হালকা হয়ে গেল হঠাৎ। আমি শান্ত ছেলের মতন নাক খৎ দিয়ে খাটের পায়া পর্যন্ত এসে, সেইরকমভাবেই মুখ রেখে বললুম, কতখানি ? আমি সারা ঘরে নাক খৎ দিতে পারি, তুমি তাই চাও ? আমি তোমার পা ধরে তোমার পায়ের তলা থেকে ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকাতে পারি। তুমি তাই চাও ? বলো, তুমি কি চাও ? বেঁচে থাকার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। বলো—

— যা, এবার বেরিয়ে যা, আর কখনো আসিস না।

আমি সেইরকমই শান্তভাবে বললুম, না, যখন আবার আসবো, একা আসবো।

— একা কেন, গুণ্ডার দল নিয়ে, পুলিশ নিয়ে— যেমন ইচ্ছে আসতে পারিস, বারীন সামন্ত কারুকে গ্রাহ্য করে না—

আমি সেইরকম শান্তভাবে বললুম, না, যখন আবার আসবো, একা আসবো।

সিঁড়িটা অন্ধকার। কোনো শব্দ নেই। দিনের বেলা এখানে বাজার বসে— সেই তুমুল গোলমালের কথা মনে পড়লেই এখানকার নিস্তব্ধতা এত গাঢ় মনে হয়। তা ছাড়া, এখন আমার মাথায় কোনো শব্দও ঢুকবে না। নিচের ধাপে হীরালাল ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতের ছুরিটা দেখা যাচ্ছে না, আমায় দেখে হীরালাল ফটফটে সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসলো। আমি একটু দাঁড়ালুম। সরু গলিতে হঠাৎ ষাঁড়ের মুখোমুখি এলে যেমন মনে হয়, ষাঁড়ের শান্ত অন্যমনস্ক মুখ—পাশ দিয়ে গেলে গুঁতোতেও পারে, না গুঁতোতেও পারে, দু'একজন লোক পাশ দিয়ে সরু হয়ে চলে যায়, ষাঁড় কিছুই বলে না, আবার কোনো একটা লোককে দেখে হঠাৎ শিং নাড়া দেয়—

আমি ঠিক সেইরকম দ্বিধায় পড়লুম। আমিও হীরালালের দিকে তাকিয়ে হাসলুম। তারপর এক পা এক পা করে নেমে আসার সময় আমার সমস্ত শরীর শিরশির করতে লাগলো। আমি বুঝতে পারছি যে, আমি একটা বোকামি ভরা দুঃসাহসের কাজ করছি। হীরালাল তার শিং নাড়া দিয়ে উঠবে কিনা, কিছুই ঠিক নেই, কিন্তু এখন আর থামা চলে না, এখন আমার নেমে যেতেই হবে। আমি দুর্বল ভাঙা হাসি দিয়ে বললুম, কী হীরালাল ? হীরালাল আফশোস করার সুরে উত্তর দিল, কী যে ঝঞ্ঝাট করেন !

ওকে পেরিয়ে আসার পর হীরালাল সাধারণ গলায় বললো, যান্, ঐ দু'বাবু রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবু ! একটু আগে সুবিমলের পেছনে অত জোরে লাথি কষাবার পর, এখনও সুবিমলকে বাবু বলছে হীরালাল। হাজার হোক, চাকর তো ! ওকে দু'চার আনা বকশিস দিয়ে আসা উচিত ছিল বোধ হয়।

বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি এসেছে। সারা রাস্তা জুড়ে বৃষ্টির চট্‌চট্ শব্দ। আমি দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের গাড়ি–বারান্দায় এলাম। সুবিমল একটা দোকানের রকে এলিয়ে বসে ছিল, অবিনাশ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আমারই অপেক্ষায়। উত্তেজিতভাবে বললো, তোর কিছু হয় নি তো ? আমি তোর জন্যে আবার যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সিঁড়ির মুখে হীরালালটা এমন ছুরি নিয়ে—

আমি বললুম, না ঠিক আছে !

— এক নম্বরের গুণ্ডা। আমি পুলিশ এনে ওদের ধরাবো ...

— সুবিমলের কি হোল ?

— কিছু না, ওর নেশা হয়েছে বেশি। তুই বারীনকে কয়েকখানা ঝেড়েছিস তো ? ইস্, তোর থুতনিতে রক্ত কেন ? চল্ পানের দোকান থেকে চুন লাগিয়ে দি।

— না, না, চুন লাগালে ঘা সারতে দেরি হয়। এবার বাড়ি চল। তখনই বললুম বাড়ি যাই, তোর জন্য থেকে গিয়ে—

অবিনাশ বেশ খুশি গলায় বললো, বারীনকে আমি যা দু'খানা কষিয়েছি ওর সারাজীবন মনে থাকবে— তুই দু'একখানাও দিতে পারলি না ?

আমি খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করছিলুম, মাথার মধ্যে ঝিমঝিমুনি তখনো কমে নি, আমি বললুম, নাঃ ! আমাকে বেকায়দায় পেয়ে, উঃ কানে এত জোরে মেরেছে, এখনো, ওঃ, তোর জন্যে এরকম মার খেলুম।

অবিনাশ আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলো, তুই দেখিস্, বারীন তোকে মেরেছে, আমি যদি তার শোধ না নিই—

— তুই তো উল্টোদিকে যাবি। তুই সুবিমলকে নিয়ে যা, আমি একটা আলাদা ট্যাক্সি ধরছি।

— দাঁড়া না। একটা সিগারেট দে। আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগছে বুঝলি, ব্যাপারটা বেশ জমে গিয়েছিল। হীরালালটা যদি ছুরি না বার করতো, আমি ওদের শুয়োর পেটা পেটাতুম। আমি ভেবেছিলুম তুই বারীনকে একা অনায়াসে ... আচ্ছা দ্যাখ না, ওর দোকানে আমি আগুন জ্বালিয়ে দেবো ! তোর গায় হাত তুলেছে, আমি তার এমন শোধ নেবো—

— ছেড়ে দে না, তুই বারীনদাকে মারলি, বারীনদা তার শোধ নিলো আমার ওপরে, আবার আমাকে মারার শোধ নিবি, ও হয়তো তার শোধ নেবে পরীক্ষিতের ওপর—

— তাই তো, পরীক্ষিৎটা ওখানে রয়ে গেল, ওকে যদি ...

— থাক্, পরীক্ষিতের কিছু হবে না, ট্যাক্সি—

আমাকে ট্যাক্সি পর্যন্ত তুলে দিতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অবিনাশ বললো, পাঁচটা টাকা দিয়ে যা, আমি ফতুর।— তারপর একমুখ হেসে বললো, আজকের ব্যাপারটায় সবচেয়ে কী ভালো হলো বল্ তো ?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ক্লিষ্টভাবে হাসলুম। অবিনাশ কী বলতে চায় আমি বুঝতে পেরেছি। বললুম, বারীনদার কাছে আর কখনো আসতে হবে না —

— উঃ, বাঁচলুম। চুম্বকের মতো এ জায়গাটা টানতো, এমন নেশা হয়ে গিয়েছিল। তাসের জুয়া খেলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয়! অথচ, অনারেব্‌লি ছাড়তেও পারছিলুম না, এখানে আসা বন্ধ করার কোনো যুক্তিও তো পাচ্ছিলুম না মনে মনে। যুক্তির চেয়ে মারামারি কত ভালো। একটা মারামারিতে ব্যাপারটা চুকে গেল — আর এখানে আসতে হবে না কোনোদিন। রিলিভ্‌ড্ ! কি রকম কায়দা করে ঝগড়াটা বাধালুম, দেখেছিস ?

— আর সেজন্য মার খেতে হলো আমাকে। চললুম—।

শেখরের মা সকাল সাড়ে ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ঠাকুর ঘরে থাকেন, আমি জানতুম, সেই হিসেব করেই গিয়েছিলাম, এগারোটা আন্দাজ। কিন্তু তিনি তখনও ঠাকুর ঘর থেকে বেরোন নি। শেখরের ছোট বোন তপতী আমাকে বললো, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

আমি শেখরের ঘরেই গিয়ে বসলুম। পরিতোষ ইউনিভার্সিটিতে চলে গেছে, তপতীর এখনো বি.এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোয় নি বলে বাড়িতে বসে মোটা হচ্ছে। আর বেশি মোটা হয়ে গেলে, ওর বিয়েটিয়ে হওয়াই মুশকিল হবে। একেই তো তপতী কানে খুব কম শোনে, প্রত্যেকটা কথা চোখের দিকে না তাকিয়ে বললে বুঝতেই পারে না। কিন্তু সব সময় কে একটা মেয়ের দিকে চোখাচোখি করে কথা বলতে পারে, অনেক কথাই তো চোখ নামিয়ে বলার, সেইজন্য আমি পারতপক্ষে তপতীর সঙ্গে খুবই কম কথা বলি। যেমন, এইমাত্র তপতী জিজ্ঞেস করলো, আমি চা খাবো কি না ! চা খাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই আমার, আমার বলা উচিত ছিল, আমি অফিস যাবার জন্য ভাত খেয়েই বেরিয়েছি, এখন আর চা খাবো না, কিন্তু এতবড় সেন্টেন্সে যদি তপতী শুনতে না পেয়ে বুঝতে না পারে, যদি এরপরও ও অনুরোধ করলে আমাকে আরও বড় সেন্টেন্স বলতে হয়, এই ভয়ে আমি কোনো কথাই না বলে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম। তপতী চা আনতে গেল।

শেখরের ঘরের টেবিল ক্লকটা বন্ধ হয়ে আছে, কেউ দম দেয় নি। তিনটে চিঠি টেবিলে রাখা, কেউ খোলে নি। একটা বই আদ্দেক পড়া অবস্থায় উল্টে রাখা— এসব দেখলে গা ছম্‌ছম্ করে, মনে পড়ে মৃত্যুর কথা। কিন্তু শেখর মরবে কেন, না, ওর মরার কোনোই সম্ভাবনা নেই, আমি নিশ্চিত জানি, শেখরের যত কিছু পরীক্ষা— সবই ওর জীবন নিয়ে, জীবন শেষ করার জন্য না। শেখর দীর্ঘদিন বাঁচবে, অন্তত আমার চেয়ে বেশি দিন, অবিনাশের চেয়ে বেশি তো নিশ্চয়ই, অবিনাশের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, ও দুর্ঘটনায় মরার জন্যেই জন্মেছে।

একটা রেকাবিতে কিছু কাটা ফল আর নারকোলছাপা সন্দেশ নিয়ে শেখরের মা ঢুকলেন। সাদা থান পরা ভারী চেহারা, তপতী ওর মায়েরই ধাত পেয়েছে। প্রথমটায় অস্বস্তিতে বসেছিলাম, মুখ নিচু, তারপর সবচেয়ে সহজ কাজটা মনে পড়তেই আমি খুশি হয়ে চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে, ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম। জিজ্ঞেস করলুম, মাসীমা, আপনার শরীর কেমন আছে ?

— ভালো আছি। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। তুমি কেমন আছো ?

— ভালো। আমি —

— তোমার মা-বাবা এখন কোথায় ?

— ওঁরা তো বহরমপুর থেকে কয়েকদিন আগে এসে সেজকাকার বাড়িতে উঠেছেন। আমার দাদামশাইয়ের খুব অসুখ তো —

— কী হয়েছে ?

— স্ট্রোকের মতন, পি-জি'তে আছেন, সবাই খুব ব্যস্ত, আমিও কয়েকদিন হাসপাতালে ছোটাছুটি করে আর সময়ই পাচ্ছি না —

— তোমার থুতনিতে কাটলো কি করে ?

— ও কিছু না, কাল তাড়াতাড়িতে ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ ... আমি ...

— তোমার দাদামশাইয়ের বয়েস কত হোল ? প্রায় পঁচাত্তর, না ? রিন্টুর বিয়েতে ওঁকে একবার দেখেছিলাম, ওরকম ভালো স্বাস্থ্য,— উনিই তো তোমাদের মানুষ করেছেন ! তোমার বাবার বাবা তো —

— হ্যাঁ, আমার ঠাকুরদা খুব অল্পবয়েসে মারা যান। আমরা চোখেই দেখি নি ! আমরা দাদামশাইর কাছেই মানুষ।

— যাক্ উনি যদি এখন যান, সব দিক ভালো দেখেই তো গেলেন। শুধু, তুমি ছোট নাতি, তোমার বিয়েটা দেখে যেতে পারলেন না—তুমি এখনও বিয়ে করছো না কেন ?

কথাবার্তা সম্পূর্ণ অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। এজন্য তো আসি নি। শেখরের মা'র মুখে তেমন ভয় বা উৎকণ্ঠাও দেখতে পাচ্ছি না, পরিতোষেরই মতো কিছুটা অভিমান। তপতীর মতো উনি কানে কম শোনেন না, কিন্তু প্রত্যেকটি কথা বলছেন আমার চোখের দিকে চোখ রেখে। আমি বৃষ্টিভেজা বেড়ালের মতোন মনটাকে জোরে একবার ঝাড়া দিয়ে প্রস্তুত হয়ে বললুম, মাসীমা, শেখরের কোনো খবর পেয়েছেন ?

উনি একটু চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমার মনে হয় ও কোথাও বাইরেই গেছে। খবর পেলুম, পরশুদিন দুপুরে আপিস থেকে বেরুবার আগে ও কো-অপারেটিভ থেকে পাঁচশো টাকা তুলেছে। কিন্তু একটা খবর যে কেন দিল না! অন্তত টেলিফোনও করতে পারতো। সঙ্গে কিছু জামা-কাপড়ও নিয়ে যায় নি। এমনভাবে তো লোকে সাধু-সন্ন্যাসী হবার জন্য যায়।

আমি সামান্য হেসে বললুম, না, আর যাই হোক, শেখর সাধু-সন্ন্যাসী হবার মতো ছেলে নয়। — কথাটা বলেই মনে হলো, ভুল করলুম। মায়েরা বোধহয় এসব কথা শুনতে চায় না। প্রত্যেক মা-ই বোধহয় চায়, তার ছেলে সাধু-সন্ন্যাসী হোক, কিন্তু সংসারটি যেন না ছাড়ে। সংসারে থেকে, বিয়ে করে, বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে চাকরিতে উন্নতি চালিয়ে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসী সেজে থাকুক। কিন্তু কথাটা এখন আর ফেরানো যায় না।

মাসীমা বললেন, কিছুদিন ধরেই ও বলছিল, ও আলাদা থাকতে চায়। আমি তো তাতে কখনো আপত্তি করি নি, শুধু জিজ্ঞেস করেছিলুম, কেন ? ছেলেরা বিয়ে করে বনিবনা না হলে, বাপ-মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়, সে একটা বুঝি। কিন্তু এমনিই, বাড়িতে ওকে কেউ কোনো কিছুতে বাধা দেয় না, তবু চলে যেতে চায় কেন, বুঝতেই পারি না। তুমি কিছু জানো ?

— না, মাসীমা, আমি তো কিছু শুনি নি।

— ওর কোনো বিপদ হয় নি, তা জানি। বিপদ হলে এতক্ষণে টের পেতাম, আজ ঠাকুরঘরে ঐটে জানার জন্যই বসেছিলুম। আমার মন বলছে, ও যেখানেই যাক্, ভালো আছে। কিন্তু বাড়ি

ছেড়ে যাবার জন্য যদি যায়, তা হলে বন্ধুরা তো অন্তত জানবে। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছো না তো ?

আমি মোজেইক করা মেঝের দিকে তাকিয়েছিলাম। একটা কথা মনে হচ্ছিল, শেখর যদি বাড়ি ছেড়ে যেতেই চায়—তার মধ্যে ওর নিছক স্বার্থপরতা মোটেই নেই। শেখরদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, এ বাড়ির নিচের একগাদা দোকানঘর থেকে ভাড়া আসে, এছাড়া ওদের ডায়মন্ডহারবারের বিরাট বাগানবাড়িটা এক আমেরিকান কোম্পানি লিজ নিয়েছে। শেখর চলে গেলেও ওদের আর্থিক অসুবিধেয় একটুও পড়তে হবে না, শেখর যদি নাগপুরে বা কানপুরে চাকরি নিয়ে আলাদা থাকতো, তাও ঠিক ছিল, কিন্তু কলকাতা শহরে তার আলাদা থাকা কি সম্ভব ? বিয়ে না করে, বৌকে দিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া না করিয়ে ? নিতান্ত নিরুপায় না হলে, কোনো সমর্থ পুরুষের তো একা থাকতে নেই! আমি উত্তর দিলুম, না, মাসীমা, আমি সত্যিই কিছু জানি না।

শেখরের মা এবার সম্পূর্ণ একটা অপ্রত্যাশিত কথা বললেন, গলার স্বর খানিকটা গাঢ় করে বললেন, সুনীল, তুমি অন্তত কথা দাও, এরকম বাউন্ডুলেপনা করে আর নিজের শরীরটা নষ্ট করবে না ?

চমকে উঠে বললুম, আমি ?—তারপর আলগাভাবে হেসে বললুম, মাসীমা, আমি তো কিছু করি নি। শেখর আমাদের মধ্যে একটু একগুঁয়ে ধরনের, ও-ও আস্তে-আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আপনি এত ভাবছেন কেন ?

— শেখরের কথা থাক্। তুমি আমাকে কোনো দুঃখ দেবে না বলো ?

— মাসীমা, আমি আপনাকে কখনো দুঃখ দিয়েছি ? আমি শেখরকে —

— আমি তোমার জন্যই আজ তোমাকে ডেকেছি। তোমার মা থাকেন অন্য জায়গায়, আমিও তোমার মায়েরই মতন।

— সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি তো কখনো —

— তুমি আজ আমার একটা কথা রাখবে ? একবার বাইরে এসো—। তপতী এই সময় চা নিয়ে ঢুকলো। মাসীমা বললেন, থাক্, ঘুরে এসে চা আর মিষ্টি খেও, একবার আমার সঙ্গে এসো, জুতোটা খুলে এসো এখানেই।

মাসীমা আমাকে ঠাকুরঘরে নিয়ে এলেন। আগাগোড়া শ্বেত পাথরে বাঁধানো ছোট্ট ঘর, আতপ আবহাওয়া, পচা ফুল ও চন্দনের গন্ধ, পুজোর ঘরে ঢুকতে আমার সবসময়ই ভালো লাগে। বেশ ঠাণ্ডা লাগে শরীরটা, চোখ দুটো সম্পূর্ণ খুলে তাকানো যায়। মাসীমার মুখখানা থম্‌থমে, শেখর সম্পর্কে যখন কথা বলছিলেন, তখন যেন ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন, নিরুত্তাপ, কিন্তু এখন আমার কথায় এসে মুখখানা কান্নাময়, যেন এখুনি চোখ দিয়ে জল পড়বে। না কাঁদাই ভালো, অন্য কারুর কান্না দেখলে, আমারও আবার চোখ দিয়ে জল আসতে চায়। সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে।

মাসীমা বললেন, তুমি আমার কথা রাখবে তো ? তুমি লক্ষ্মী-জনার্দনের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো, আর ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরবে না, বাবা-মায়ের মনে কষ্ট দেবে না। বলো, আর কখনো ওসব অত্যাচার-অনাচার করে নষ্ট করবে না জীবনটা ? বলো!

আমি হাঁটু মুড়ে বসলুম সোনা বাঁধানো সিংহাসনে স্থাপিত লক্ষ্মী-জনার্দনের সামনে। প্যান্ট পরে কি আর ঠাকুরঘরে এসে বসা যায় ? উরুর কাছটায় বিষম টান লাগে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার মাসীমাকে দেখলুম। আমার বলতে ইচ্ছে করলো, মাসীমা আমি প্রতিজ্ঞা করতে চাই না, কারণ প্রতিজ্ঞা করলে তা ভাঙা আমার স্বভাব নয়। আরও প্রতিজ্ঞা করতে চাই না এ কারণে যে, আমার বয়েস তিরিশ, আমি আমার জীবনের ভালো মন্দ যথেষ্ট ভালো বুঝি, আর যদি না বুঝি, তবে

অন্য কেউই আমাকে এখন আর বোঝাতে পারবে না। তাছাড়া আমি মোটেই আমার জীবনটা নষ্ট করতে চাই না, আমি প্রতি মুহূর্তে আমার জীবনকে শুদ্ধ এবং সৎ করে তুলতে চাইছি, যা আমার মন চায় না, সেরকম কাজ করে কখনো আমি আমার মনকে অপবিত্র করবো না। এজন্য আমার একটা নিজস্ব রাস্তা খুঁজে নিতেই হবে, এজন্য আমি মা-বাবা, ভগবান, অফিসের বড় সাহেব, ভারতের সংবিধান— কারুর অপছন্দ কথাই শুনবো না, আমাকে অনেক পথ ঘুরতে হবে।

কিন্তু মাসীমার উদ্‌গ্রীব মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম, এসব কথা বলা যায় না। মা-মাসী-পিসী যাঁদের আমরা পায় হাত দিয়ে প্রণাম করি, হঠাৎ দেখলে পুরো আস্ত সিগারেটও ফেলে দিতে হয়, তাঁদের কাছে উচ্চারণ করা যায় না এরকম কথা, ওঁদের কাছে এসব হচ্ছে শুধু 'বড়ো বড়ো কথা', এর কোনোই মানে নেই। আহা, আমার সবসময়েই ইচ্ছে হয়, ওঁদের খুশি করে রাখি। মাসীমার ব্যাকুল মুখকে যদি এক মুহূর্তের জন্য খুশি করতে পারি, সেই তো অনেক, এক মুহূর্তের খুশিও জীবনে কম নয়। কী আসে যায়! কাল বারীনদার পায় ধরেছি, আজ লক্ষ্মী-জনার্দনের পা ধরতে পারবো না ?

আমি ঝুঁকে হাত বাড়ালুম। সেই সময় চকিতে আমার যমুনার মুখটা মনে পড়লো। তিন বছর আগে বিয়েবাড়ির উৎসবের মধ্যে সিঁড়িতে দাঁড়ানো ওর পবিত্র কুমারী মুখ। ওর সেই টিয়া পাখির মতন তীক্ষ্ণ সরল চোখ, যে চোখ একটা নীলকান্ত মণির দিকে তাকিয়ে থাকার মতন এই পৃথিবীকে দেখে। যমুনার কথা মনে পড়তেই আমার মনটা হঠাৎ খুব ভালো হয়ে গেল, আমি ঠাকুরের পা ছুঁয়ে অভিভূত গলায় বললুম, মাসীমা, আমি কথা দিচ্ছি, আমি কারুকে কোনো দুঃখ দেবো না, আর কোনো অত্যাচার অনাচার করবো না, আমি শেখরকে ফিরিয়ে এনে দেবো।

৩

বিকেল চারটে আন্দাজ অফিসে আবার ঠিক সুবিমল এসে হাজির। মন দিয়ে কাজ করছিলুম, অর্থাৎ সারা টেবিলের ওপর বহু কাগজপত্র ছড়িয়ে ঘনঘন সিগারেট টানতে টানতে খুব পেন্সিল দিয়ে লেখালেখি করছিলুম, এমন সময় সুবিমল। ওকে দেখে আজ খানিকটা বিরক্ত বোধ করলুম, সুবিমলের একটা স্বভাব হচ্ছে আগের দিনের ঘটনা নিয়ে কথা বলা। তাছাড়া, আজ আমি সুবিমলের সঙ্গে কোথাও যাবো না, আজ আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। তারপর, মা খবর পাঠিয়েছেন, সেজ কাকার বাড়িতে খেতে হবে রাত্তিরে।

সুবিমল চেয়ারে বসেই বললো, সত্যি রে, ঢোকার মুখে তোদের রিসেপসনিস্টকে দেখতে পেলুম না বলে অফিসটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

আমি ওকে ইশারায় চুপ করতে বললুম। কোণের টেবিলে গোবিন্দবাবু বাইরের ডিউটি সেরে এখন কাজ করছেন। গোবিন্দবাবু খানিকটা সিরিয়াস প্রকৃতির লোক, এসব কথা পছন্দ করবে না নিশ্চিত। ও লোকটা আবার প্রায়ই বড় জামাইবাবুর সঙ্গে কি-সব গুজগুজ করে অনেকক্ষণ। হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বললুম, উঃ, এতো কাজ জমে গিয়েছিল। আজ সব পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

—খালি তো বিজ্ঞাপনের কপি লেখা। এ আবার একটা কাজ নাকি ?

আমি দুঃখের হাসি হেসে বললুম, কাজের তুই কি বুঝবি ? সারাদিন বাড়িতে আরাম করে বিকেলে বেরোস আড্ডা মারতে। দাঁড়া, চা-খাওয়া যাক।

টেবিলের ওপর বেলটায় দু'বার টং টং করে আওয়াজ করলুম! বেশ লাগে বেল বাজিয়ে কারুকে ডাকতে। ঐ তো দরজার পাশে ঝরি সিং বসে, টুলে বসা ওর হাঁটু পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, গলার আওয়াজ একটুও জোর না করে ডাকলেও ও শুনতে পাবে, তবু বেল বাজানোই নিয়ম। ডাক শুনে ঝরি সিং যখন টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াবে, তখুনি কিন্তু কথা বললে চলবে না। যেন ওকে দেখতেই পাই নি— এই ভঙ্গিতে মুখ নিচু করে কাজের ভান করে যেতে হবে। খানিকটা বাদে মুখ তুলে— যেন স্বপ্নের মধ্য থেকে বলছি সেই সুরে—বলতে হবে, ও হ্যাঁ, শোনো—। এতে পার্সোনালিটি আসে। চাকরিতে যত উন্নতি হবে, যত উঁচু পোস্টে যাবো, ততোই মানুষকে অবহেলা করতে হবে, শিখে গেছি। তাছাড়া, বেলটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে বনমালীবাবুরাও খানিকটা উৎকর্ণ হয়ে থাকবে— কার এবার ডাক পড়ে। যতই দরকার থাক, আমি তো আর উঠে ওদের কাছে যাবো না, ওদেরই ডেকে আনবো—কারণ আমি ওদের চেয়ে মাইনে বেশি পাই। মাঝে মাঝে অবশ্য ওদের ঘরে গিয়ে ওদের টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে পড়তে হয় মুখে মাইডিয়ার হাসি ফুটিয়ে। সেটাও ট্যাকটিক্যাল। যখন গভর্নমেণ্ট অফিসে কাজ করতুম, আমার টেবিলের কাছেই ছিল অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারি মিঃ চক্রবর্তীর ঘর। যখনি ঘণ্টা বাজতো, আমরা দশ–বারোজন সচকিত হয়ে উঠতুম। ওর বুড়ো আর্দালিটা ঘরে ঢোকার সময় কুকুরের মতন দ্রুত ছুটে যাবে গম্ভীর মুখে, বেরিয়ে আসবে হাসিমুখে হাতির মতন হেলতে দুলতে, টেবিলের সামনে এসে বলতো, সুনীলবাবু, আপনাকে সাহেব ডাকছেন— ড্রাগ কণ্ট্রোলের ফাইলটা নিয়ে যাবেন।—সাহেব! চক্কোবত্তির যা গায়ের রং—রাত্তিরের দিকে ওর নিজের ছেলেমেয়েরাও হঠাৎ অন্ধকারে দেখে ভিরমি খাবে। উঃ, বেঁচেছি, ঐ চাকরি ছেড়ে!

ঝরি সিংকে বললুম, যাও টোস্ট আর চা নিয়ে এসো, গোবিন্দবাবু, আপনি চা খাবেন তো ? তিন কাপ নিয়ে এসো।

গোবিন্দবাবু একটু উঠে যেতেই সুবিমল বললো, ওফ্ কাল অবিনাশটার জন্য শুধু শুধু কি রকম প্যাঁদানি খেলুম বল তো ? কোমরটা এখনও বিষিয়ে আছে।

— আমারও বাঁ হাতটা টনটন করছে। কিন্তু তুই–ই তো মারামারিটা বাড়াতে গেলি।

— আমি ? মোটেই না— ওর সঙ্গে ঝগড়া, আমার তাতে কি —

— তুই হীরালালকে মারতে গেলি কেন ? না হলে, ওরা দু'জনে যা করতো—

— আমি ?

— তোর নেশা ছিল খুব, এখন মনে নেই। যাক্গে, ও কথায় দরকার নেই। শেখরের আর কোনো খোঁজ পেলি না ?

— আমি কোথায় পাবো। এই তো বাড়ি থেকে সবে বেরোলুম।

— সত্যি, শেখরটা একদম হাওয়া হয়ে গেল ?

— বীণার ওখানে খোঁজ করেছিস ? চল্ যাই।

— আমি যাবো না। তুই যা না।

— একলা গিয়ে আমি বীণার খপ্পরে পড়বো! পাগল হয়েছিস ? দু'জনে মিলে তবু যেতে পারি।

— আমার আজ সময় নেই। আমাকে আজ হাসপাতালে যেতেই হবে—দাদামশাইকে দেখতে। কালকেই যাওয়া উচিত ছিল। যদি শেষ দেখা না হয়, অবশ্য শুনলুম আজ অনেক ভালো আছেন।

— তোর কোন্ দাদামশাই ? যিনি চাণক্য সম্পর্কে বই লিখেছেন ?

— হুঁ।

— তোদের ফ্যামিলিতে বেশ লেখাপড়ার চর্চা আছে, না ?

— হ্যাঁ, তোদের মতো মুখ্যু জমিদারের বংশ নয়। এখন আবার তোদের জমিদারিও নেই!

— আহা, ওরকম পণ্ডিত বংশের ছেলে হয়ে তুই নিজে লেখাপড়া কিছুই শিখলি না। তোর গোল গোল চোখ দুটো দেখলেই না আমার গোরুর কথা মনে পড়ে, মাইরি বলছি, রাগ করিস না—

অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার পর সুবিমল জিজ্ঞেস করলো, তোকে হাসপাতালে যেতেই হবে ?

আমি বললুম, হ্যাঁ। তুইও চল না।

সুবিমল বিরক্তির ভঙ্গি করে উত্তর দিল, ধ্যুৎ! হাসপাতালে যেতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। তাছাড়া, নার্সদের সৌন্দর্যচর্চা করাও আমার তেমন আসে না। আজ বাদ দে না, না গেলি। চল্, বীণার ওখান থেকে ঘুরে আসি।

— কেন বারবার বলছিস ? বলছি তো, আমাকে যেতেই হবে। আমি একদিনও যাই নি। শুধু দায়িত্বের জন্য নয়, দাদামশাইকে আমার এমনিতেই একবার দেখা বিশেষ দরকার। আট বছর দেখি নি, কয়েক বছর কাশীতে ছিলেন, তারপর ছ'মাস ধরে বহরমপুরে আসার পরও দেখা হয় নি।

— এক্ষুনি যাবি কী করে ? ট্রামে-বাসে এরকম ভিড়!

— কালও তোর জন্যই যাওয়া হয় নি।

— আমার জন্য?

সুবিমল লাইট পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। তারপর অসহায়ের মতন বললো, আমি তা হলে এখন কোথায় যাই ? আমি সুবিমলের দিকে চেয়ে রইলুম। সুন্দর চেহারা সুবিমলের, নিখুঁতভাবে দাড়ি কামিয়েছে— ফর্সা গালে নীলচে আভা, তেল-চকচকে কালো চুল, ধপধপে সাদা পাট ভাঙা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরেছে, অথচ ওর কোনো কাজ নেই, ওর কোথাও যাবার জায়গা নেই। সুবিমলের মুখখানা এখন করুণ। খানিকটা হতাশার সুরে বললো, তুই চলে গেলে একা আমি কী করবো ? সন্ধেবেলাটা, আচ্ছা, সন্ধেবেলায় মানুষ কোথায় যায় বলতে পারিস ? এই যে এতো লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে— এরা কোথায় যায় ? এরা যাচ্ছে না আসছে ? সন্ধেবেলাটা একা কী করে সময় কাটে ? একা কেউ সিনেমায় যায় ? একা ময়দানে বসে থাকতে পারে ? বাড়ি ফিরে যায় না কি সবাই ? সারাদিন অফিসে কাজ করে লোক বিকেলে বাড়ি ফেরে। আমি সারাদিন বাড়িতে থেকে বিকেলে বেরোই। আড্ডা মারতে না পারলে আর কোথায় যাবো ?

— তুই একটা কাজ-টাজ নে এবার।

— কাজ করি না নাকি ? এই তো রাশিয়ার যৌথ খামার বিষয়ে একটা বিদ্‌ঘুটে বই অনুবাদ করলুম গত মাসে। প্রাণ বেরিয়ে গেছে—তবু যা হোক চারশো টাকা পেয়েছিলুম।

— কম্যুনিস্টরা তোকে এখনো কাজ দেয় ? তোর মতন একটা—

— যে টাকা দেবে আমি তারই কাজ করতে রাজি। রাশিয়ার যৌথ খামার আর আমেরিকার গোয়েন্দা গল্প আমার কাছে একই, অনুবাদ করার কাজ হিসেবে বলছি আর কি! শোন না, আজ দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে, বুঝলি, নিজের একটা লেখা লিখছিলাম। হঠাৎ ভেতরটা ছটফট করে উঠলো। মনে হলো, তখুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে—কোনো একটা জায়গায় আড্ডায় জমে গিয়ে লেখাটার কথা কিছুক্ষণ ভুলে থাকতেই হবে। কিছুক্ষণ ভুলে না থাকলে আমি লেখাটা

সম্পর্কে আন্তরিক হতে পারবো না। একা থাকলেই ও আমাকে পেয়ে বসবে। এখন আমার দরকার প্রচুর মদ খেয়ে হুল্লোড় করা, অথবা বেশ্যা বাড়িতে গিয়ে ফুর্তি অথবা জুয়ায় মন বসানো। এরকম চড়া জাতের কিছু না হলে ওটাকে আমি ভুলতে পারবো না। বেশ্যার বদলে যদি কোনো ভদ্র মেয়ের সঙ্গে— আর কিছু না— ইচ্ছেমতো কথাবার্তা বলার সুযোগ থাকতো আমি তাতেও রাজি ছিলুম, মদ খাওয়ার বদলে জঙ্গলে গিয়ে শিকার করা— তাও রাজি। লেখাটা ভালো করার জন্যই লেখাটাকে কিছুক্ষণ আমার ভুলে থাকা দরকার, আর ভুলতে গেলে একটা কিছু চড়া ধরনের উত্তেজনা চাই, নইলে ভোলা যাবে না, লেখা এমন ত্যাঁদড় জিনিস! শিল্পীদের মডেল দরকার, গায়কদের চাই তবলচী— এসব লোকে মেনে নিয়েছে। আর লেখকদের বুঝি দরকার নেই ? চালাকি পেয়েছিস ?

—তুই আমাকে শাসাচ্ছিস কেন ? আমি এজন্য দায়ী নাকি ?

— নিশ্চয়ই। আমাকে একা ফেলে তোর হাসপাতালে গিয়ে কি গুষ্ঠির পিণ্ডি হবে ?

—আঃ, আমি ছাড়া আর কেউ নেই নাকি ? অবিনাশ কিংবা পরীক্ষিতের খোঁজ কর না—

—অফিস ছুটি হয়ে গেছে—ওদের এখন আমি কোথায় পাবো ? বার ক্রলার হয়ে দোকানে দোকানে ওদের খুঁজবো— আমাকে তুই এমন ছোট লোক পেয়েছিস ? নিজের টাকা থাকলে যে-কোনো মদের দোকানে গিয়ে বসে থাকতুম। কিচ্ছু নেই, এই দ্যাখ পকেট।

—আমার কাছেও আজ টাকা নেই। বন্ধুবান্ধব ছাড়া অন্য কারুর কাছেও তো যাওয়া যায়! তোর আর অন্য কোনো চেনাশুনো মানুষ নেই ?

—মানুষ থাকবে না কেন ? মানুষ তো কতোই আছে—কিন্তু সে-সব কি জিনিস— ভেজিটেবিল কাটলেট। দেখতে অবিকল একরকম, ভেতরে ভুষিমাল। যদি প্রদীপবাবুর বাড়ি যাই— উনি আর ওঁর বউ কতো গল্প করবেন, চা-টা খাওয়াবেন। কিন্তু সেই ভেজিটেবল কাটলেট খাওয়ার স্বাদ। প্রদীপবাবুর বদলে রতনবাবুর বাড়িতে গেলেও সেই —

আমি ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছিলুম। বললুম, তুই প্রেম-ট্রেম করার চেষ্টা কর না, তাতে সময় কাটবে। সেই টেলিফোনের অপারেটারটরা কী হলো ?

—দেখি, কাল একবার যাবো অরুণের অফিসে ...

—তুই আজ কফি হাউস—টফি হাউসে গিয়ে দ্যাখ কারুকে পাস কি না। আমাকে আজ ছেড়ে দে। অ্যাঁ ? প্লিজ —

ভিড়ের ট্রাম-বাসে ওঠার চেষ্টা না করে আমি হেঁটেই পিজি হাসপাতালে চলে যাবো ঠিক করলুম। বড় রাস্তা ছেড়ে সর্টকাটের জন্য ঢুকে পড়লুম ময়দানে। সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে ভেবে নিলুম—তিনটে সিগারেট শেষ হবার মধ্যেই পৌঁছে যেতে হবে। নিজের সঙ্গে এইরকম ওয়াকিং রেস দিয়ে বেশ হন্‌হন্ করে হাঁটতে শুরু করি। ঠাণ্ডা জল-মেশানো হাওয়া দিচ্ছে, মন্দ লাগছে না।

হাসপাতালের মেন গেটের সামনেই বড় জামাই বাবুর সঙ্গে দেখা হলো। উনি দ্রুত বেরিয়ে আসছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, তুমি এসে গেছো ? চলো, তোমার মাকে খবর দিতে হবে। তোমার দাদামশাই কিছুক্ষণ আগে মারা গেছেন। বেশি কষ্ট পান নি, স্বজ্ঞানেই মরেছেন। মরার আগে তোমার কথা বলছিলেন।

আমি থমকে দাঁড়ালুম। ইস্‌, বড় জামাইবাবুকে দেখেও হাতের সিগারেটটা ফেলতে ভুলে গিয়েছি। গোপনে পিছনে ফেলে দিলাম।

আজ কী বার ? আজ বুধবার। আজ গানের ইস্কুল বন্ধ! আজ আমায় শ্মশানে যেতে হবে।

৪

খুব ছেলেবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। আমার বন্ধু তপনকে দেখতুম বাবাকে বলতো বাবুজী, এইরকমভাবে কথা বলতো, বাবুজী তুমি যে আমাকে একটা এয়ারগান কিনে দেবে বলেছিলে, দিলে না, বাঃ! আচ্ছা!— যেন, বন্ধুর মতো। আমরা বাবাকে চিরকাল আপনি বলি। বাড়ির ছোট ছেলে হিসেবে বাবার আদর পাবার বদলে আমি ওঁকে এড়িয়েই চলতুম। বাবা এমনিতেই বেশ গম্ভীর, তা ছাড়া কোনো ব্যাপারেই নিজস্ব মত বদলাতে চাইতেন না বলে, আমারও কথা বলার তেমন উৎসাহ পাই নি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে রথের মেলা দেখতে যাবো কিনা—বাবাকে জিজ্ঞেস করলে উনি শুধু সংক্ষিপ্তভাবে বলতেন, না, তারপরই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেন—যেন এ সম্পর্কে আর কোনো কথাই চলে না। ইস্কুলের থিয়েটারে আমি ইশা খাঁর পার্ট পেয়েছিলাম, জোর রিহার্সাল চলছে—পরিচালনা করছেন আমাদের ইতিহাসের মাস্টারমশাই, এমন সময় বাবা বললেন, না, না, ও আবার পার্ট করবে কি। সেই কথাই চূড়ান্ত হয়ে রইলো। থিয়েটারের দিন আমি ছিলাম চোখের জলের সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে বসে। ছেলেবেলায় বাবার এইরকম গাম্ভীর্য ও কঠিন স্বভাবের জন্য বাবাকে বেশ ভয় ও ভক্তি করতুম, অন্যদের চেয়ে আমার বাবার ধরন-ধারণ আলাদা, কঠোর রকমের নিস্পৃহ—সুতরাং নিজেরা নির্যাতিত হলেও বাবাকে মনে করতুম মহাপুরুষ। ক্রমে বাবার নির্বুদ্ধিতা ও গোয়ার্তুমিগুলো একটু একটু করে চোখে পড়ে। বাবার গাম্ভীর্য আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হওয়া শুরু হয়। সেজ কাকার পকেট থেকে আমি একবার একটা সিকি চুরি করেছিলুম, সেটা জানতে পেরে বাবা আমাকে এমন মেরেছিলেন যে, আমি তিন-চারদিন জ্বরে ভুগেছিলুম তারপর। কিন্তু, সে বছরই শীতকালে আমাদের বাড়ির সবাই একটা করে রঙিন আলোয়ান পেলাম এবং খুব সামান্য চেষ্টাতেই জানা গেল যে, কাপড়ের ব্যবসায়ী হরিদাস শাহুর অসম্ভব ছেলেটিকে বাবা তদ্বির করে টেস্টে অ্যালাউ করিয়ে দিয়েছেন, সেইজন্যই আমরা ওগুলো উপহার পেয়েছি। এরপর থেকে বাবার প্রতি আমার ঠিক ঘৃণা জাগে না, কিন্তু ওঁকে একটা নগণ্য সাধারণ মানুষ হিসেবে জানতে পেরে আমার অনেক বোঝা হালকা হয়ে যায়। দাদা চিরকালই ঠাণ্ডা ধরনের মানুষ, দাদামশাইয়ের কাছে থেকে দাদা অঙ্ক আর সংস্কৃত ভালো করে শিখেছে, দাদা কোনোদিন বাবার কোনো কথার প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু আমি ক্রমশ তেরিয়া হয়ে উঠলুম।

পাকিস্তান হবার পর, দেশ ছেড়ে আমরা কলকাতায় না এসে বহরমপুরে এসেছিলুম বলে আমাদের গায়ে ঠিক রিফিউজির গন্ধ লাগে নি। দাদামশাই বহরমপুরে আগেই শিক্ষকতা করতেন, বাবাকেও ওখানকার স্কুলে একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সকলের সঙ্গে মিশে গেলুম। আমার তিন দিদিই বেশ সুন্দরী বলে স্থানীয় লোকের কৌতূহল ও সহানুভূতি পেতে দেরি হয় নি। দিদিরা তিনজন যখন বেণী দুলিয়ে ইস্কুল থেকে ফিরতো—তখন রাস্তার মোড়ের ছেলেরা বলতো, আর যাই বলিস, বাঙালদের মেয়েরা বেশ সুন্দর হয়!—আমি পেছনে থাকতুম, আমায় কেউ গ্রাহ্যই করতো না। মনে মনে অবশ্য রোজই ভাবতুম—কেউ যদি দিদিদের অপমান করতে আসে— আমি একটা থান ইট ছুঁড়ে মারবো।

ওখানকার বনেদি পরিবার মৈত্রদের বড় ছেলে যেদিন এসে বড়দিকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানায়— সেদিন আমাদের বাড়িতে সৌভাগ্যের আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। বাবা যদিও রাঢ়ী-বারেন্দ্র এসব খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলে প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু মা বিনা পণে দিদির জন্য ওরকম ভালো ঘর-বর পেয়ে বাবার আপত্তি কিছুতেই গ্রাহ্য করেন নি। পরে আমার ছোড়দি

অবশ্য নিজেই জোর করে কায়স্থ বিয়ে করেছে—আর আমিই সেটার ব্যবস্থা করে দিয়েছি বলা যায়। কল্যাণদার চিঠি আমিই তো ছোড়দিকে পৌঁছে দিতুম।

বহরমপুরেই শেখরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বহরমপুরে ওর মামার বাড়ি, প্রায়ই ছুটিতে শেখররা আসতো। আমি একবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছিলুম, তখন শেখর এসে আমাকে মুরুব্বি চালে বললো, তোমার গলার আওয়াজ বেশ ভালোই, কিন্তু র আর ড়-এর উচ্চারণে দোষ আছে। আর যে কবিতাটা তুমি আবৃত্তি করলে সেটার মানে বুঝতে পেরেছো তো ? শুনে আমার বিষম রাগ হয়েছিল, আমি এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে ভেবে নিয়েছিলাম যে, যদি মারামারি হয়—তবে আমি এই বড়লোকের রোগা পটকা ছেলেটাকে অনায়াসে কাৎ করে দিতে পারবো। তখনও পদ্মার গর্জন, আড়িয়াল খাঁ নদীর ভয়ঙ্কর বান, বাণীচকের বিলের হিংস্রতা, বাস্তুভূমি ছেড়ে আসার অভিমান আমার মধ্যে পুরোপুরি ছিল। মানুষ দেখলে প্রথমেই আত্মরক্ষার জন্য শরীরকে সতর্ক করে নিতুম।

কিন্তু শেখরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বহরমপুরের শীর্ণ গঙ্গার পাড়ে শেখরের সঙ্গে বেড়াতে যেতুম। শেখর আমার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়তো। আর্মেনিয়ান গির্জার ভাঙা দেয়ালের পাশে বসে শেখর আমাকে বলতো, আমার ইচ্ছে করে জলদস্যু হয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে। তোর করে না ?

শেখরই আমাকে প্রথম অনিয়ম শেখায়। ভোর চারটের সময় শেখর আমার ঘরের খড়খড়ি তুলে চাপা গলায় ডাকতো, সুনীল, উঠে আয়। আমার গাঢ় ঘুম, সহজে ভাঙে না, শেখর একটা কঞ্চি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমায় জাগাতো। আমি ধড়মড় করে উঠে বলতুম, কী ? শেখর ফিসফিস করে বলতো, চল, লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে মুর্শিদাবাদ চলে যাই। আমি বলতুম, এখন ? বাবা বকবে যে! শেখর বলতো ধুৎ, বেরিয়ে আয় না।

কোনোদিন হয়তো সারা সন্ধে নদীর পাড়ে বসে থাকবার পর শেখর বলতো, চল, আজ আর রাত্তিরে বাড়ি ফিরবো না। আজ সারারাত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকবো—কত লোক তো শোয় ওখানে !

আমি সভয়ে বলতুম, বাড়িতে খুঁজবে না ?

— খুঁজুক না। মরে তো যাচ্ছি না। কাল সকালেই তো বাড়ির লোক আমাদের পেয়ে যাচ্ছে। না হয় একটু বকুনি দেবে!

তারপর শেখর এক ধরনের নিঃশব্দ হাসি দিয়ে বলতো, মাঝে মাঝে একটু-আধটু নিয়ম ভাঙতে হয়, বুঝলি! রোজ রোজ একরকমের জীবন কাটাতে নেই। রোজই ঠিক সময় ওঠা, ঠিক সময় খাওয়া, ঠিক সময় ঘুমোনো—এর কোনো মানে হয় ? ধুৎ! ভাল্লাগে না!

তখন বাড়িতে মা অসুখে বিছানায় থাকে, বাবা কথা বলেন না, দিদিদের নিয়ে সবসময় হৈ-চৈ, বাড়িতে আমার নিজেকে মনে হতো পরিত্যক্ত, অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয়। বাড়ির কথা ভাবলেই আমার মধ্যে আহত অভিমান জেগে উঠতো। যেদিন মেজদি বলেছিল, মাঝে মাঝে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারিস না! কী জামা-কাপড়ের ছিরি! আর দিন দিন যা চোয়াড়ে চেহারা হচ্ছে—তোর জন্য লজ্জা করে আমাদের। সেদিন আমি মেজদির গায়ে গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

রেললাইনের পাশে তিন-চারজন লোককে একটা মাটির কলসি নিয়ে গোল হয়ে বসে থাকতে দেখে আমরা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম। তাড়ি খেয়ে শেখর আর আমি নেশা করলুম,

সেই প্রথম, তখন আমাদের বয়েস ১৪/১৫ হবে।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমার ইচ্ছে ছিল কলকাতায় এসে পড়াশুনো করি, বহরমপুরে আর ভালো লাগছিল না। তাছাড়া, সায়েন্স পড়ার আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাবা কোনো কথাই না শুনে আমাকে জোর করে বহরমপুরে আই.এস-সিতে ভর্তি করে দিলেন। আমি মার কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলাম। কিন্তু মা কিছুতেই আমার পক্ষ নিয়ে বাবাকে কিছু বললো না। মার ওপর তখন আমার বিষম অভিমান জাগে! কলেজে ক্লাশ করার কিছুদিন পর, কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশে হঠাৎ আমার হাতের ধাক্কা লেগে একটা পোর্সেলিনের বিকার আর একটা সালফিউরিক অ্যাসিডের জার উল্টে পড়ে ভেঙে যায়। কলেজ থেকে সেইজন্য আমাকে পঞ্চাশ টাকা ফাইন করে। অথচ আমার কোনোই দোষ ছিল না, আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, সালফিউরিক অ্যাসিড সবটা গায় পড়লে আমি মরেও যেতে পারতুম, বাঁ পায়ে এক ছলক লাগার ফলে এখনও আমার পায়ের পাতা সাদা হয়ে আছে। কিন্তু বাবা এ-খবর শোনার পর, রাগে একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিলেন! ওঁর ধারণা হয়েছিল আমি সায়েন্স পড়তে চাই নি, সেইজন্য ইচ্ছে করেই এসব ভেঙেছি বাবাকে জব্দ করার জন্য। বাবা মাকে বললেন, ঐ কুলাঙ্গার ছেলের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি নিজে তিন দিন ভাত খাবেন না। বাড়িতে সবাই আমার দিকে ছি-ছি চোখে তাকিয়ে রইলো। জ্ঞান হবার পর সেই প্রথম আমি মায়ের কাছে গিয়ে কেঁদেছিলুম, মাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম, আমি ওগুলো মোটেই ইচ্ছে করে ভাঙি নি, ক্লাশ আরম্ভ করার পর আমার সায়েন্স পড়তে তেমন খারাপও লাগছিল না। মা, তুমি বিশ্বাস করো, আমার কোনো দোষ নেই, আমি ইচ্ছে করে ভাঙি নি।

জানি না, মা বিশ্বাস করেছিল কিনা, বাবা করেন নি। সেদিন বাবা কিছুই খেলেন না। দিদিরা সবাই গিয়ে বাবাকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করতে লাগলো, সেদিন আমি কিছু খেয়েছি কি না—তা অবশ্য কেউ লক্ষ করে নি! সেইদিনই শেষ রাত্রে আমি কলকাতায় পালিয়ে আসি খোঁড়া পা নিয়ে। আমি জীবনে প্রথম কলকাতায় আসি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কিন্তু তীব্র ক্রোধ ও অভিমান বুকে ছিল, সেইজন্য কলকাতা আমাকে ভয় দেখাতে পারে নি। শিয়ালদা থেকে হাঁটতে হাঁটতে অনেক পথ ঘুরে আমি বাগবাজারে সেজ কাকার বাড়িতে উঠেছিলাম। তারপরের সাতদিন জ্বরের ঘোরে আমার চেতনা ছিল না।

সেজ কাকার নিজের কোনো ছেলেমেয়ে হয় নি বলে আমাকে ওঁরা খুব ভালোবাসতেন এক সময়ে। সেজ কাকার বাড়িতে থেকেই আমি কলকাতার কলেজে ভর্তি হই, বহরমপুরের সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক প্রায় থাকেই না। প্রথম দু'বছর আমি বিজয়ার পরেও বাবা-মাকে প্রণাম করতে যাই নি। কাকীমা আমার মায়ের অভাব পূরণ করে দিয়েছিলেন, কাকীমা আমাকে প্রচুর হাতখরচ ও অবাধ স্বাধীনতা দিতেন বলেই কাকীমার কাছে আমি কোনোদিন একটাও মিথ্যে কথা বলি নি। ছেলেমেয়ে হয় না বলে কাকা প্রায়ই নানা ডাক্তারকে দিয়ে কাকীমার শরীর খোঁচাখুঁচি করাতেন। তৃতীয়বার অপারেশন করাতে গিয়ে কাকীমার মৃত্যু হবার পর— কাকার বাড়িতে আমার সুখের নীড় ভেঙে যায়।

বাবা আরেকবার এমন একটা অন্যায় করেছিলেন যে মনে হয়েছিল চিরজীবনে বাবাকে আমি ক্ষমা করতে পারবো না। ছোড়দির বিয়ের সময় কাকা আর কাকীমা আমাকে জোর করে বহরমপুর ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে আমি আবার মাঝে মাঝে বহরমপুরে যাওয়া শুরু করি। বি.এ. পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমি বহরমপুরে গিয়ে দেড় মাস ছিলাম, সেই সময় গায়ত্রীর সঙ্গে আমার নতুন করে বন্ধুত্ব হয়। 'ভ্রাতৃসঙ্ঘের' সেক্রেটারি নরেনদা আমায় খুব পছন্দ করতেন, ওঁর বোন গায়ত্রীকে আমি ইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই চিনতাম। কিন্তু সে সময়টা

হাফপ্যাণ্ট ও ফ্রকের রহস্য জানার জন্য খুব মাথাব্যথা থাকে, গায়ত্রীর রোগাটে লম্বা চেহারার দিকে আমার কোনো আকর্ষণই জন্মায় নি। টাউন ক্লাবের দারোয়ান রামশরণ আর তার বউকে একদিন আলগা অবস্থায় দেখে ফেলার পর, অকারণেই আমার রক্ত চনমন করে ওঠে ও আমি ছোড়দির বন্ধু মোটাসোটা পারুলদিকে জড়িয়ে ধরেছিলাম সহসা। পারুলদি খুব একটা আপত্তি করেন নি, আমার গালে একটা টোকা মেরে বলেছিলেন, দুষ্টু! খুব বখাটে হয়েছিস, না ?

সেবার কিন্তু আমি গায়ত্রীকে গিয়ে অন্যরকম দেখলাম। গায়ত্রীর মধ্যে আমি আবিষ্কার করলুম এক রহস্যময়ীকে। লম্বা-টান চেহারা, মাথায় প্রায় আমার সমান, সুন্দর স্বাস্থ্য। আগে যেখানে একটা মজা পুকুর দেখতাম, হঠাৎ যদি সেটা ভরাট হয়ে গিয়ে সেখানে একটা ঝকঝকে হলদে রঙের দোতলা বাড়ি তৈরি হতে দেখি— তাহলে মনটা যে-ধরনের খুশি হয়ে যায়, গায়ত্রীকে দেখে আমার সেইরকম লাগলো। আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটে, কথা বলার সময় প্রত্যেকটা শব্দ যেন আলাদাভাবে আদর করে নেয়। গায়ত্রীও সেবার বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে, বিকেলবেলা লাইব্রেরি থেকে বই বদলে ফেরার পথে গায়ত্রীর সঙ্গে আমার জেলখানার পাশের রাস্তায় দেখা হতো। গায়ত্রীর হাতে দু'খানা বই, প্রত্যেকদিন এক রঙের শাড়ি, অত গরমের মধ্যেও ওর মুখে একটু ঘাম নেই, যেন রাস্তার সবটুকু হাওয়া ও একা শুষে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি প্রথমদিন সত্যি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম, এগিয়ে গিয়ে কথা বলবো কিনা ইতস্তত করছি। আমাকে দেখতে পেয়ে চোখ তুলে চেনা হাসি দিয়ে চলে যায়। তারপর রোজ গায়ত্রীর সঙ্গে বেড়াতে শুরু করলুম।

গায়ত্রীর সঙ্গে আমি কথা বলতুম কম, বুকের মধ্যে কীরকম যেন শিরশির করতো, এরকম ধারণাও হয়েছিল যে, এই যে গায়ত্রীর সঙ্গে আমি বিকেলে বেড়াতে যাচ্ছি, এটা যেন আমার এক বিশাল সৌভাগ্য। আমি যেন এর উপযোগী নই, এই একটা পুরোপুরি আস্ত, গোটা, সম্পূর্ণ যুবতী আমারই কথায় বিকেলেই বাড়ি না ফিরে আমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে সূর্যাস্ত দেখতে যেতে রাজি হয়—এতটা যেন আমার প্রাপ্য ছিল না। ঐ বয়েসটায় মেয়েদের কাছ থেকে অবহেলা, অপমান পাবার জন্যই মন উন্মুখ হয়ে থাকে। গায়ত্রী আমায় বলেছিল, তোমায় আমি সতীনাথ ভাদুড়ির জাগরী বইটা পড়তে দেবো—আমায় বলো তো, বইটা পড়তে-পড়তে তোমার কান্না পায় কিনা ? তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে কিনা, তাহলে বুঝতে পারবো। আমি তো কতবার কেঁদেছি! অথচ, দাদাকে বইটা পড়ালুম, দাদাটা এমন যে, কী রকম শুকনো চোখে আগাগোড়া বইটা পড়ে গেল। পড়ার পর হাই তুলে বললো, মন্দ না, বেশ লিখেছে। আচ্ছা, বলো, এরকমভাবে বই পড়ার কোনো মানে হয় ?

জাগরী তার আগেই আমিও পড়েছি এবং পড়তে পড়তে এমন কেঁদে ফেলেছিলাম যে কাকীমা পাশের ঘর থেকে দেখতে এসেছিলেন ছুটে। কিন্তু গায়ত্রীকে সে-কথা বলতে আমার লজ্জা হয়েছিল তখন। ও কথা তখুনি বলা মানেই তো আমার নিজের মুখে স্বীকার করা যে গায়ত্রীর মনের সঙ্গে আমার মন মিলে যায়। গায়ত্রীকে আরও অনেক কথা বলতে পারি নি, যেমন, তুমি কি চোখে সবসময় কাজল মেখে থাকো, নইলে যে-কোনো কথার সময়েই তোমার চোখ দুটো অমন হাসে কী করে ? হাঁটতে হাঁটতে দু'একবার যখন তোমার গায়ের সঙ্গে আমার গা লেগে যায়, আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে কেন ? মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কী দেখো, আমার কপালে একটা কাটা দাগ আছে, সেইটা ? এসব কিছুই বলি নি।

একদিন গায়ত্রীর সঙ্গে বেড়াবার সময় বাবার সঙ্গে পথে দেখা হয়, উনি তখন হোসেন সাহেবের ছেলেকে পড়াতে যাচ্ছিলেন। বাবাকে দেখেই আমি সিগারেট ফেলে দিয়েছি, গায়ত্রীর সঙ্গে যেন এইমাত্র দেখা হলো ভঙ্গিতে অকস্মাৎ বি.এ. পরীক্ষা বিষয়ক আলোচনা শুরু করি।

বাবা কিন্তু ভূত দেখার মতন থমকে দাঁড়ালেন, অবাক চোখে দেখলেন আমাদের—যেন এরকম একটা দৃশ্য তিনি স্বপ্নেও দেখার কথা ভাবেন নি। একটা ট্রাক আসছে বলে উনি সরে দাঁড়িয়েছেন মনে হতে পারে, কিন্তু আমি জানি উনি আমাকে গায়ত্রীর সঙ্গে দেখেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমার অস্বস্তি হতে লাগলো। বাবা শুধু তাকিয়েছিলেন, কোনো কথা বলেন নি, আমিও কোনো কথা বলি নি। এখন মুশকিল এই, নিজের বাবার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেলে মানুষ কী করে? অন্যদের মতন বাবাকে 'কেমন আছেন' বলা যায় না, চিনতে পারার ভঙ্গিতে মুচকি হাসিও দেয়া যায় না, অচেনা মানুষের মতন চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। আমিও চোখ নিচু করে রাস্তার অন্য মানুষদের মতন বাবাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। গায়ত্রী ওঁকে দেখতে পায় নি।

পরদিন বিকেলে গায়ত্রীর মুখ থমথমে। মনে হয় সারা দুপুর কেঁদেছে। আমাকে বললো, তুমি আর বিকেলে এরকমভাবে এসো না।

আমি আহত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কেন?

— তোমার লজ্জা করে না? ছিঃ! তোমরা সবাই এরকম।

— কী, কী হয়েছে?

— গায়ত্রী ম্লানমুখে বললো, আমার সত্যিই এখন বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। আমাকে জোর কোরো না।

আমি তখনও ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারি নি, তবু শিউরে উঠেছিলাম ও-কথায়। নিরীহ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, গায়ত্রী, ব্যাপারটা কি?

— তোমার বাবা আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। তোমার সঙ্গে আমার ... হ্যাঁ, আমার বাবাকে সেই কথা বলেছেন, আমি নিজের কানে শুনেছি। ছি ছি, এ-কথা তুমি আমাকে নিজে বলতে পারতে না? আগেই বাবাকে পাঠাতে হলো?

অপমানে আমার কান ও নাকের ডগা জ্বলতে লাগলো। সেই বয়সটায় খুব বেশি অপমানিত বোধ করলে আমার তখুনি চোখে জল এসে যেতো। এরকম ব্যাপার আমি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করি নি। বাবা কাল রাত্রে বাড়িতে আমায় কিছুই বলেন নি, বাড়িতে এ নিয়ে কোনো গোলমালও করেন নি। আমি অতিকষ্টে কান্না চেপে বললুম, গায়ত্রী, বিশ্বাস করো, আমি এসব কিছুই জানি না।

— তোমার বাবা বললেন, আমাদের যখন জাতের মিল আছে, তখন এরকম দৃষ্টিকটুভাবে ঘোরাঘুরি না করে—আচ্ছা, আমি অন্যায় কি করেছি? কারুর সঙ্গে একটু বেড়াতে যাওয়াই দোষের? তোমার যদি এরকমই মনের ইচ্ছে, তুমি একথা তোমার বাবাকে বলার আগে তো আমাকে বলতে পারতে!

— আমি কোনো কথাই কারুকে বলি নি।

— আমার দাদা আর বাবা হয়তো রাজি হবেন। কিন্তু, সত্যিই এরই মধ্যে আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। আমার ইচ্ছে আরও লেখাপড়া শিখবো, বিলেতে যাবো। তা নয়, এখনই—

— গায়ত্রী, আমাকে মাপ করো। তোমার কোনো ভয় নেই। পুরো ব্যাপারটাই ভুল।

আমি সেদিন ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরেছিলাম। সদর দরজায় দড়াম করে শব্দ করে ঢুকে সোজা এসেছিলাম বাবার ঘরে। মা তখন বাবার হাঁটুতে তেল মালিশ করে দিচ্ছে। আমি বাবার দিকে চেয়ে তীব্র কণ্ঠস্বর তুলে বলেছিলাম, আপনি কি ভেবেছেন, আপনি যা খুশি তাই করবেন? আমার নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই?

মা তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমাকে ধরে বললেন, তুই এ কি করছিস? পাগলের মতন চেঁচাচ্ছিস কেন?

আমি বাবার ঘরের দরজায় হাত রেখে একটু ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিলাম, উত্তেজনায় আমার চোখ-মুখ জ্বলন্ত। আমি তখনও চেঁচিয়ে বললাম, মা তুমি সরে যাও। তুমি জানো, নরেনদাদের বাড়িতে গিয়ে বাবা কী বলেছেন ?

বাবা বললেন, কেন, তুমি কি বিবাহ করতে চাও না ?

— চাই কিনা চাই, সেটা আমি বুঝবো। আপনি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করতে পারতেন!

— বিবাহ না করে কোনো কুমারী মেয়ের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করা আমি পছন্দ করি না। অন্তত এ বাড়িতে থেকে ওসব চলবে না।

— দরকার নেই চলার। এ বাড়িতে আর আমি কোনোদিন থাকতে আসবো না। মনে করবেন, আপনার ছোট ছেলে মরে গেছে। আমার সম্বন্ধে আর কোনোদিন কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে।

মা বললেন, ছি ছি, তুই এ কী রকমভাবে কথা বলছিস—

সেই দ্বিতীয়বার আমার বহরমপুর ছেড়ে আসা। তারপর থেকে আর বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতে চাই নি। কাকীমা বেঁচে থাকা পর্যন্ত দেড় বছর সেজ কাকার ওখানেই ছিলাম, কিন্তু বহরমপুর থেকে বাবা-মা কিংবা দাদা কখনো এলে দেখা করতুম না, সেই ক'দিন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে থাকতুম। আমার প্রতি কাকীমার প্রশ্রয় ছিল অফুরন্ত, কখনো হয়তো রাত তিনটের সময় বাড়ি ফিরে দেখতুম, কাকীমা আলো জ্বেলে তখনও বসে আছেন। আমাকে বলতেন, এই বয়সের ছেলেদের একটু-আধটু অনিয়ম করা ভালো। তবে দেখিস, স্বাস্থ্যটা যেন নষ্ট না হয়।

কাকীমার নিজের স্বাস্থ্য খারাপ ছিল না, রোগা কিন্তু সতেজ শরীর, প্রত্যেকটি হাসির কথায় ঠিক সময় এমন নিখুঁতভাবে হাসতে আর কোনো নারীকে দেখি নি আমি, হাসির সময় কাকীমার চশমা ও চোখ ঝলসে উঠতো। তবু শুধুমাত্র ছেলেমেয়ে না হবার অপরাধে কাকীমাকে হাসপাতালে গিয়ে বেঘোরে মরতে হলো।

তারপর কাকার সঙ্গে আমার খিটিমিটি বাঁধতে শুরু করে ও একদিন বেশ ঠাণ্ডা মাথায় আমি কাকার বাড়ি ছেড়ে মৌলালির কাছে একটা মেসে উঠে আসি। তারপর থেকেই কলকাতার সঙ্গে আমার সত্যিকারের আলাপ-পরিচয় শুরু হয়।

আমি কলকাতার প্রতিটি রাস্তাকে আলাদাভাবে উচ্চারণ করে করে দেখতে চেয়েছি। এই ছন্নছাড়া আত্মবিস্মৃত শহর, এর পার্ক স্ট্রিট আর কলাবাগানের বস্তি, ক্যানিং স্ট্রিট আর নিউ আলিপুর, মাটির নিচের দোকানে হিজড়েদের নাচ, ওয়েলেসলি স্কোয়ারের সখী-সখী বালক, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট-চিৎপুর-বৌবাজার-গ্রে স্ট্রিট-টালিগঞ্জে ধাপে ধাপে দর নেমে আসা বেশ্যার দল, রাত্তিরবেলা ভাঙা টিউবওয়েলের মধ্য থেকে বার করে আনা চোলাই মদের বোতল, চীনে পাড়ায় ঝিনুকের সঙ্কেতে চণ্ডুর আড্ডা খুঁজে পাওয়া, হাওড়া ব্রিজের নিচে কড়ি খেলার জুয়া— এসবের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ আমি নিজেকে শক্ত ও খাঁটি করে তুলতে লাগলুম। এসবের সন্ধান পেতে একটুও অসুবিধে হয় নি। একটা পেলেই অন্যগুলো পরপর আসে, যেমন রাত বারোটায় পানের দোকানে দাঁড়িয়ে বাংলা মদ খেতে গেলে, আশপাশে আরও যে তিন-চারজন লোককে খেতে দেখা যাবে—তাদেরই কেউ গল্পে গল্পে বলে দেবে হিজড়ে নাচের আড্ডার ঠিকানা। প্রথমদিকে দু'বার থানায় ধরা পড়ে পেটি কেসে দশ টাকা করে ফাইন দিয়ে এসেছি। পরে সব জায়গা এমন চেনা হয়ে যায় যে, পুলিশ দেখলে ঘুষ দেবার আগে টাকা ভাঙিয়ে নিয়েছি তার কাছ থেকেই।

এসব জায়গায় সাধারণত শেখর আর আমি একসঙ্গে যেতাম। তবে আমাদের দু'জনের

মতলব ছিল দু'রকম। শেখরের চরিত্রের মধ্যে একটা অদ্ভুত অস্থিরতা আছে, কোনো কিছুতেই ও বেশিদিন মন বসাতে পারে না, যেজন্য আজ পর্যন্ত কোনো একটা মেয়েকে ভালোবাসতে পারলো না। মেয়েদের প্রতি শেখরের ব্যবহার যেন খানিকটা স্নেহ মাখানো। সমবয়স্কা কোনো মেয়ে বা বেশ্যাকে শেখর যখন চুমু খেয়েছে, তাও যেন স্নেহচুম্বন। অনেক সময়েই শেখর মেয়েদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছে, আহা, তুমি বড় দুঃখী! চোখের দিকে তাকিয়ে শেখর কী দুঃখ দেখতে পায়, কে জানে! শেখর এসব জায়গায় যেতো নতুনত্বের খোঁজে, যে-কোনো জায়গাতেই প্রথমবার গিয়ে ও অসম্ভব খুশি হয়েছে, আবার ক'দিন বাদেই খুঁজেছে অন্য কিছু। যে উৎসাহ নিয়ে শেখর ওয়াই.এম.সি.এ-তে টেবিল টেনিস খেলতে বা ফ্লাড রিলিফের ভলান্টিয়ার হয়ে আসামে গেছে—ঠিক সেই একই উৎসাহে ও হৈ-হৈ করেছে বৌবাজারের নিচু পাড়ায়, নিমতলা শ্মশানে গিয়ে ভিখিরিদের সঙ্গে শুয়ে থেকেছে।

আমি নিজের জন্য একটা যুক্তি তৈরি করে নিয়েছিলুম। বাড়িঘর ছেড়ে এসে নিজেকে একলা বোধ হতো, তখন আরও মনে পড়তো, আমি শুধু বাড়িঘর বা বাবা-মাকেই ছেড়ে আসি নি, আমি আরও অনেক কিছু ছেড়েছি। যে জায়গায় আমি জন্মেছিলাম, তাও আমাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। আমাদের গ্রামের পাশে ছিল দুর্দান্ত আড়িয়াল খাঁ নদী—চিরকালের মতো সেই নদীটা আমি হারিয়েছি, বাড়ির ঠিক পাশেই ছিল বুড়ো বাতাবি লেবুর গাছ— সেটাকেও হারিয়েছি এ-জন্মের মতো, টিয়া-ঠুঁটি আমগাছটার নিচে আর কখনো ছুটে যাবো না কালবৈশাখীর ঝড়ে, শ্মশানখোলার বটগাছে আর শুনবো না সেই তক্ষকের ডাক, বাঁশের সাঁকোর ওপর বসে নিচের ঘূর্ণি জলে খলসে আর বাঁশপাতা মাছের খেলা দেখা, আদিগন্ত এক বুক সমান সেই পাটক্ষেতের মধ্যে আমার কৈশোরের একা ঘুরে বেড়ানো— সেখানে আর কোনোদিন ফিরে যাবার উপায় নেই। শুধু বাবা-মাকে ছেড়ে আসাই নয়, চিরজীবনের জন্য একটা নদী বা একটা প্রান্তরকে হারাবার দুঃখও কম নয়। বহরমপুরে থাকতে তেমন মনে পড়ে নি, কিন্তু কলকাতায় এসেই আমার প্রবলভাবে মনে পড়েছিল জন্মভূমির গ্রামের কথা, খেজুর রসের গন্ধ আর জলের স্রোতের শব্দ। সেসব হারাবার দুঃখেই আমি যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক কিছু হারাতে হারাতে মানুষ এমন একটা জায়গায় আসে, যখন তাকে হারাবার নেশায় পেয়ে বসে। আমিও ঠিক করেছিলাম, আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলবো—ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, বিশ্বাস-অবিশ্বাস। নতুন জায়গায় যখন একা নিজেকে বাঁচতে হবে—তখন আমি বাঁচবো আমার নিজের তৈরি করা নিয়মে, নিজের পছন্দমতো ভালো-মন্দ নিয়ে। গোড়া থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে নিজেকে একটা গোটা মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। এইসব ভাবতুম আর কি।

আরও একটা ভালো যুক্তি ছিল। আমি এই শহরে আগন্তুক, কিন্তু আমাকে যেন কেউ গাঁয়ের ছেলে বলে চিনতে না পারে—সেটাও দেখতে হবে। আমাকে নিরীহ বোকা ভেবে এই শহর যাতে আমাকে পিষে না মেরে ফেলে তাও লক্ষ রাখা দরকার। আক্রমণটা কোন্‌দিক থেকে আসবে তা জানি না, তাই তন্নতন্ন করে এ শহরকে আমি চিনতে চেয়েছিলাম। সেই সময় আমি নিউ আলিপুরে এক বাড়িতে টিউশানি করতাম, সেটা ছিল এক অসম্ভব বড়লোকের বাড়ি, ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টসের বিরাট ব্যবসাদার। বাচ্চা দুটো ছেলেকে পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতুম ঐ বাড়ির প্রতিটি আসবাব, লোকেদের ব্যবহার, ছাত্রদের তরুণী দিদির হাঁটার দুলকি চাল, অ্যালসেসিয়ান কুকুর নিয়ে আদিখ্যেতা, বাড়ির কর্তা আমার সঙ্গে বা চাকরদের সঙ্গে যে-গলায় কথা বলেন, বউয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় আবার গলার আওয়াজ কি রকম বদলে যায়, টেলিফোন বেজে উঠলে মানুষ কি রকম বেড়াল বা কুকুর হয়ে ছোটে, তাও দেখেছি। নিউ আলিপুর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে আসতুম খালাসীটোলায় দিশি মদের

দোকানে— সেখানে মেথরের পাশে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেব, ঠেলাওয়ালার পাশে মধ্যবয়েসী শিল্পী ও পকেটমার, এদের সঙ্গে সমান হয়ে বসে থেকেছি। অবশ্য, বড়লোকগুলো সবাই বাজে মার্কা আর গরীব কুলিমজুররা খুব চমৎকার লোক—এরকম ভুল ধারণা আমার ছেলেবেলাতেও হয় নি। প্রত্যেকটা লোকই আলাদা, এইজন্য বহু রকমের আলাদা মানুষকে দেখার জন্য নেশা আমায় পেয়ে বসেছিল। মানুষ সম্পর্কে ব্রজেশ্বরদা একটা ভালো কথা বলেছিলেন। ব্রজেশ্বরদা মেসে আমার সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন, লম্বা মধ্যবয়সী পুরুষটি, মেসের অন্য লোকেরা ওকে একটি পাকা বদমাশ বলে জানতো। কিন্তু ব্রজেশ্বরদা আসলে একটি দার্শনিক, আমি দৈবাৎ ওঁর সঙ্গে এক ঘরে থাকার জায়গা পেয়েছিলাম। মার্টিন বার্ন অফিসে কেরানিগিরি করেন যদিও, কিন্তু ব্রজেশ্বরদার মেজাজটা পুরো জমিদারী। ওঁর শখ ছিল দু'টি, যতো রাজ্যের পুরোনো বই পড়া আর সন্ধেবেলা নিষিদ্ধ পাড়ায় গিয়ে মদ খাওয়া। ফর্সা চেহারা, মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল, ব্রজেশ্বরদা আদ্দির পাঞ্জাবি গায় দিয়ে মুচকি হাসতে হাসতে বেরুতেন সন্ধ্যেবেলা। আমাকে বলেছিলেন, মানুষ কী রকম জানিস ? ন্যায়শাস্ত্রে একটা কথা আছে, তৃণারণিমণি ন্যায়। তৃণ, অরণি আর মণি এরা তিনটেই মাত্র এক বিষয়ে এক—এই তিনটেই আগুন জ্বালাতে পারে, কিন্তু ওরা কি এক ? ওরা সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষও তেমনি, সবারই গায় মানুষ মানুষ গন্ধ—এইটুকুই মিল, আসলে সবাই আলাদা, কেউ শুয়োরের বাচ্চা, কেউ ইঁদুরের বাচ্চা, কেউ দেবতার বাচ্চা। দেবতার বাচ্চা অবশ্য এ পর্যন্ত একটাও দেখি নি। মরার আগে অন্তত একজনকেও দেখে যাবো, আশা করে আছি।

ব্রজেশ্বরদা মাঝে মাঝে আমায় সন্ধেবেলা ওঁর সঙ্গে নিয়ে গেছে নানান অদ্ভুত জায়গায়। একদিন ওঁর সঙ্গে তেলেঙ্গাবাগানে গিয়ে এমন সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে পড়েছিলুম যে আর একটু হলেই প্রাণটা যেত। ব্রজেশ্বরদা কিন্তু হাসতে হাসতে বলেছিল, এসব কী জানিস, এসব হচ্ছে তন্ত্র সাধনা। আত্মাকে শুদ্ধ করতে গেলে বীরাচার পশ্বাচার সবরকমই করে দেখতে হয়। সুরা দেখলেই সূর্য দর্শন করতে হয়—এও যেমন সাধনা, তেমনি রাত্রি দর্শনের জন্য শরীরের মধ্যে সুরা ঢুকিয়ে ফেলতে হয়। বুকের মধ্যে যেদিন মত্ত ভ্রমরীর নিঃশ্বাস শুনতে পাবি, সেইদিন বুঝবি জীবনটা সার্থক হলো। জানিস এসব ? না, তোরা তো শুধু ইংরেজি পড়িস। অ্যালকেমি জানিস— কী রকম পুড়িয়ে পুড়িয়ে সোনা তৈরি করতে হয় ?

আমি বলেছিলাম, ব্রজেশ্বরদা, তুমি তো নিজে এসব অনেক করলে, তোমার কি সিদ্ধি হয়েছে ? তুমি কি শুদ্ধ মানুষ হয়েছো ?

বড় নিঃশ্বাস ফেলে ব্রজেশ্বরদা উত্তর দিলেন, না! আমার মধ্যে জিনিস ছিল না। সেটা তো আগে বুঝি নি। আয়নার ওপর ফুঁ দিলে আয়নার গায়ে একটা সূক্ষ্ম পর্দা পড়ে, আর জলের ওপর ফুঁ দিলে পর্দাটা সরে যায়। আগে থেকে আয়না কি জল—তা তো চেনা যায় না, জীবনের অনেকখানি কাটিয়ে এসে চিনতে হয়। ভুল হলেও তখন দুঃখ নেই, তবু তো চেষ্টা করেছিলুম।

কিন্তু এসব যুক্তির ভুল আমি ক্রমশ বুঝতে পারি। এসবই মনকে চোখ-ঠারা যুক্তি। নিজেকে তৈরি করছি এই ভেবে নিচু অসামাজিক জগতে ঘোরাফেরা করতে করতে একদিন বুঝতে পারলুম, আমার যুক্তিগুলো আসলে ছলছুতো, যে-কোনো অবৈধ বেআইনী কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার মধ্যেই যে একটা নেশা আছে, সেই নেশার ঘোরেই ওখানে ঘুরছি। যার যেখানে অহঙ্কারের তৃপ্তি। খুব একটা ধনীর বাড়িতে সফিসটিকেটেড পরিবারের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলে কী রকম একটা অস্বস্তি হয়; মনে হয় জুতোর কোণে একটু কাদা লেগে আছে— ওরা না দেখে ফেলে, হাতের কাপ থেকে যদি একটু চা ছলকে দামি কার্পেটে পড়ে তাহলে কী যেন একটা কেলেঙ্কারি হবে, প্যান্টের নিরীহ জায়গারও একটা বোতাম ছিঁড়ে গেলে মরমে মরে যেতে ইচ্ছে

হয়। কিন্তু মদের দোকানে, জুয়ার আড্ডায়, তুতি কিংবা বীণার ঘরে, মল্লিকবাজারে, হাওড়া ব্রিজের নিচে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা বা আড়ষ্টতা নেই, অনায়াসে টেবিলের ওপর পা তুলে বসা যায়, গরম লাগলে জামা খুলে ফেলা যায় যে-কোনো সময়ে, জোরে কথা বলছি না আস্তে, কখন হাসবো— তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক থাকতে পারায় একটা আরাম পাই ওসব জায়গায়। শুধু কি এই জন্য ? এর মধ্যে একটা ছোট ফাঁকি আছে। নিজের ঘরের মধ্যেও তো স্বাভাবিক থাকা যায়।

আসলে অহঙ্কারটা পরিত্যাগ করাই মুশকিল। নিমতলায় গঙ্গার ধারে সন্ধেবেলা, পাঁচজন ঝাঁকামুটে বসে বসে ছিলিমে গাঁজা খাচ্ছিল। গোল হয়ে বসে মাঝখানে খানিকটা তুলোয়-মোড়া কর্পূরে আগুন জ্বালিয়েছে, পাশে কয়েকখানা বাতাসা, লাল ন্যাকড়ায় জড়ানো কল্কেটা হাত ঘুরে যাচ্ছে, পিছনে গঙ্গার কালো বাতাস। আমি, অবিনাশ আর শেখর ঘুরতে ঘুরতে ওদের পাশে ধপ করে বসে পড়লুম মাটিতে। একজনের কাঁধে হাত রেখে বললুম, ভাই একটা টান দিতে দেবে নাকি ? লোকটা ঘোলাটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, কল্কেটা এগিয়ে দিল। আমি জোরে একটা দম দিয়ে নিয়ে ওটা এগিয়ে দিই অবিনাশকে। অবিনাশ যত্ন করে লাল কাপড়টা জড়িয়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগলো—লোকগুলো অবাক হয়ে দেখতে লাগলো আমাদের। একজন বললো, হিঃ, বাবুলোক বড়ি মজেসে—হিঃ হিঃ! অবিনাশ বললো, খতম হো গিয়া। আউর নেই হ্যায়? একজন বললো, আউর পিজিয়ে গা ? বৈঠিয়ে তব, লাতে হেঁ তুরন্ত। অবিনাশ বললো, পয়সা নিয়ে যাও। একটা আধুলি বার করে দিতেই লোকটা শশব্যস্তে ছুটে গেল, আগের লোকটা ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে মাটিতে থুতু ফেলে আবার বললো, হিঃ, বাবুলোক বড়ি সউখ সে, হিঃ হিঃ! আমাদের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে গেল ওরা, নিজেরা না খেয়ে যত্ন করে আমাদের সেজে দিতে লাগলো, আমরা মাটিতে লেটিয়ে বসে ওদেরই বৃত্তের মধ্যে মিশে ওদের একজন হয়ে গেলুম। কিন্তু এ তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশে যাওয়া নয়, এর মধ্যে জোচ্চুরি আছে। বাবা-মায়ের কল্যাণে আমাদের তিনজনেরই মুখ ভদ্রলোকের মতো, গায়ের রঙ মাজা মাজা, তেল চকচকে মাথার চুল, তিনজনেরই পরনে ধোপদুরস্ত প্যাণ্ট-শার্ট, অবিনাশেরটা আবার টেরিলিনের। আমরা তিনজনই খাঁটি ভদ্দরলোক যাকে বলে, অর্থাৎ যারা ঐ মুটেগুলোর সঙ্গে সারাদিন তুই-তোকারি করে, দু'পয়সা-চার পয়সার জন্য দাঁত খিঁচোয়—আমরা তাদেরই প্রতিনিধি হয়েও ওদের সঙ্গে কাঁধে হাত দিয়ে মাটিতে বসেছি, একই কল্কে থেকে গাঁজা টানছি—এতে ওরা একেবারে কৃতজ্ঞ অভিভূত। আমরাও ওদের এই ভাবটা বেশ ভোগ করে আরাম পাচ্ছিলুম। শুধু তাই নয়, গঙ্গার পাড়ে এসে আমাদের খানিকটা গাঁজা টানতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু কে আর দোকান থেকে কিনতে যায় কিংবা কল্কে সাজার ঝঞ্ঝাট করে, ওদের দিয়ে ও কাজগুলো কত সহজে করিয়ে নেওয়া গেল।

এই রকম তো আরও কতবার করেছি, রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় এসে দাঁড়িয়েছি সেন্ট্রাল এভিনিউতে, নির্জন রাস্তা, একটা ট্যাক্সি পর্যন্ত নেই। একটা রিক্সাওয়ালা শুধু একলা দাঁড়িয়ে আছে, ও আমার বাড়ি পর্যন্ত অতদূর নিশ্চয়ই যেতে চাইবে না। কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, বিড়ি আছে ? একটা বিড়ি দাও তো ভাইয়া। সিগ্রেট খেতে আর ভালো লাগছে না। তুমি চাও তো, নাও আমার একটা সিগ্রেট। লোকটা অবাক হয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে টিনের কৌটো বার করে একটা বিড়ি দিল। আমি দেশলাই জ্বেলে প্রথম ওকে ধরিয়ে দিলুম, তারপর নিজে। ওর কাঁধে চাপড় দিয়ে বললুম, কী, খুব শীত লাগছে বুঝি ? লোকটা তারপর নিজেই জিজ্ঞেস করলো, বাবু আপ কিধার যাইয়ে গা ? খুশি মনে বাড়ি পৌঁছে দিল তারপর, মাত্র আট আনায়। আমার পরনে একটা দামি সোয়েটার ও উলের প্যান্ট, তা সত্ত্বেও ওর বিড়ি চেয়েছি এবং ভাইয়া বলে

সম্বোধন, এরপর আর আমাকে বাড়ি না পৌঁছে দিয়ে ওর উপায় কি ? ঠিক বুঝতে পারি না, আমার এই ব্যবহারকেই আন্তরিকতা বলে কিনা, অথবা ব্ল্যাকমারকেটিয়ারদের মতন এও ওদের অন্যভাবে ঠকানো। কেননা, সবসময়ই ওদের সঙ্গে আপনভাবে মিশতে গেলে— একটা না একটা উপকার পাই, এবং সেটা যে পাবো—তাও যে আগে থেকে জানি! শেখর আবার ওদের সঙ্গে আরও বেশি আপন কথা বলে, মুল্লুক কাঁহা ? আরা জিলা ? কে কে আছে বাড়িতে ? ইস, তিন বছর বালবাচ্চাকে দেখো নি ? অ্যাঁ, মেয়েটা বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বিধবা হয়েছে ? আমারও নিজের বোন, বুঝলে ...। হ্যাঁ, আরা তো খুব ভালো জায়গা। ম্যায় তো আরা টৌন মে গিয়া থা আর সাল মে। উহো পোস্টোপিসকে নজদিগমে একঠো লাল কোঠি হ্যায় না, উহো তো হামারা ভাতিজা কো কোঠি হ্যায়। ব্যাস, এরপর সেই লোকটা বশম্বদ হুকুমের চাকর হয়ে পড়ে। চুল ওল্টানো, পালিশ করা জুতো পরা বাবু—সে যে গণ্ড-শহরে থাকে— সেখানে একবার বেড়াতে গিয়েছিল মাত্র, এটাই তার ধন্য হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। আমি টের পাচ্ছিলুম, এর মধ্যে একটা গভীর লুকোচুরি থেকে যাচ্ছে।

ক্রমশ একথাও বুঝতে পারছিলুম, এবার ফিরতে হবে। এইসব চোর-গুণ্ডা-জুয়াড়ি-মাতাল-মজুর-বেশ্যা-দালাল— এদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে লাগতে লাগলো আস্তে আস্তে। বেশ বুঝতে পারলুম— ওসব আত্মশুদ্ধি-টুদ্ধির কথার মধ্যে অনেক ফাঁকি, এখন জুয়া খেলতে ইচ্ছে করে পয়সা জেতার লোভে, মদ খেতে ইচ্ছে করে মাথায় রক্ত চনচনে হয়ে উঠে নিজেকে তখন অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় বলে, মেয়েমানুষদের ভালো লাগে কারণ কিছুক্ষণ দায়িত্বহীনভাবে মেয়েমানুষের সঙ্গ পাওয়া যায় তাই। বুঝতে পারার পর আমি এগুলো একে একে ছাড়ার চেষ্টা করলুম। ছাড়া অবশ্য সহজ নয়, খুব ছেলেবেলায় আমি একবার একটা বাদুড় ধরেছিলাম, সেটার কথা মনে পড়ে আমাদের রান্নাঘরের পিছনে একটা গাবগাছে বাদুড় থাকতো, একদিন চুপি চুপি গাছে উঠে একটা বাদুড়ের ডানা চেপে ধরেছিলাম। আশ্চর্য, বাদুড়টা কয়েকবার ঝটপট করেই মরে গেল, বাদুড়ের চেহারা দেখেও এমন ঘেন্না লাগছিল যে, আমি ওটাকে বাঁশবনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু বাদুড়টার ডানা থেকে কাজলের মতো তেলতেলে কালো রং লেগে গিয়েছিল আমার হাতে, বারবার সাবান আর গেঁরিমাটি দিয়ে ধুয়েও হাত থেকে সেই তেলতেলে ভাব ওঠে নি। সাতদিন পর্যন্ত সেই হাত দিয়ে কিছু খেতে গেলেই দুর্গন্ধ পেয়ে বমি আসতো। এখনো, সেই দিনটার কথা মনে পড়লেই হাতের সেই তেলতেলে ভাবটা যেন টের পাই, বমি ঠেলে আসে। এও সেই বাদুড় ধরার মতন, একবার ছুঁলে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়। অবশ্য, এখনো আমার কোনো ঘৃণা বা অনুশোচনা জাগে নি, পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত হবার ভয়েই আমি নিজেকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা শুরু করলুম। কিন্তু ছেড়ে দিয়ে তারপর কোথায় যাবো ? কলকাতা শহর আমার চেনা হয়ে গেছে— এবার কাকে চেনার চেষ্টা করে আমার সময় কাটবে ? কোনো একজনের কাছে গিয়ে যেন এই প্রশ্ন করা দরকার।

ব্রজেশ্বরদা বলেছিলেন, যদি এসব থেকে মন ফেরাতে চাও, তবে কারুকে ভালবাসো। ভালবাসাই পৃথিবীর সব শূন্যতা পূরণ করে দিতে পারে—অবশ্য এসব আমার শোনা কথা, আমার নিজের যদিও ভালবাসা খোঁজার দরকার হয় নি এখনো!

তখন মনীষার কথা ভেবে আমি ব্রজেশ্বরদাকে উত্তর দিয়েছিলাম, আমিও চেষ্টা করেছিলাম ভালবাসার দিকে মুখ ফেরাতে, পারি নি।

মেসের ঘরটা অবশ্য ছেড়ে দিতে হয় বছরখানেক আগেই। আমার কীর্তি-কাহিনীর কিছু সৌরভ আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই, সেজদি ছোড়দিও নাকি কানপুর থেকে আমার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজখবর চেয়েছে। তিন-চার বছর বাড়ির কারুর সঙ্গেই আমি

কোনোরকম সম্পর্ক রাখি নি প্রায়, বড়দি শুধু অফিসের ঠিকানা জানতো, সেখানে টেলিফোন করতো মাঝে মাঝে। অনেক সাধাসাধি করলে কৃচিৎ কোনো রবিবার দুপুরে আমি বড়দির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতুম।

একদিন বড়দি সোজা গাড়ি নিয়ে মৌলালিতে আমার মেসে এসে হাজির। আমার জিনিসপত্র টান মেরে ফেলে লণ্ডভণ্ড করে বড়দি বললো, তোর এখানে আর থাকা হবে না, তুই আমার বাড়ি গিয়ে থাকবি। চল, আজই চল।

আমি হেসে বলেছিলাম, তুমি পাগল হয়েছো, বড়দি! আমি এখানে বেশ আছি। তোমাদেরও কোনো অসুবিধে নেই।

— তাহলে আমি এই খাটে বসলুম। তুই যা ইচ্ছে কর! যদি আমাকে তাড়াতে পারিস, তাড়া!

— কিন্তু তুমি এরকম করছো কেন বড়দি ? আমাকে তুমি এমন ছেলেমানুষ ভাবছো— এত ভাববার দরকারটা কি ?

— তুই আমাদের জন্য না ভাবতে পারিস, আমাদের চিরকালই তোর জন্য ভাবতে হবে। তোর কথা ভেবে ভেবেই মার শরীরটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাবাঃ, মাঝে মাঝে যা এক একটা কথা শুনি তোর নামে, উফ্ তুই এরকম হলি কেন রে ?

আমি বড়দির কথা শুনে না হেসে পারলুম না। বিয়ের পর থেকেই মোটা হতে শুরু করেছে, এখন রীতিমতো ভারিক্কি, বড়লোকের বাড়ির গিন্নী হবার পক্ষে মানিয়েছে ভালো। ছেলেবেলা থেকেই বড়দির কথাবার্তা এই রকম, যেন সবসময়ই পৃথিবীতে একটা না একটা ভয়ের ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। আমি বললুম, কী রকম হয়েছি ? বেশ ভালোই তো আছি।

— বিয়ে-থা করতে হবে না ? না কি এইরকম বাউণ্ডুলে হয়েই চিরটা কাল কাটবে ?

— সে যখন ইচ্ছে হয় করবো। তিরিশ বছর বয়সের মধ্যেই সব লোক ওসব পাট চুকিয়ে ফেলে নাকি ?

— সে তোর যা ইচ্ছে করিস্। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে থেকে কর। এই মেসের খাওয়া খেয়ে মানুষ বাঁচে ? ভাবলেই তো বমি আসে। কী চেহারাই হয়েছে !

—এই মেসে আরও ছত্রিশজন বোর্ডার আছে, তারা বুঝি মানুষ নয় ?

— সে তাদের ভাবনা আমি ভাবতে পারবো না, তাদের যদি মা কিংবা দিদি থাকে, তারা ভাবুক। আমার ভাবনা এখন তোকে নিয়ে! চল, আমাদের বাড়িতে বাইরের দিকে একটা ঘরে থাকবি, কেউ তোকে বিরক্ত করবে না, তবু তো কাছাকাছি থাকবি। নইলে যে তোর কথা ভেবে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না—

— হ্যাঁ, প্রথমে তো এই বলে নিয়ে যাবে, তারপরই একদিন বলবে, আজ বাজারটা করে নিয়ে আয় তো ছুট, আজ আমার ননদের বাড়ি অমুকটা পৌঁছে দিয়ে আয়, আজ আমার পিশশাশুড়িকে নিয়ে আয় হাওড়া স্টেশন থেকে! ওসব আমি পারবো না। এরপর নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে বলবে, সকালের দিকে ছেলেমেয়ে দুটোকে তো খানিকটা পড়াশুনো দেখিয়ে দিলেই পারিস ! বিনে পয়সায় বেশ একটা বাড়িতে মাস্টার পাওয়া—

বড়দি এবার নিঃশব্দে চওড়াভাবে হেসে বললো, না, সে ভয় করতে হবে না ! তোর হাতে আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার ভার দিয়ে কি আমি নিশ্চিত হতে পারি ? তা হলে যে ওদের শিক্ষা কেমন হবে, তা তো আমি জানিই।

কিন্তু সব কথা এভাবে মেলে না। বড়দির বাড়িতে যাবার পর, বড়দির ছেলে বুবুল আমার ভক্ত হয়ে পড়ে, আমিও ওকে খুবই ভালবাসতে শুরু করি। এমনকি বুবুলের পরীক্ষার আগে, ও ভূগোলে খুব কাঁচা দেখে আমি নিজেই এমন চিন্তিত হয়ে উঠেছিলাম যে, দু'দিন সারা সকাল

সারা সন্ধে আমি বুবুলকে পাখি-পড়ার মতো ভূগোল পড়ালুম।

বড় জামাইবাবু তাঁর অফিসে আমার চাকরিটার ব্যবস্থা করতেই আমি গভর্নমেন্ট অফিসটা ছেড়ে দিলাম। সরকারি চাকরির সুবিধে ছিল এই যে, যখন তখন ডুব মারলে কিংবা কাজে হাজার ভুল করলেও চাকরি যাবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু অন্য প্রাইভেট ফার্মে ঢুকলে এ নিয়ে অসুবিধে হলেও নিজের জামাইবাবুর অফিসে এ সবক'টা সুযোগই পাওয়া যাবে ভেবে, এটাই নিলাম। কিন্তু চাকরি নেবার পর দেখি অন্য বিপদ। মাইনের অঙ্কটা খারাপ নয়, কিন্তু পুরো টাকা কোনো মাসেই পাই না। আমার মাইনে থেকে একশো টাকা কেটে পাঠিয়ে দেয়া হয় আমার বাবার নামে, আর একশো টাকা বড় জামাইবাবু নিজে নেন, ওঁর বাড়িতে আমি বিনা পয়সায় থাকলে-খেলে যদি আমার গ্লানিবোধ বা অপমান হয় সেই জন্য। কিছুই অপমান হতো না, দিদি নিজে ডেকে এনেছে, তার ওখানে আমি খাবো, তার জন্য আবার টাকা কিসের ? মাঝখান থেকে একশোটা টাকা—যতো সব বাজে ব্যাপার !

দিদি অবশ্য ঘোষণা করে রেখেছে, আমি যেদিন বিয়ে করবো, সেদিন থেকেই আর আমার দুশো টাকা কাটা যাবে না। লোকে বিয়ে করলে অনেক সময় অর্ধেক রাজত্ব পায়, আমার অন্তত দুশো টাকা মাইনে বাড়বে বিয়ে করলেই।

বিয়ে তো আমি অনেক আগেই মনীষাকে করতে চেয়েছিলাম। ততদিনে বেশ কয়েকটা মেয়েকে চিনেছি, মেয়েদের শরীরে শাড়ির ঠিক ক'টা পাক থাকে জেনে গেছি, জেনে গেছি পিকনিকে গিয়ে কেন মেয়েরা বারবার জলাশয় দেখতে চায়। কোনো মেয়েকে প্রথমবার চুমু খাবার আগে হাতের আঙুলে ঠোঁট ছোঁয়াতে হয়, 'ভালবাসি' বলতে হয় তার অনেক অনেক পরে। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আজ, একথা বলার চেয়ে তোমাকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়লো, একথায় মেয়েরা খুশি হয় ঢের বেশি। মেয়েদের রূপের প্রশংসা না করে, তাদের দোষের প্রশংসা করতে হয়, কোনো মেয়ের যদি থুতনিতে কাটা দাগ থাকে কিংবা হাতের একটা আঙ্গুলের নখ হয় কালচে, কান দুটো যদি বেশি বড় হয়—তবে সেগুলোই প্রশংসনীয়। কোনো মেয়ে যদি প্রসাধন করার সময় কোনো পুরুষকে পাশে বসতে দেয়, তবে সে তাকে তখন আদর করারও সুযোগ দেবে। একথা বুঝিয়ে দেয়, তাকে আদর না করলে তার প্রসাধন সম্পূর্ণ হবে না। আর, একবার না একবার মেয়েদের চোখের জল দেখে নিতেই হবে, আঙ্গুল দিয়ে মেয়েটির গাল থেকে চোখের জল না মুছে দিয়ে বাংলাদেশের কোনো মেয়েকে কেউ কখনো ভালবেসেছে, তা কখনো শুনিই নি। গাঁয়ের ছেলে হয়েও আমি এসব বৃত্তান্ত খুব চট করে শিখে নিয়েছিলুম। কিন্তু মনীষা এ সমস্ত নিয়ম ভেঙে দিতে পারে।

একটা পুরো দিন যদি মরুভূমিতে কাটানো যায়, তখন যে-কোনো মানুষই নাকি একবার না একবার মরীচিকা দেখবেই। তেমন, এক জীবনে কোনো না কোনো একটা সময়ে মানুষ নিজেকে জয়ী মনে করেই। সেই রকমই মনে হয়েছিল আমার, ছ'মাস, গত ফেব্রুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত, নিজেকে মনে হয়েছিল আমার অপরাজিত। কি যেন একটা অলৌকিক শক্তি ভর করেছিল, প্রত্যেকটা ব্যাপারে জিতে যাচ্ছিলুম, তাস খেলায় তখন আমিই জিতে যেতুম রোজ, খেলার শেষে একমুঠো টাকা আমার হাতে। এমন হলো, তখন আমার সঙ্গে কেউ আর তাস খেলতে চাইতো না, আমি অবজ্ঞায় ঠোঁট বেঁকাতুম সবার দিকে। মদ খেয়ে শেষ পর্যন্ত টং হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারতুম তখন, অবিনাশের মতো ছেলেও তখন ঢলে পড়ে গেলে ওর ঘাড় ধরে ঠেলে তুলে দিতাম ট্যাক্সিতে। লাইটহাউসে সিনেমার সামনে কয়েকটা মাড়োয়ারী ছেলের সঙ্গে ঝগড়া বাধে একবার, ইংরেজি স্কুলে পড়া চোঙা প্যান্টপরা ছেলেগুলো ওরাই দলে ভারি, কিন্তু অরুণের স্ত্রীকে উদ্দেশ করে ওরা কুৎসিত কথা বলেছিল, আমরা তিনজন—ওরা আটজন,

কিন্তু নিজেকে সে সময় আমার দৈত্যের মতন শক্তিশালী মনে হয়েছিল, আমি এগিয়ে গিয়ে ঝট করে একজনের কলার চেপে ধরতেই কিন্তু ওরা ক্ষমা চাইলো। আমি অহংকারদীপ্ত মুখে ফিরে এলুম বন্ধুদের মধ্যে। আঃ, ঐ ক'টা মাস কী অসম্ভব জয়ীর মতন বেঁচে ছিলাম ! মনে হতো পৃথিবীতে আমার অসাধ্য কিছুই নেই। হাতের মুঠোয় আমলকীর মতন গোটা পৃথিবীর দিকেই আমি অভয় চোখে তাকাতে পারি, এমন অহঙ্কারও হয়েছিল আমার। সেই অহঙ্কারেরই তাপে ভেবেছিলাম মনীষাকে জয় করতে পারবো। কিন্তু মনীষা আমাকে কোনো সুযোগই দেয় নি।

তখন কোনো কোনো সন্ধেবেলা অরুণদের বাড়িতে আড্ডা হতো। অরুণ তাপসের বোনকে বিয়ে করেছে বলে স্বামী–স্ত্রী দু'জনই আমাদের চেনা, ওর বাড়িতে আর ছিল ওর বাবা আর বোন মনীষা। অরুণের বাবা তিনতলার ঘরে দূরে থাকতেন বলে আমরা ওখানে বেশ একটা উপযোগী আবহাওয়া পেয়েছিলাম। অরুণের দিদি বিধবা হয়ে বাচ্চা–কাচ্চা নিয়ে ও বাড়িতে ফিরে আসার পর আমাদের আড্ডা ভেঙে যায়।

মনীষা খুব সিল্কের শাড়ি পরতে ভালবাসে, যখনই ওকে দেখেছি সিল্কের শাড়ি পরা, সন্ধেবেলা ও হয়তো তখন কোথাও বেরুতে যাচ্ছে বা বাইরে থেকে ফিরে আসছে। এখনও মনীষার কথা ভাবলেই আমার চোখে ভাসে ওর মেরুন–রঙা সিল্কের শাড়ি পরা মূর্তি। সিল্ক পরলে মেয়েদের শরীরটা আরও নরম মনে হয়, নরম মুখ, নরম বুকের ডৌল, নরম উরুদেশ। ঐ নরম শরীরে খুব মাথা রেখে শুতে ইচ্ছে করে। ঐ রকম শরীর হাতের কাছে এলে—একবার অন্তত বুকে জড়িয়ে ধরতে না পারলে, বুকের মধ্যে কঠিন অসুখ হয়ে যেতে পারে।

খুব কম বয়সে মা মারা গিয়েছে বলে মনীষার স্বভাব অনেকটা স্বাধীন। যখন খুশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, যখন খুশি আসে। এজন্য তাকে কেউ শাসন করে না, অবশ্য শাসন করার দরকারও নেই, কারণ মনীষা এমনই বিদ্যুৎ চরিত্রের মেয়ে যে, ও কখনো কোনো বিপদে পড়বে না, বা ওকে কেউ বিপদে ফেলতে পারবে না। অথবা, মনীষা যদি ইচ্ছে করে বিপদে জড়াতে চায় তবে কারুর সাধ্য নেই ওকে আটকায়। এমন সুন্দর, এমন বুদ্ধিমতী, এমন নিষ্ঠুর মেয়ে আমি আর কখনো দেখি নি। সন্ধেবেলা তাস খেলা হচ্ছে, তাস দেওয়া হয়েছে, কেউ তখনো তোলে নি, মনীষা শাড়ির শপশপ শব্দ করে কী যেন নিতে সে ঘরে ঢুকলো। আমি বললাম, মনীষা, আমার তাসটা একটু ছুঁয়ে দিয়ে যাও তো। যদি ভালো ওঠে, তা হলে—। দেবো ? আচ্ছা—বিনা দ্বিধায় মনীষা আমার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে আমার তাস তিনটে তুলে নিয়ে নিজে দেখলো—ও নিজেও বেশ খেলা জানতো, ঠোঁট টিপে হেসে বললো, দেখুন, এবার যদি না জেতেন তো কি বলেছি ! আমি তাস দেখে চমকে উঠলুম। এ যে অসম্ভব রকমের সাজানো ভালো তাস। আমার কাছ ঘেঁষে মনীষা বসেছিল, ওর শরীর থেকে সুন্দর ঘ্রাণ ভেসে আসছে, মেরুন–রঙা সিল্কে ওর শরীরের রেখাগুলো আরও মসৃণ, আমার খুব ইচ্ছে হলো বিশ্ববিজয়ী হবো। কি জানি ও মনের কথা শুনতে পায় কিনা—সেই মুহূর্তে ও উঠে পড়লো।

— বসো, আর একটু বসো, প্লিজ !

— ইস্, আমি এখন বসে তাস খেলি আর কি !

খানিকটা বাদে মনীষা আবার ঢুকলো, সেবার আমার তাস তোলা হয়ে গেছে। ও বললো, তুলে ফেলেছেন ? আমি একটা হাত বাড়িয়ে বললাম, তুমি শুধু আমার হাতটা ছুঁয়ে দাও, তাহলেই আমি জিতবো ! মনীষা আমার হাতটা ছুঁতেই আমি ওকে টান মেরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম।— ইস্, অত সহজ নয় ! মনীষা হাসতে হাসতে হাত ছাড়িয়ে নিল। সেবারও আমি খেলায় জিতলুম, কিন্তু মনীষা তখন ঘর থেকে চলে গেছে।

মনীষার সঙ্গে যদি আমার পরিচয় না হতো, তা হলে অনেক আগেই হয়তো আমি জীবনের

মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারতুম, ফিরে আসতে পারতুম সুস্থতার দিকে। অমন পাপহীন উজ্জ্বল মেয়ে মনীষা, কিন্তু ওই আমাকে ঠেলে দিল আরও গম্ভীর অন্ধকারের দিকে। মনীষার কাছে অসহায়ভাবে হেরে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল, আমি আর কারুকে ভালবাসতে পারবো না এ জন্মে, কারুর ভালবাসা পাবো না, আমি ভালবাসারই অযোগ্য। মনীষা ওরকম অবহেলা না দেখালে আমি গত বছর পুজোয় গালুডিতে সাঁওতাল মেয়েটাকে নিয়ে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনায় জড়িয়ে পড়তাম না।

কিন্তু ব্যর্থ প্রেমও তো নয়, মনীষার সঙ্গে আমার প্রেমে পড়াই যে হলো না। মনীষার সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে, তখন ও কত আপন, একেবারে বুকের কাছ ঘেঁষে এসে কথা বলেছে। একি, জামার বোতাম ছেঁড়া কেন, দেখি, দেখি, তা হলে সবগুলো ছিঁড়ে দি—এই বলে মনীষা আমার সবক'টা বোতাম ছিঁড়ে দিয়েছে পটপট করে। আমি ওকে শাস্তি দেবার জন্য হাত বাড়িয়েছি, ও তখন কোথায় ! যখন দেখা হতো, তখন এইরকম। আবার এক মাস কি দু'মাস দেখা না হলে, সে সম্বন্ধে মনীষা একটাও কথা বলতো না। কোনোদিন জিজ্ঞেস করে নি, এতদিন কোথায় ছিলেন। আর দলবলের সঙ্গে ছাড়া, মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হবার সুযোগও ছিল না। আমার বন্ধু অরুণের বোন মনীষা, সুতরাং ওদের বাড়িতে গিয়ে অরুণের ছাড়া শুধু মনীষার সঙ্গে কি দেখা করা যায় ! যায় হয়তো, কিন্তু আমি গ্রাম্য ছেলের এই সংস্কার কিছুতে ছাড়তে পারি নি। দু'একদিন একা গেছি অরুণদের বাড়িতে, অরুণ আর ওর বউয়ের সঙ্গে গল্প করেছি। কিন্তু কি একটা লজ্জা আমাকে পেয়ে বসতো, মুখ ফুটে একবারও সরলভাবে জিজ্ঞেস করতে পারি নি, মনীষা কোথায় ? উদ্‌গ্রীবভাবে চেয়ে থেকেছি দরজার দিকে, কিন্তু সে-সব দিন মনীষাকে একবারও দেখি নি। কখনো টেলিফোন করেছি ওদের বাড়িতে, যেদিন দৈবাৎ মনীষা ফোন ধরেছে, আমার গলার আওয়াজ চিনতে পেরেই কিছুক্ষণ কলরব মুখরিত ইয়ার্কির পর বলেছে, দাদাকে চাইছেন তো ? আমি বলেছি, না, শুধু তোমাকে !—মনীষা হাসতে হাসতে বলেছে, আহা কি সৌভাগ্য আমার ! বুঝেছি, অসম্ভব দেরি হয়ে যাচ্ছে ! দাঁড়ান, দাদাকে ডেকে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে নিজে ছেড়ে দিয়েছে।

মরীয়া হয়ে একলা দেখা করার জন্য ইউনিভার্সিটির সামনেও দাঁড়িয়ে থেকেছি ওর জন্য। মনীষা তখন সিক্সথ ইয়ারে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ছে। ছুটির পর ছেলেমেয়ের দঙ্গল বেরিয়ে এলো, বাস স্টপে মনীষাই আমায় প্রথম দেখতে পায়। কোনো দ্বিধা কিংবা ব্রীড়া নেই, দেখেই স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত মুখে হাসলো। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললো, কোন্ মেয়েটা ? কোন্ মেয়েটা আমাকে দেখিয়ে দিন।

আমি বললুম, কী ?

— কোন্ মেয়েটার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন বলুন। আমি দেখে রাখি, যদি চিনতে পারি...

— মনীষা, আমি তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি—

— সে আসে নি বুঝি ? আচ্ছা, তার নামটা বলুন না।

— সত্যি, তোমার জন্যই শুধু দাঁড়িয়ে আছি।

— তাই নাকি ? কী ভালো লাগলো শুনতে। চলুন, তবে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন চলুন।

— বাড়ি যাবার আগে একটু চা খাবে ? কোনো চায়ের দোকানে—

— আমাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে। চলুন, বাড়ি চলুন।

— একটুখানি কোথাও বসে—

— বাড়িতে চলুন না ! সেখানে বুঝি চা খাওয়া যায় না ? ঐ যে বাস আসছে—। বাড়িতে পৌঁছিয়ে মনীষা চেঁচিয়ে উঠলো, বৌদি তোমার সখের দেওর এসেছে। চা খাওয়ার জন্য পাগল।

নাও, চা খাওয়াও, গল্প করো। আমি এখন পারমিতাদের বাড়ি যাবো একটু।

আমাকে দোতলার ঘরে বসিয়ে মনীষা রহস্যময় হাসি দিয়ে বললো, বৌদির সঙ্গে বসে গল্প করুন। ইস্, রোদ্দুরে মুখটা কি হয়ে গেছে, পাখার তলায় এসে বসুন না। আমি চললুম।

সেদিন এমন বোকা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। অরুণের বউ খুকু তখন সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে, গা-ধোওয়া আরও কি কি সব মেয়েলি কাজ তখনও বাকি। কৃত্রিমভাবে আন্তরিক হয়ে আমাকে বললো, একটু বসুন, যাবেন না কিন্তু, আমি বাথরুম থেকে এক্ষুনি আসছি। চা দিয়ে যাচ্ছে ! সেই ঘরের মধ্যে একা বসে চা খেতে আমি অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছিলাম। তখুনি উঠে চলে আসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু তা-ও আসা যায় না। মনীষা আর একবারও ঘরে এলো না।

মনীষার জন্য আমি নিজেকে যোগ্য করে নেবারও চেষ্টা করেছিলাম। তখন আমি শখ করে তৈরি করলুম গোটা-তিনেক ডবল-কাফ শার্ট। সাধারণত আমি শার্টের হাতা গুটিয়ে রাখি অথবা হাফ-শার্ট। কিন্তু ডবল-কাফ শার্টের পুরো হাত দুটো খুলে পাথর বসানো স্টিলের বোতাম লাগিয়ে গায় দিয়ে হঠাৎ নিজেকে খুব শান্ত মনে হয়। দুটো হাত সম্পূর্ণ ঢেকে রাখার মধ্যে একটা মানসিক শান্তি আছে নিশ্চিত। এই ব্যাপারটাও আমি জানতে পেরেছিলাম কয়েকদিন আগে মাত্র। তার আগে, জামার হাতা খুলে বা গুটিয়ে রাখার মধ্যে কোনো তফাৎ আছে, আমার এরকম কোনো জ্ঞানই ছিল না। কিন্তু, অবিনাশ আর পরীক্ষিৎ ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে মারামারি করে পুলিসে ধরা পড়ার পর আদালতে যখন ওদের কেস্ ওঠে, আমরাও গিয়েছিলাম। আসামীর ঘেরা জালের মধ্যে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে। আমি, তাপস আর শেখর দর্শকদের বেঞ্চে বসে উকিলের ইয়ার্কি শুনছি। এমন সময় উর্দিপরা আদালতের বেলিফ আমার সামনে এসে রুক্ষ গলায় বললো, আপ উঠ্ যাইয়ে, বাহার যাইয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

—যাইয়ে বাহার ! নিকালিয়ে !

প্রথমটায় আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কারণ ট্যাক্সিতে মারামারির সময় আমিও দলে ছিলাম, কিন্তু পুলিশ আসার আগেই সটকেছি। ট্যাক্সিওয়ালা বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করলে আমিই প্রথম নেমে গিয়ে ওর মিটারটা দু'বার নামিয়ে আবার তুলে দিয়েছিলাম। এখন জানতে পেরে, আমাকে অভিযুক্ত করবে নাকি ! কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আমার শার্টের হাতা গোটানো ছিল এবং গলার কাছে বোতাম খোলা, হাকিমের সামনে এরকমভাবে বসা নাকি বেআইনী। শুনে আমার মনে হয়েছিল, আমার আরও কত কি শেখার আছে। শিক্ষার তো শেষ নেই ! হাকিমের পেছনেই দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধীর ছবি, তাঁকে মনে মনে প্রণাম করে আদালত থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম তখন।

যাই হোক্, পোশাক বিষয়ে সহবৎ ওই আদালতেই টুক্ করে শিখে নেয়া গেল। মনীষার কাছে যাবার জন্য আমি নিখুঁতভাবে দাড়ি কামিয়েছি, পুরো হাত ঢাকা, প্রত্যেকটি বোতাম লাগানো ধপধপে শাদা শার্ট, পরপর কয়েকদিন ঠিক সময় ঘুমিয়ে চোখের কোণের কালো দাগ মুছে গেছে, সারা শরীরময় চন্দন সাবানের গন্ধ। কেননা, মনীষা সবসময় সিল্কের শাড়ি পরে, কথায় কথায় প্রায়ই বলছে, ও ময়লা পোশাক একেবারে সহ্য করতে পারে না। প্রতিদিন পরিষ্কার পোশাক পরে আমারও মন ক্রমশ গ্লানিহীন হয়ে উঠেছিল সেই সময়, আর মনীষাকে পাবার ইচ্ছে তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মনীষাকে আমার খুবই দরকার প্রেমে, অপ্রেমে বা শরীরে। মনীষার প্রত্যেকটি ব্যবহার স্পষ্ট, কোনো কথারই দু'রকম মানে হয় না, তবু মনীষা আমাকে বিষম ধাঁধার মধ্যে ফেলেছিল। মনীষাকে যে আমি চাই— একথাটাই বলার সুযোগ ও আমাকে দিল না কিছুতেই। একথা বলার পর ও যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতো, তারও একটা মানে ছিল। ব্যর্থ-

প্রেমিক হতেও আমার আপত্তি ছিল না। মেয়েরা তাদের প্রেমিককেও ভুলতে পারে, কিন্তু যাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে জীবনে ভোলে না। মনীষার মনে বা জীবনে আমি নিজের একটা ছাপ ফেলার জন্য আকুল হয়েছিলাম। কি জানি কেন। ভিড়ের মধ্যে যখনই দেখা হয়েছে, মনীষার ব্যবহার এমন, যেন ও আমারই প্রতীক্ষায় ছিল। একদিন সন্ধেবেলা আমরা অনেকে বসে আছি অরুণের ঘরে, মনীষা ঢুকলো, হাতে চিরুনি, ও তখন চুল আঁচড়াচ্ছিল, আমার পাশে এসে চিরুনিটা সোজা আমার চুলের মধ্যে চালিয়ে বললো, ইস্, রুক্ষ চুল আমি একদম দেখতে পারি না।

আমার এত কাছে তখন মনীষার শরীর যে, যে-কোনো সপ্রাণ মানুষেরই ইচ্ছে হয় ওকে তখন বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে, দাও, আমাকে তুমি পরিপাটি এবং সুশোভন করে দাও ! কিন্তু আমি বলতে পারি না, মনীষার শরীরের গন্ধ আমার বুক জুড়ে তবু ও আমার চোখে চোখ রাখে না, চিরুনিটা আমার মাথায় এমন আমূল বসিয়ে দেয় যে, আমি বলে উঠি, উঃ লাগছে, লাগছে—। মনীষা হাসতে হাসতে দূরে সরে যায়।

একা কোথাও মনীষার সঙ্গে দেখা হয় না। আমি যখন একা থাকি, মনীষা তখন পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কতদিন আমি বন্ধু-বান্ধবদের এড়িয়ে একা একা রাস্তা দিয়ে ঘুরেছি, কত মানুষের সঙ্গেই তো হঠাৎ পথে দেখা হয়, কিন্তু মনীষার সঙ্গে কোনোদিন না। মনীষা তো প্রায়ই বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে যায়, কিন্তু তখন বুঝি শুধু বেছে-বেছে অন্য পথগুলো দিয়েই যায়! অথচ হঠাৎ দেখা হয়েছে অনেকবার ওর সঙ্গে, তখন হয় আমার সঙ্গে অন্য কেউ আছে, অথবা মনীষার সঙ্গে অন্য কেউ। থিয়েটার দেখতে গিয়ে দেখা হলো মনীষার সঙ্গে, ওর সঙ্গে দু'জন বান্ধবী আর এক মাসতুতো বোন। আমাকে দেখতে পেয়েই হৈ-হৈ করে এগিয়ে এলো মনীষা, বললো, সুনীলদা, আজ আমাদের খাওয়াতে হবে কিন্তু। উঃ এমন খিদে পেয়েছে না ! ভাগ্যিস আপনাকে পেলাম।

আমি নিচু গলায় বললুম, তুমি একা আসবে আমার সঙ্গে ? তোমাকে একা খাওয়াতে পারি। তোমার সঙ্গে আমার—

সুরেলা গলায় হেসে মনীষা বললো বান্ধবীদের দিকে ফিরে, দেখছিস, কি কৃপণ ! আমাকে একা খাওয়াতে চায় ! ইস্, পয়সা বাঁচাবার কি চেষ্টা—

ব্যান্ডেলে পিকনিক করতে গিয়েও মনীষা কিছুতেই আমার সঙ্গে একা জলের ধারে এলো না। জন পনেরো মেয়ে-পুরুষ, তার মধ্যে মনীষা ডিমের শুধু খোলাটা হাতে দিয়ে ইয়ার্কি করলো আমার সঙ্গে, আমি ওর আঁচলে হাত মুছতে গেলাম, ও কমলালেবুর খোসার রস দিয়ে দিল আমার চোখে... কিন্তু কিছুতেই ও আমার সঙ্গে একা জলের ধারে এলো না। অথচ ফেরার পথে গাড়িতে মনীষা আমারই পাশে, ভিড়ের মধ্যে আমার সম্পূর্ণ শরীরে ওর সম্পূর্ণ শরীরের ছোঁয়া, তবু চোখে চোখ রাখে না।... দোলের দিন রং দেবার আবেগে আমি মনীষার বুক ছুঁয়ে দিলাম, মুখ ও গলা ছাড়িয়ে আমার হাত মুহূর্তে ঢুকে গেল ওর ব্লাউজের মধ্যে, গরম, পরিপূর্ণ দুই বুক—তবু মনীষা থমকে তাকালো না আমার মুখের দিকে, অথবা ভর্ৎসনা ও ধিক্কার দিল না, নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরমুহূর্তে ফিরে এসে এক গাদা কয়লার গুঁড়ো আমার মুখে মাখিয়ে ভূত সাজিয়ে দিল। বললো, এবার কেমন লাগে ?

কী আমার ত্রুটি, কী আমার ত্রুটি— একথা বোঝার জন্য আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। মনীষা পাগলও না, শিশুও না, অথচ দু'বছরের মধ্যে আমাকে একবারও একা কথা বলার সুযোগ দিল না। আমার সমস্ত ইশারা, ইঙ্গিত, কৌশল, অসহায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গি—সব ব্যর্থ করে মনীষা শুধু আমার ভিড়ের মধ্যে আপন হয়ে রইলো। আমার কি ব্যর্থ প্রেমিক হবারও যোগ্যতা

নেই ? কিন্তু না চাইতে পারলে ব্যর্থই বা হবো কি করে ? ভেবেছিলাম চিঠি লিখবো— অত কাছে ওদের বাড়ি— যে কোনো সময়ে গিয়ে দেখা করা যায়। চিঠি লেখাটা কেমন যেন বোকার মতন, তা ছাড়া আমার মনে মনে গভীর ধারণা ছিল, চিঠি লিখলে মনীষা হয়তো বাড়ির সকলকে সে চিঠি পড়িয়ে হাসাহাসি করবে। এম.এ. পাস করবার পর, মনীষা যখন সোস্যাল এডুকেশনের ট্রেনিং নিতে দু'মাসের জন্য হায়দ্রাবাদ গেল, তখন অনেক কায়দা করে ওর ঠিকানা যোগাড় করে মনীষাকে আমি চিঠি লিখেওছিলাম। পরিষ্কার, স্পষ্ট চিঠি। সে চিঠির উত্তর আসে নি, ফিরে আসার পরও মনীষার কোনো ভাবান্তর নেই। আমি অরুণের সামনেই মনীষাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মনীষা, তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম, তুমি উত্তর দিলে না কেন ?

মনীষা তখন হায়দ্রাবাদ থেকে কিনে আনা পাথরের মালা দেখাচ্ছিল, অম্লান চোখ তুলে বললো, ওমা, আপনি চিঠি লিখেছিলেন নাকি ? কই পাই নি তো ? ইস্, পেলে খুব ভালো হতো। বাইরে গেলে চিঠি পেতে এতো ভালো লাগে !

নিজেকে তখন একটা তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর আবর্জনার মতো মনে হয়। এই একটি সামান্য মেয়ের মন স্পর্শ করার আমার ক্ষমতা নেই। এর আগে আমি পুতুলখেলার মেয়ে দু'চারটি পেয়েছিলাম, মেয়েদের নিয়ে পুতুল খেলতে শিখে গিয়েছিলাম বেশ, কিন্তু পুতুলের মধ্যে প্রাণ খুঁজতে গিয়ে দেখি যে, আমার মন্ত্র জানা নেই। মনীষা অন্য কারুর কাছে ওর প্রাণ জমা রেখেছে কিনা, কিংবা কোন্ কৌটোয় বন্দী আছে ওর ভ্রমর— তা নিয়ে আমি গোপনে অনুসন্ধান শুরু করলাম। কিছুই টের পেলুম না। তা ছাড়া মনীষা যেমন ধরনের মেয়ে, ও যদি কারুকে ভালবাসে, সে কথা ওর গোপন রাখার কোনোই কারণ নেই। ওর কলেজের পুরুষ-বন্ধুরাতো প্রায়ই ওকে বাড়িতে ডাকতে আসে। বিনা দ্বিধায় মনীষা ওদের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে গল্প করে, বা বেরিয়ে যায়। ওদের বাড়িতে স্বাধীন আবহাওয়া, ওর বাবা ওদের কোনো কাজে বাধা দেন না, তা ছাড়া তিনি করপোরেশনের কাউন্সিলার বলে বাড়ির ব্যাপারে তেমন দৃষ্টি নেই, সমাজ-জীবন নিয়েই ব্যস্ত। অরুণের সঙ্গে ওর বয়সের তফাত বেশি নয়, ভাইবোনের সম্পর্কও বন্ধুর মতন। মনীষা ভ্রূক্ষেপহীনভাবে আমাকে বিষম কষ্ট দিতে লাগলো। আমার এ কষ্টের কথা কোনো বন্ধু-বান্ধবকেও বলা যায় না। এই একটা ব্যাপারে আমি যত বেশি নিঃসঙ্গ হতে লাগলুম, ততই মনীষার জন্য আমার ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো। তখন আমি অরুণ-মনীষাদের বাড়ি যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলাম।

আর, তারপর থেকেই আমি বুঝতে পারলুম, মনীষাকে না দেখে ক্রমশ আমি আমার শক্তি ও মহিমা হারিয়ে ফেলছি আবার। আমি আবার তাস খেলায় হারতে লাগলুম, অল্প মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগলুম, রাস্তা পার হতে গিয়ে প্রায়ই চাপা পড়ার উপক্রম, যেসব সামান্য লোকেরা আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস করে নি, তারা অনায়াসে এসে আমাকে অপমান করে যেতে লাগলো। বুঝতে পারলুম, মনীষার ব্যাপারটা একেবারে চুকিয়ে ফেলা দরকার।

তারপর, এর সাড়ে চার মাস বাদে, মনীষার সঙ্গে আমার হঠাৎ একা দেখা হয়ে গেল। সন্ধেবেলা একা ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরোচ্ছি, পেছন থেকে মনীষা আমায় ডাকলো। মনীষাও লাইব্রেরিতে ছিল। আমি শান্তভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কখন এসেছো ? ও বললো, সেই কখন এসেছি। দুপুর তিনটে থেকে ! আমার ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। এতক্ষণ একই সঙ্গে আমরা দু'জনেই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ছিলাম, অথচ আমি ওকে দেখি নি ! এখন বেরুবার মুখে নিশ্চয়ই অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, হয় ওর চেনা অথবা আমার, তারা আর সঙ্গ ছাড়বে না। আমার দারুণ ইচ্ছে হলো, কোনো একটা অলৌকিক উপায়ে আমরা দু'জনে

এখান থেকে একসঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাই।

অন্য কারুর সঙ্গে দেখা হলো না। আমি মনীষাকে বললুম, তুমি এখন বাড়ি যাবে তো ?

— হুঁ। আপনি বুঝি এখন আড্ডা মারতে যাবেন আবার। চলুন, আমাকে বাস পর্যন্ত পৌছে দিন অন্তত !

— আমার কোথাও যাবার কথা নেই। চলো, ময়দান দিয়ে এসপ্লানেড পর্যন্ত হেঁটে যাই। তারপর তোমায় ওখান থেকে বাসে তুলে দেবো। তাই যাবো ? আজ তো গরম নেই ?

— ভারি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে আজ, না ? লাইব্রেরির ভেতরটা এমন গুমোট !

কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে চললুম দু'জনে। সাড়ে চার মাস ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, তা নিয়ে মনীষা একটি কথাও বললো না। অথচ, আমি প্রতিদিন ওর কথা ভেবেছি। মনীষার প্রতিটি ভঙ্গি ও কথা স্বাভাবিক, দেখলে মনে হয় যেন ও আমার দেখা পেয়ে খুশিই হয়েছে। হাসুক বা না হাসুক, মনীষার নিচের ঠোঁট সবসময় হাসিতে টুসটুসে, পরিচ্ছন্ন মুখে চাঁদের আলো পড়ে কিছুটা রং বদলে দিয়েছে, হালকা মেরুন রঙা সিল্কের শাড়ি পরা, যেন মনে হয় শাড়িটা ওর শরীরে সম্পূর্ণ আলাদা, শরীর জড়িয়ে আছে অথচ শরীর ছুঁয়ে নেই। দুই ভুরুর মাঝখানে লাল টিপ, ঠিক মাঝখানে নয়, একটু বেঁকে আছে। হাঁটছে খানিকটা উচ্ছলভাবে, মাঝে মাঝে হাতের ছোট্ট ব্যাগটা ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছে। আমি বললুম, মনীষা, তোমার হাতটা দেখি।

বিনা দ্বিধায় একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে মনীষা বললো, দেখুন, কী রকম হাতটা ঘেমেছে। আমার ভীষণ হাত ঘামে।

আমি হাতটা নিয়ে নাকে গন্ধ শুকলাম। তোমার হাতে চুলের তেলের গন্ধ। চুলে কী তেল মেখেছো ?

মনীষা সাধারণত খোঁপা বাঁধে না, হাত দিয়ে চুলের গুচ্ছটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, গন্ধ শুঁকে দেখুন না। স্রেফ নারকোল তেল।

আমি দু'মুঠিতে ওর চুলের গুচ্ছ নিয়ে তার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিলাম। রাস্তার যে যা ইচ্ছে দেখুক। বললুম, তোমার চুলেও একটা সুন্দর গন্ধ। চুলের নিজস্ব গন্ধ।

কুলকুল করে হাসতে হাসতে ও বললো, তাই নাকি ? সবার নাকে অবশ্য এসব গন্ধ পাওয়া যায় না। আমি তো এখন একটা বিচ্ছিরি পচা গন্ধ পাচ্ছি।

— মোটেই কোনো পচা গন্ধ নেই।

— নিশ্চয়ই আছে। রাস্তার পাশে কোনো বেড়াল বা কুকুর মরে পচে আছে কোথাও। ওই যে, ওই দেখুন।

সত্যিই, রেসকোর্সের পাশে একটা মরা বেড়াল বা কুকুর পড়ে আছে। বোধহয় দিন-দুয়েক আগে গাড়ি চাপা পড়েছিল, পেটের কাছটা ছিন্নভিন্ন, চোখ দুটো নেই—দিনের বেলায় কাকেরা যতখানি সম্ভব ঠুকরে খেয়ে রেখে গেছে আগামীকালের জন্য। সেই বীভৎস দৃশ্যের দিকে তাকিয়েই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এখন ঐ জিনিসটা না দেখলে কি চলতো না ? কেন যে এসব চোখে পড়ে। আর কোনো কথা নেই কিছুক্ষণ। হাত ধরে দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে গেলাম খানিকটা। তারপর বললাম, মনীষা, তুমি এত অহঙ্কারী কেন ?

—বাঃ আপনার কাছে আবার কী অহঙ্কার দেখালুম !

—তুমি আমার সঙ্গে কথাই বলতে চাও না। আমার সঙ্গে দেখাই করতে চাও না। আমি তোমাকে—

—এই তো দেখা হলো। আপনারাই সব কোথায় কোথায় থাকেন।

—'আপনারাই' কেন ? শুধু আমার কথা জিজ্ঞেস করতে পারো না ?

—ওঃ, আপনারই তো অহঙ্কার দেখছি বেশি। শুনলুম, তাপসদার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে এর মধ্যে ?

—হ্যাঁ।

—দেখলেন, আমাদের নেমন্তন্নও করলো না। আপনার বিয়েতে করবেন কিন্তু, তখন আবার বাদ দেবেন না !

— তোমার বিয়ে কবে হচ্ছে ?

— তাই তো ভাবছি ! আমার আর সে সুদিন কি আসবে ? —বলেই মনীষা আবার হাসলো।

আমিও খানিকটা হেসে বললুম, মনীষা, আমার দিকে তোমার চেয়ে দেখতেই ইচ্ছে করে না, না ?

মনীষা সম্পূর্ণ মুখ ঘুরিয়ে বললো, এই তো দেখছি। আহা, এমন সুন্দর চেহারা আপনার, না তাকিয়ে পারি ? চলুন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গিয়ে কুলপীমালাই খাই।

—মনীষা, অনেকদিন থেকেই তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।

—এতগুলো কথা বলছেন, আবার আর একটা কথা ? চলুন না, কুলপীমালাই খাই।

—খাবো। তার আগে—

—তার আগে কেন ? পরে হয় না ! কী এমন কথা ? মাঝে-মাঝে এমন ছেলেমানুষি করেন আপনারা ?

—আবার 'আপনারা' ? আজ শুধু আমার নিজের কথা।

—কী স্বার্থপর আপনি ! চলুন, ঐ যে ঐ বুড়োর কাছে।

কুলপীপর্ব শেষ হলো সংক্ষেপে। আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল, এই সুযোগে আমি সিগারেট কিনে নিলাম। ডানদিক দিয়ে না গিয়ে, বললুম, চলো, রেড রোড ধরে যাই। সুন্দর রাস্তাটা।

আবছা অন্ধকারের রেড রোড। সাঁই সাঁই গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া মুখ থেকে বার না করতেই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এলোমেলো হাওয়া। আমরা হাওয়ার বিপরীত দিকে যাচ্ছি বলে মনীষার শরীরের সবক'টি নিখুঁত রেখা ও আয়তন আমার চোখে পড়ে। আমি পাশাপাশি চোখে মনীষার গ্রীবা ও স্তন এবং উরুর দু'ভাঁজ দেখে নিয়ে ইচ্ছে করে একটু পিছিয়ে এসে ওর পশ্চাৎ শরীরটাতেও চোখ বুলিয়ে নিই। আর যাই হোক, মনীষাকে ত্রুটিহীন রূপসী বলা যাবে না, কোমরটা আরও আরও সরু হওয়া উচিত ছিল। তম্বুরা দু'টি তেমন গুরু নয়। চুলের গুচ্ছও কম চওড়া। কিন্তু দু'একটা ত্রুটি না থাকলে রূপ কখনো মোহিনী হয় না। মনীষার বাঁ চোখের পাশে একটা কাটা দাগ আছে, আমার বারবার ঐ কাটা দাগটায় চুমু খেতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে করে ওর মুখের ঐ কাটা দাগের ছাপ আমার মুখে তুলে নিতে। মনীষার মুখখানাই দেখার জন্য আমি আবার পাশাপাশি এগিয়ে এলাম।

হাত তুলে উড়ন্ত চুল সামলাবার চেষ্টা করে মনীষা বলেছিল, আঃ, আজ এত ভালো লাগছে হাঁটতে। কী সুন্দর রাস্তাটা, এ রাস্তা দিয়ে সবসময় আমরা গাড়িতেই যাই, কিন্তু হেঁটে যেতেই তো বেশি ভালো লাগে। আপনার লাগে না ?

— হুঁ। কিন্তু আজ একটু বেশি হাওয়া। কথা বলতে গেলে জোরে জোরে বলতে হয়।

— কথা না বললেই হয়। চুপচাপ হাঁটতেই বেশি ভালো লাগে।

— কিন্তু তোমাকে যে একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করতেই হবে। দেখি তোমার হাতটা দাও।

— জানেন, হাজারীবাগে একটা রাস্তা আছে, অদ্ভুত ভালো। দু'পাশে গভীর জঙ্গল, মাঝখান

দিয়ে টানা ঢেউ খেলানো রাস্তা। সে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে কারুর কোনো কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ঐ জায়গাটাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নির্জন। আমরা চার–পাঁচজন ছিলুম, আমার বন্ধু রত্নার বর, আর তার দু'জন বন্ধুও ছিল, কিন্তু কেউ আমরা সেই রাস্তায় একটাও কথা বলি নি। জানেনই তো আমি একটু বেশি কথা বলি, আমি পর্যন্ত চুপ। আধঘণ্টা ধরে শুধু আমাদের জুতোর শব্দ।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললুম, মনীষা, মাঠের মধ্যে গিয়ে একটু বসবে ?

—না। দেরি করতে পারবো না আর। এবার ফিরতে হবে, চলুন বাসে উঠি।

—এসো, তা হলে এখানে একটু দাঁড়াই।

—রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আমার দাঁড়াতেও ভালো লাগে না। হেঁটে যেতেই ভালো লাগে।

কিন্তু মনীষার হাত আমার হাতে ধরা ছিল, তাই দাঁড়িয়ে রইলুম। একটা বিশাল রেনট্রি গাছের নিচে। আমার ঠোঁটের কাছটা তেতো লাগছে, সমস্ত শরীরভরা অপমান। কোনো ভাষা নেই, মানুষ যা চায় তা দুম করে বলে ফেলতে পারে না কেন ? এরকম অসুবিধের মধ্যে আর কখনো পড়ি নি। একবার ইচ্ছে হলো ওকে জিজ্ঞেস করি, আমি তোমাকে ভালবেসে শান্তি পেতে চাই, তুমি আমাকে শান্তি দিতে চাও কি চাও না, এক কথায় সাফ উত্তর দিয়ে দাও !

কিন্তু জানি, যা মেয়ে, এ কথায় খিলখিল করে হেসে উঠবে। পাজী, মেয়েগুলো সব ক'টাই এক একটা পেজোমির ডিপো। আমার দ্বারা এদের ট্যাক্ল করা বোধহয় সম্ভবই নয়। আমি একটু অধীরভাবে বললুম, মনীষা, আমার সঙ্গে এখানে একটু দাঁড়াতে তোমার ভালো লাগছে না ?

— কেন লাগবে না ! খুব ভালো লাগছে। কিন্তু এবার বাড়ি ফিরতে হবে যে।

— একটু দেরিতে কি ক্ষতি হবে ? মনীষা, তুমি আমাকে ভয় পাও ? সত্যি সশব্দে হেসে উঠে মনীষা বললো, কেন, ভয় পাবো কেন ? আপনি আজ এত বোকা–বোকা কথা বলছেন কেন ? কী হয়েছে আপনার ?

— কিচ্ছু হয় নি। আমি তোমাকে কাছে পেতে চাই—

— এই তো কাছে আছি, আরও কাছে আসবো ? এই তো এলাম, এবার বাড়ি চলুন লক্ষ্মীটি।

— তুমি কি কিচ্ছু বুঝতে পারো না ?

— না, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি না। এই রাতদুপুরে আপনাকে বোঝাতেও হবে না।

আমার ধৈর্যের সেখানেই শেষ। আমার ভালো হওয়ার চেষ্টার সেখানেই শেষ। আমার পথ বদলাবার চেষ্টারও সেখানেই শেষ। প্রায় একটা হ্যাঁচকা টানে আমি মনীষাকে টেনে এনেছিলাম আমার বুকের ওপরে। এত জোরে যে, ওর মাথায় আমার থুতনি ঠুকে যায়। দানবের শক্তিতে আমি ওকে আঁকড়ে ধরলুম, একটা হাত ওর পিঠে, এমন দৃঢ় যে ওর নরম পিঠে যেন আমার পাঁচটি আঙুল বসে যাচ্ছে, মটমট করে এখুনি ভেঙে যাবে ওর পাঁজরা, অন্য হাতে আমি জোর করে মনীষার মুখটা তুলে, মনীষা প্রথমে ঠোঁট খুলতে চায় নি, কিন্তু আমি বুলডোজার চালানোর মতো দুই ঠোঁটে, যতক্ষণ না আমার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল—ততক্ষণ চুমু খেয়েছিলাম। দেখা যাক, এই ভাষা ও বোঝে কিনা।

আমি ছেড়ে দিতে, শাড়ির আঁচল দিয়ে মনীষা প্রথমে ঠোঁট ও পরে সমস্ত মুখ মুছলো। তারপর খুব শান্তভাবে বললো, ছিঃ, কেন এরকম পাগলামি করলেন ? আমার তখন উত্তর দেবার ইচ্ছে নেই। আমি তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছি, চোখ ঘোলাটে হয়ে এসেছে, মনীষা যে দাঁড়িয়ে আছে, ওর যেন কোনো পটভূমিকা নেই, কেননা, আমি দূরের গাছপালা অন্ধকার বা আকাশ কিছুই দেখতে পাই নি, আমি শুধু মনীষাকে দেখেছিলাম। ওর সেই ক্ষীণ মূর্তি যেন মাটি স্পর্শ করেও আকাশ পর্যন্ত ছুঁয়েছে। আমি আবার চুমু খাবার জন্য ওকে টানতে যেতেই মনীষা দ্রুত হাত তুলে,

ওর নিজের নয়, আমার ঠোঁট চাপা দিল। ওর নরম হাতের চাপে আমার ঠোঁট বন্ধ। কাতর গলায় বললো, আপনাকে আমি আর পাগলামি করতে দেবো না। দেখবেন, পরে এজন্য আপনার নিজেরই কষ্ট হবে।

— আমার এখনই যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন ?

— আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি ? তা হলে না জেনে দিয়েছি। সত্যি, আমি কী কষ্ট দিলাম আপনাকে ?

তখন আমার মাথার ঠিক নেই। আমার সবকিছু উল্টোপাল্টা, লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। চরমভাবে হেরে যাবার সময় সব মানুষই কাপুরুষ হয়ে যায়। আমি কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বললাম, তুমি কিছু বুঝতে পারো না, না, ন্যাকা ? বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনীষার ফর্সা গালে আমি থাপ্পড় কষিয়েছি। এত জোরে মারার হয়তো আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু থাপ্পড় মারার ইচ্ছে হবার মত ইচ্ছেই তো কখনো হয় নি আগে। আমি খর চোখে মনীষার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মনীষাও আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। একটুও রাগ নেই মুখে, চোখ দুটি এমন স্নিগ্ধ যে মনে হয় চোখ থেকে আলো বেরুচ্ছে। না, আলো-টালো নয়, এখুনি হয়তো ওর চোখে জল আসবে। আস্তে আস্তে বললো, আপনি সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন নাকি ? আপনি এত ছেলেমানুষ তা তো জানতুম না। এতো জোরে কেউ কারুকে মারে ? সত্যি খুব লেগেছে।

—মনীষা, আমার দোষটা কি ? আমার কিসে অযোগ্যতা ?

—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লুম দেখছি। আপনার দোষের কথা আমি বলেছি ? আমি শুধু বললুম, আপনি ছেলেমানুষি করছেন।

—তুমি সব কথা এড়িয়ে যাচ্ছো। আমাকে জানতেই হবে আমার অযোগ্যতার কারণ। তুমি আমার উত্তর দাও।

—আমি আর কোনো কথা শুনবোও না, উত্তরও দেবো না। আমি এবার বাড়ি যাবো। তা বলে, আপনি যে রাগ করে আমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে একা ফেলে যাবেন, তা হবে না কিন্তু। আমাকে বাস-রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে হবে।

মনীষা আলতো করে আমার হাত ধরে অনুনয়ের স্বরে বললো, চলুন, চলুন না লক্ষ্মীটি ! মিছিমিছি আপনি আমার ওপর রাগ করছেন।

কী ধাতুতে গড়া এ জিনিস ? মেয়ে না ডাকিনী ? এই চব্বিশ বছরের শরীরবাহী জীবন নিয়ে ও কি চায় ? মনীষার শরীর তো ঠাণ্ডা নয়, আমি ওর বুক ছুঁয়ে দেখেছি, শীতকালের বিড়ালের মতন ওর বুক নরম ও গরম। দোলের দিন আচমকা আমি ওর বুক ছুঁয়ে দেবার পর, ওর মুখের রেখায় কোনো লজ্জা ছিল না, কিন্তু ওর উদ্যত বুক লজ্জা ও আবেগ অনুভব করেছিল, আমি সেই মুহূর্তেই টের পেয়েছি। আজ চুমু খাবার সময়ও আমি ওর তপ্ত জিভ ছুঁতে পেরেছিলাম। তবু কেন এমন স্পৃহাহীন ভঙ্গিতে আমাকে আজ নিরুত্তর করলো ! আমাকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও নিহত করে ওর কিসের আনন্দ ? এইটুকু একটা পুঁচকে মেয়ে মুঠোর মধ্যে টিপে ধরলে কোথায় যায় তার ঠিক নেই, অথচ আমাকে এমন অসহায় ও নির্বোধ করে দিতে পারে ! আসলে সব মেয়েই কি তবে কালীপ্রতিমা হতে চায় ! গলায় নরমুণ্ডের মালা না পরতে পারলে সুখ নেই। কয়েকটি পুরুষের ছিন্নমুণ্ডের মালা। দেখি, দেখি, ঐ তো মনীষা ওর গলায় হায়দ্রাবাদ থেকে কেনা পাথরের মালা পরেছে, ওর বদলে বুঝি মুণ্ডমালা চাই !

নীরবে মনীষার সঙ্গে আমি ময়দানের বাকি পথটুকু হেঁটে এলাম। হঠাৎ আমার কি রকম অনুতাপ হলো, আহা, ওর মতন একটা হাসিখুশি মেয়েকে কেন আমার চুপ করিয়ে দিতে হলো। কিন্তু আমার কোথায় দোষ, কোথায় ভুল—কিছুতেই যে বুঝতে পারি না। আমি চেয়েছিলাম

একটি মেয়ের ভেতর থেকে একটি মেয়েকে বার করে আনতে। পারলুম না, কি করে আনতে হয় জানি না, কিন্তু একথা স্পষ্ট জানি, হৃদয়–ফিদয় নয়, একটি মেয়ের ভিতরের মেয়েটিকে না দেখতে পেরে আমার চলবে না। এবং সে না দেখালে ঐ রূপ আমি কোনোদিন দেখতে পাবো না ! মধুপুরে একটা ফুলবন্ত শিরীষ গাছ দেখে আমার ভালো লেগেছিল, আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই গাছটির মধ্যে একটি নারীর সৌন্দর্য আছে। দুটো ফুটফুটে কুকুরের বাচ্চাকে খেলা করতে দেখেছিলাম একবার, সেই চমৎকার দৃশ্যটির মধ্যেও ছিল একটি নারীর রূপ। এমন কি একটা বিছানার চাদরের অভিনব ডিজাইন দেখেও একটি রমণী রূপের আভা পাই, যেখানে যা কিছু সুন্দর দেখেছি তার মধ্য থেকেই একটা সর্বজনীন নারী বেরিয়ে আসে। আর, একটা নারীর মধ্যে আমি সেই নারীকে পাবো না ? এখনো পাই নি, মনীষাকে পাওয়া হলো না।

মনীষার সঙ্গে তার পরেও দেখা হয়েছে, কোনো অভিযোগ করে নি, ব্যবহার আড়ষ্ট করে নি, কিন্তু সামান্য দূরত্ব রেখেছে। মনীষার রহস্য জানতে আমার আরও কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। কিন্তু মনীষার সঙ্গে একা দেখা করার ইচ্ছে আমার আর হয় নি। তবে মনীষার সেই সন্ধেবেলার ব্যবহারের পর, আমার অভিমানপ্রসূত ক্রোধ দীর্ঘদিন ছিল, পরবর্তী তিন চার মাস আমি মেয়েদের প্রতি প্রতারক ও নৃশংস হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম, শরীর ছেনে কিংবা শরীর ছিঁড়ে বোধহয় শরীরের রহস্য জানা যাবে। কিন্তু কোথায় রহস্য, শরীর মানে শুধুই শরীর, শুধু শরীরটাকেও মাঝে মাঝে ভোগ করতে মন্দ লাগে না, হাতের কাছেই অন্য একটা শরীর পেতে ইচ্ছে করে, হাত তখন সেই শরীরের নানা সংস্থান দেখে নিতে চায়, বেশ লাগে, তখন নিজের প্রতিটি অঙ্গ অন্য প্রতি অঙ্গের সঙ্গে জুড়ে যায়, কিন্তু কখনো তো লোভ জাগে না। মন তো বলে না, আমি তাকে সম্পূর্ণ দেখেছি, তার রূপ আমাকে তিরস্কার না করে, পবিত্র হতে বলেছে ? মানুষ কেন অমন শীতের মধ্যেও অত ভোরবেলা উঠে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যায় ? বেশি কথা কি আমি অকপটে বলতে পারি, আমি টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট নারী–সৌন্দর্য দেখেছিলাম, কিন্তু কোনো নারীর মধ্যে সেই সূর্যোদয়ের শোভা দেখে যাবার জন্য আমার এখনও লোভ।

দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর কয়েকদিন বাড়ি থেকে বেরোই নি। অনেকদিন পর, কিছুটা পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে দিন কাটলো। বড়দি মা আর বাবাকে সেজ কাকার বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো। শোকের বাড়ি, কিন্তু একটা ছোট উৎসবেরও ভাব আছে। দিদির ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পর দাদু–দিদিমাকে পেয়ে খুব ছুটোছুটি দৌরাত্ম্য শুরু করে দিল, ওদের আর কে বারণ করবে। মা প্রথম দিকটায় খুব কান্নাকাটি করছিল, কিন্তু এরই মধ্যে এক সময় কান্না থামিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোর থুতনিতে কাটলো কী করে ?

আমি বললুম, দিদির বাথরুমটা যা হড়হড়ে হয়ে আছে। পা–পিছলে—

মা বললো, শোন, এদিকে আয়, আমার কাছে এসে বোস একটু।

মায়ের চেহারা খুবই খারাপ হয়ে গেছে, শুধু রোগা নয়, চামড়াগুলো যেন শরীরের থেকে আলগা। বললুম, বৌদি তোমার যত্ন করে না বুঝি ? তোমার শরীর এত খারাপ হলো কী করে?

—যত্ন করবে না কেন ? সরমা একেবারে লক্ষ্মী। হ্যাঁরে, তুই কবে ওসব করবি ? লোকে আমাদের নিন্দে করে। আমরা তোর জন্য কোনো ব্যবস্থা করলুম না। বাবা যদি তোর বউয়ের মুখ দেখে যেতে পারতেন।

—তোমার বাবার সঙ্গে আমারই আর দেখা হলো না, আর আমার বউয়ের মুখ।

—একবারও গেলি না হাসপাতালে ? তোকে এত ভালবাসতেন।

—আমিও ওঁকে খুব ভালবাসতুম। এখনও বাসি। কিন্তু মা, আমার হাসপাতালে যেতে একেবারে ভালো লাগে না। কতদিন যাবো ভেবেছি, কিন্তু হাসপাতালের মুখ পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এসেছি। অসুখ দেখতে আমার ইচ্ছে করে না।

—আমার অসুখ হলেও তুই দেখতে যাবি না, না ? কবে একদিন মরে যাবো, জানতেও পারবি না।

— ও কি কথা ! আমি তা বলছি নাকি ? হাসপাতালে গেলে শুধু তো নিজের লোকই নয়, আরও অনেক অসুস্থ লোকও যে চোখে পড়ে।

—তোর শরীর ভালো আছে ?

বড়দি সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকেছিল, বলে উঠলো, ওর কথা আর বলো না, মা। যা কাণ্ড করে বেড়ায়, শরীরের কথা ভাবে নাকি ? তবু তো চোখের সামনে রেখেছি।

আমি বললুম, একেবারে বিশ্বাস করো না, মা ! আমি খুব ভালো আছি ! আমার জন্য একদম ভেবো না। আমিই বরং তোমাদের জন্য ভাবি।

—আমাদের জন্য তোকে আর ভাবতে হবে না। তা যদি সত্যিই ভাবতিস, তাহলে তো আজ কথা ছিল না।

—মা, তুমি কিছুদিন এখানে থেকে শরীরটা সারিয়ে যাও। আমার এক বন্ধু আছে চোখের ডাক্তার, খুব ভালো ডাক্তার, তাকে দিয়ে তোমার চোখটা দেখিয়ে দেবো এবার।

—আমি সোমবারই বহরমপুর যাবো। সরমার বাচ্চা হবে, ওকে একা ফেলে রেখে এসেছি।

—এই এক বছরের মধ্যে আবার বাচ্চা ?

মা হঠাৎ শিউরে উঠে বললো, জানিস খুকী, গায়ত্রীর কথা শুনেছিস্ ? ঐ যে মুখুজ্যেদের বাড়ির গায়ত্রী ? ছ' মাসের পোয়াতি মেয়েটা, এই সেদিন পাড়াসুদ্ধ সবাইকে সাধের নেমন্তন্ন খাওয়ালো, তার ক'দিন পরেই কি সর্বনাশ হয়ে গেল ! ওর বর অপরেশ মারা গেছে গত মাসে!

দিদি বিষম চমকে বললো, ওমা সে কী কথা ! ইস্—মাত্র দেড় বছর বিয়ে হয়েছিল ! কিসে মরলো ?

— পেটে কি যেন হয়েছিল, অপারেশন করাতে গিয়ে—। এদিকে গায়ত্রীর এখন সাত মাস চলছে। আহা, কি ভাগ্য মেয়েটার—দিদি আর মা গায়ত্রীর ব্যাপার নিয়ে খুব শোক করতে লাগলো। আমি গায়ত্রীকে কখনো সিঁদুর পরা অবস্থাতেই দেখি নি, সুতরাং ওর কপাল থেকে সিঁদুর মোছার দৃশ্যটা কল্পনা করা শক্ত হলো। আমি জিজ্ঞেস করলুম, অপরেশ কোন্ বাড়ির ছেলে ? গায়ত্রী নিজে ইচ্ছে করে বিয়ে করেছিল ?

—না, ওর বাড়ির লোকেরাই বিয়ে দিয়েছিল। নতুন স্টেশন মাস্টারের ছেলে। বেশ ভালো ছেলে, স্বাস্থ্য ছিল কী—আমাদের শম্ভুর মতন—এ-ই রকম ! পেচ্ছাপের কষ্ট ছিল শুনেছি—তাই পেটে অপারেশান করাতে গিয়েছিল। আহা, মেয়েটার কপাল ! এই বয়েস, তাও পেটে সন্তান।

বড়দি বললো, তোমরা ছটকু'র সঙ্গে গায়ত্রীর বিয়ে দিতে চেয়েছিলে না ?

মা শিউরে উঠে বললো, কি ভাগ্য যে হয় নি। ও মেয়ের যা অলক্ষুণে কপাল—

বড়দি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আহা, ওর দোষ দিচ্ছো কেন শুধু শুধু ? অপরেশের নিজের কপালেই মৃত্যু থাকতে পারে না ? ছটকু'র সঙ্গে বিয়ে হলে ওর ভাগ্যটা হয়তো বদলে যেত।

আমি ছোট হেসে বললাম, আমার সঙ্গে বিয়ে হলে গায়ত্রী নিজেই মরে যেতো তাড়াতাড়ি!

—দূর ! অমন নিষ্ঠুরের মতন কথা বলিস কেন ?

—সত্যি বলছি। এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছে আমার বিয়ের এক বছরের মধ্যে বউ মরে যাবে—যদি আমি তিরিশ বছরের আগে বিয়ে করি !

দিদি অর্ধেক অবিশ্বাসময় চোখ তুলে বললো, বাজে জ্যোতিষী ! মা বললো, তোর কোষ্ঠী আছে আমার কাছে, আমি জানি না ? তুই আমাকে বাজে কথা শোনাবি ?

জেলখানার পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ন্ত বিকেলবেলায় গায়ত্রী অপরেশকে বলতে পারে নি যে, ও বিয়ে করতে চায় না ? অপরেশের দিকে করুণ চোখ তুলে ও বলতে পারে নি, বিয়ে না করেও ও অনেক কিছু জানতে চায় ? গায়ত্রীর শখ ছিল পড়াশুনো করতে বিলেত যাবে। বাংলাদেশের মফস্বল শহরের উকিলের মেয়ে হয়ে কী উদ্ভট শখ ! এখন সাদা শাড়ি পরে সকালের ইস্কুলে মাস্টারি করুক। পেটের সন্তানটি যদি না বাঁচে, আর নিরামিষ খেয়ে যদি চেহারাটা নষ্ট না হয়, তবে ভবিষ্যতে কোনো আদর্শবাদী পাঞ্জাবি যুবকের সঙ্গে ওর আবার বিয়ে হলেও হতে পারে। গায়ত্রীর জন্য আমার দুঃখিত হওয়া উচিত কিনা ঠিক বুঝতে পারলুম না। ওর এখনকার মুখ তো আমি দেখি নি, ওর বিষণ্ন মুখ দেখলে হয়তো আমিও প্রবল অসুস্থতা বোধ করতুম। কিন্তু গায়ত্রীর বিষণ্ন মুখ দেখতে আমি আর বহরমপুরে যাবো না।

বাবাকে নিয়ে আর একটা মুশকিল হলো। দিদি এমন কাণ্ড করে ! বাড়িতে আর জায়গা নেই বলে বড়দি আমার ঘরেই আর একটা খাট পেতে সেখানে বাবার শোবার ব্যবস্থা করেছে। বয়স্ক ছেলে আর বাবা কখনো একঘরে শোয় নাকি ? সিগারেট-টিগারেট খাবার অসুবিধে, নানান ঝামেলা। আমি বড়দির কাছে সামান্য আপত্তি করেছিলুম, শোনে নি; আমি যদি এই নিয়ে চেঁচামেচি করতুম তা হলে তার মানে এই হতো, আমি বাবাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করি না ! ভক্তি শ্রদ্ধার ব্যাপারই নয়, বাবার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই কম কথা বলি। চার পাঁচ বছর একেবারে কথাই বলা হয় নি, এখন তাঁর সঙ্গে এক ঘরে শোবার মধ্যে কী যে অস্বস্তি তা বলা যায় না। অথচ এই সময়টা বাড়ির বাইরে রাত কাটানোও খারাপ দেখাবে নিশ্চিত। আমি এখন নিজের ঘরে পারতপক্ষে ঢুকি না, বাড়ির মধ্যে মেয়েদের কাছে, কিংবা বড়দির ছেলেমেয়ের সঙ্গে ক্যারাম খেলে সময় কাটাই। রাত্তিরবেলা কোনোক্রমে ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ি।

শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসে না, অন্ধকারের মধ্যে আমি বাবার খাটের দিকে তাকিয়ে দেখি। এত গরম সারা রাত পাখা চালাতে হয়, এর মধ্যেও বাবা গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে শুতে ভালবাসেন। ওঁরও ঘুম আসে না, ঘুম খুব কমে গেছে মনে হয়, কোনো এক সময় রাত্তিরে উঠে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরান। অন্ধকারে সিগারেটের মাঝে মাঝে টানের লালচে আভায় আমি ওঁর অস্পষ্ট মুখ দেখতে পাই।

এর মধ্যে দু'একটা কথা হয়েছে বাবার সঙ্গে। প্রথমদিন রাত্তিরে আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সারারাত পাখা চললে আপনার অসুবিধে হবে ? তিনি সংক্ষেপে বলেছিলেন, না। তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি যে আগের চাকরি ছেড়ে রমেশের এখানে চাকরি নিলে—আত্মীয়স্বজনের অফিসে চাকরি করা ভালো ?

আমি তখন টেবিলে বইগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে না ফিরেই বললাম, এই, বড়দি খুব জোর করতে লাগলো ... মাইনে বেশি—

—তবু সরকারি চাকরিতে একটা স্থায়িত্ব ছিল। লোকে সহজে গভর্নমেন্ট সার্ভিস পায় না।

একথার উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি মুখে একটা অস্পষ্ট শব্দ করেছিলাম শুধু।

বাবার মাথার চুল প্রায় সবই পেকে গেছে, রিটায়ার করেছেন প্রায় পাঁচ-ছ' বছর, শীর্ণ চেহারা, দু-তিনদিন দাড়ি কামান নি বলে আরও রোগা লাগছে মুখটা। অনেক রাত্তিরে বিছানায় উঠে বসে যখন চাদরমুড়ি দিয়ে সিগারেট খেতে থাকেন—তখন সেই ভঙ্গির মধ্যে কী রকম

যেন একটা অসহায়তার ছবি দেখতে পাই। এ পাশের খাটে অন্ধকারের মধ্যে আমি চোখ খুলে শুয়ে আছি। হঠাৎ বাবাকে খুব নিঃসঙ্গ ও পরিত্যক্ত মনে হয়। হঠাৎ আমার আন্তরিক ইচ্ছে হয়, উঠে বসে আমি বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ মন খুলে কথা বলি। ঐ আমার জনক, অন্ধকারের মধ্যে আমার দিকে চেয়ে আছেন। মনে হয়, ওঁরও আমাকে কিছু বলার আছে। নিজের শরীরে এর মধ্যে কি দু'একবার মৃত্যুকে টের পান নি ? পেয়েছেন নিশ্চিন্ত, এখন শেষবারের মতন নিজের বংশধরকে কোনো গূঢ় কথা বলার থাকে না ! বাবার সম্পর্কে আমার সমস্ত রাগ অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে যে ভাবটা আসে, তাকে করুণা বললে কি ভুল বলা হবে ? ওঁকে মনে হয় খুবই অসহায়, আমার হাতখানা ওঁর দিকে বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। ওঁর অসুখ করলে আমি কপালে জলপট্টি লাগিয়ে বহুক্ষণ চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে চাই। মাঝে মাঝে বাবা কাশতে থাকেন, ঘঙ ঘঙ করে কাশির শব্দ হয়, বুকের মধ্যে যেন অসংখ্য জাল, তারপর থুক থুক করে অনেকক্ষণ থুতু ফেলেন পাশের ডাবরে। আমার ইচ্ছে করে, উঠে হাত দিয়ে ওঁর মুখের থুতু মুছে দিই। হাত দিয়ে ওঁর থুতু ছোঁয়ার কথা ভেবেও এখন আমার একটুও ঘৃণা জাগে না। ওঁকে দু'একটা ভরসার কথা শোনাতেও ইচ্ছে করে। কিন্তু কি করে কথা শুরু করবো বুঝতে পারি না। ছেলেবেলা থেকেই তো বাবার সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলতে শিখিই নি। অন্ধকারে দু'জন মানুষ রক্তের সম্পর্কে সবচেয়ে আপন, অথচ কথা বলার ভাষাই জানি না। কিছুই বলা হয় না। আমি চুপ করে জেগে সিগারেটের লাল আলোয় বাবার অস্পষ্ট মুখ দেখি।

৫

কয়েকদিন পর অফিসে গিয়ে দেখলুম, আমার টেবিলে একটা কাগজ চাপা দেওয়া আছে। গতকাল শেখর আমাকে টেলিফোন করেছিল, আমি এলেই যেন ওর সঙ্গে পাঁচ নম্বর বাড়িতে দেখা করি।

শেখর নিরুদ্দেশ থেকে ফিরেছে তা হলে ? পাঁচ নম্বর বাড়িতে এখন কে যাবে। ওসব জায়গায় যেতে আমার এখন একটুও ভালো লাগে না। দেখা যাক কি ব্যাপারটা, ভেবে আমি ওর অফিসে টেলিফোন করলুম। শেখর অফিসে নেই, গত পাঁচদিন ধরেই আসে নি, আরও তিন সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়েছে নাকি। কলকাতায় আছে, অথচ অফিসে যাচ্ছে না কেন ছেলেটা ? আমি শেখরের বাড়িতে ফোন করলুম।

টেলিফোন ধরলো তপতী, তপতীর গলার আওয়াজ পেয়েই শিউরে উঠলুম আমি, তপতী কানে খুব কম শোনে—ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা এক মহাঝঞ্ঝাট। অফিসের টেলিফোনে এখন আমি চেঁচামিচি করবো নাকি ? ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করলে বোধহয় মন্দ হয় না, কারণ আমি দেখেছি কালা লোকেরা ইংরেজিটা বেশ ভালো বুঝতে পারে। যাই হোক, আমি গলার আওয়াজ যথাসম্ভব ছুঁচোলো করে জিজ্ঞেস করলুম, শেখর আছে ? ওপাশ থেকে তপতীর গলা ভেসে এলো, হ্যালো, আপনি কে কথা বলছেন ?

—শেখর আছে নাকি ?

—আপনি কে কথা বলছেন ?

—বললেও তো শুনতে পাবে না। নাম বলে আমার লাভটা কি ? অন্য কারুক টেলিফোনটা দাও চটপট।

— সুনীলদা ? গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছি। দাদা বাড়ি নেই।

— বাড়ি নেই মানে, এ ক'দিনে একবারও বাড়ি ফেরে নি, না, আজ এখন বাড়ি নেই ? এত বড় সেন্টেন্স আমার পক্ষে, বোঝা ... ঝামেলা।

— দাদা কলকাতার বাইরে গেছে। বলে গেছে সাতদিনের আগে ফিরবে না।

— তুমি কি আমার সব কথা শুনতে পাচ্ছো নাকি ? দেখা যাক। তপতী, তুমি কেমন আছো?

— আর কিছু বলবেন ? মা'র সঙ্গে কথা বলবেন নাকি ?

— তপতী, তুমি কেমন আছো ?

— মা'র সঙ্গে কথা বলবেন না ? আচ্ছা, আপনি ভালো আছেন তো ?

এরপর আমি মুখে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জরণ তুলে টেলিফোন ছেড়ে দিলাম। তপতী কি আমার সব কথা শুনতে পেয়েছে নাকি ? সর্বনাশ ! কিন্তু তা কি করে হয়, কালারা তো মুখের দিকে তাকিয়েই অধিকাংশ কথা বোঝে, তা হলে টেলিফোনে কি করে শুনবে ? কে জানে কি ! নাকি আন্দাজে চালিয়ে গেল ?

একটা কথা মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলুম যে সুবিমল আসার আগেই আজ পালাতে হবে। সুবিমলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আবার অবিনাশ বা পরীক্ষিৎ বা তাপসের সঙ্গে গিয়ে জড়ো হওয়া, সেখান থেকে হৈ-হল্লা শুরু করা, ওর মধ্যে আজ আমি নেই। শেখরকে খুঁজতে পাঁচ নম্বর বাড়িতেও আমি যাবো না, তা ছাড়া বাড়ির লোক তো শেখরের সন্ধান পেয়েই গেছে, এখন আমার দায়িত্বটা কি ?

অফিসের কতগুলো কাজ নিয়ে চলে গেলাম প্রেসে। বেরুবার মুখে রিসেপশানিস্ট মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, মিস নাওমি, ছুটি নিয়ে দু'দিন কি করলে ?

মেয়েটা মুচকি হেসে ডান হাত তুলে মধ্যমায় একটা মুক্তো বসানো আংটি দেখালো। আমি বললুম, ও, এনগেজমেন্ট হয়ে গেল বুঝি ? ইস্, বড় দুঃখ পেলাম। ভেবেছিলাম, আমারও একটা চান্স আছে। কংগ্রাটস, এনি ওয়ে।

মেয়েটা হাসি বজায় রেখে বললো, ইউ আর এ ডিয়ার।

খুব মনোযোগ দিয়ে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করলাম প্রেসে। এক একটা লাইন কম্পোজ করিয়ে আনার পর, ঠোঁট উল্টে বললাম, উঁহু এ ফেসটা বাজে ! এটা বদলে এখানে ডবল গ্রেট কম্প্রেসড দিন। আপনাদের আটচল্লিশ পয়েন্টের টাইপ নেই কেন ? নতুন টাইপ আনান, খালি সেই একঘেয়ে পুরোনো দিয়ে—। আহ্ চাইলাম একটা হেয়ার রুল, দিলেন একটা ধ্যাবড়া লাইন ! এ রকম করলে কাজ হয় ! ছবিটা কাট আউট করে ম্যাপের ওপর বসান। এইটুকু কাজে আবার দু'ঘণ্টা লাগাবেন না যেন ?

মাঝে মাঝে এই রকম রুক্ষ গলায় কথা বলা দরকার, যাতে ওরা মনে করে, আমি খুব একটা কাজ জানি। নইলে ওরা বাধ্য থাকবে না, ভাববে আমি শুধু কোম্পানির মালিকের শালা বলেই চাকরি বজায় রেখেছি। তা হলে শুনিয়ে শুনিয়ে আড়াল থেকে টিটকিরি দেবে। আমি ওদের মধ্যে এসে মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে বসে থাকি, ভাবখানা এই, যে-কোনো মুহূর্তে ওদের কাজের ভুল ধরে চাকরি খেয়ে দিতে পারি। যদি একবার বুঝে ফেলে, আমি ওদেরই মতন সাধারণ, তাহলে আর নিষ্কৃতি নেই। আর টিকতে দেবে না। হুকুম কিংবা ধমক এই হচ্ছে সব চাকরির মূলমন্ত্র, বেশ জেনে গেছি এখন।

প্রেস থেকে হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা রুমাল কিনে ফেললাম। বেশ বড় সাদা চওড়া রুমাল। রুমালটা দিয়ে একবার ভালো করে মুখ মুছতেই রুমালটা ময়লা হয়ে গেল। মুখে এত ময়লা আসে কোথে কে ? আয়নায় যখন দেখি, তখন তো বেশ পরিষ্কার মুখ। রুমালটায়

এমন ছাবড়া ছাবড়া ময়লা ভরে গেল যে ইচ্ছে হলো ফেলে দিই ওটাকে। ময়লা রুমাল পকেটে রাখতে গা ঘিনঘিন করে। অনেকে তো রুমালে সিক্নি মুড়ে সেটাও পকেটে রেখে দেয়। ভাবলে বমি এসে যায়। যাক গে, এ রুমালটার উল্টো পিঠটা আজ অন্তত আর একবার ব্যবহার করা যাবে। আর একবার তো মুখ মুছতে হবেই!

আরও ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে আমার হাতে। এর মধ্যে কোনো সিনেমাও দেখা যায় না। আমি একটা ভালো রেস্টুরেন্টে ঢুকে বেশ আরাম করে চা খেতে লাগলুম। চায়ের পর কিছুক্ষণ সিগারেট ধরিয়ে একা বসে থাকতে চমৎকার লাগলো। অনেকদিন এমন ভালো লাগে নি। সন্ধেবেলা একা থাকার মতন দুঃখের সত্যিই আর কিছু নেই। আমি সুবিমলের কথা বুঝি। যারা বিকেলে টিউশানি করে না কিংবা পার্টটাইম প্রেম করে না, যাদের বাড়ির সামনে এমন জমি নেই যে বিকেলে গিয়ে বাগান করবে—বাড়িতে পুরো একটা ঘরই নেই নিজস্ব—সেই সমস্ত লোক বিকেলটা কি করে কাটায় ? খেলাধুলো ? কলকাতায় খেলাধুলো তো একটা সাঙ্ঘাতিক জিনিস! কলকাতায় খেলাধুলো করতে গেলেই খেলোয়াড় হতে হয়। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন যারা খেলে—তারা সবাই স্পোর্টসম্যান হতে চায়, নিছক সময় কাটাবার জন্য এখানে কেউ খেলাধুলো করে না, খেলাধুলো ঐ জন্যই বিচ্ছিরি। সময় কাটাবার একমাত্র খেলা হচ্ছে তাস, তাস খেলতে খেলতেও অনেকে আবার খেলোয়াড় হয়ে গিয়ে কম্পিটিশনে নাম দিতে চায়। কমপিটিশনে নাম না দিলে এমনি তাস খেলা একঘেয়ে হয়ে আসে, তখন হয় পয়সা দিয়ে খেলা! পয়সা দিয়ে ফিস কিংবা তিন তাস। বুড়ো না হলে ব্রিজ জমে না, বড্ড মারামারি হয়। অর্থাৎ জুয়া। জুয়ার সঙ্গে মদ। মদের পর আবার ... ওরেব্ বাবা! চললো এরপর—

কিন্তু ইচ্ছে করে একা থাকার একটা আরাম আছে। আমি তো অনায়াসেই সুবিমল-অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে হৈ-হল্লা শুরু করে দিতে পারতুম। না গিয়ে, পার্ক স্ট্রিটের দোকানে চায়ের পর একা বসে সিগারেট টানতে বেশ ভালো লাগছে। আজকের সন্ধেটা কিছুটা ভারি ও অবসন্ন। পূর্ণ বিকেলের আগে থেকেই আবছা অন্ধকার হয়ে আছে। এখন আমি ইচ্ছে করলে যা খুশি করতে পারি, এমন কি আর্ট একজিবিশান দেখতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব নয়।

সত্যি সত্যি একটা একজিবিশানেই আমি ঢুকে পড়লুম। দাড়িঅলা লম্বা যে ছেলেটির মুখে তেলতেলে হাসি, ও-ই নিশ্চয়ই আর্টিস্ট। গোটা পঁচিশেক ফ্রেম, কিন্তু ছবি নেই, ফ্রেমের মধ্যে রেখা আর রং। এর মধ্যে সেই সর্বজনীন নারী-সৌন্দর্য খুঁজে পাচ্ছি না। যার যার মধ্যে নারী-সৌন্দর্য পাই না, তা আমার সত্যিকারের সুন্দর মনে হয় না। এইজন্যই এত অসংখ্য সুন্দরী নারীকেই সুন্দরী মনে হলো না! একজন একটা স্যুভেনির বিক্রি করতে এলো, এক টাকা দাম। সময় কাটাতে এসেছি, তার জন্য আবার একটা টাকা খরচ কিসের ? না, না, ছবির নাম দেখার আমার দরকার নেই!

যারা দেখতে এসেছে, তাদেরও তো অনেকেরই চেহারা আর্টিস্টের মতন। অর্থাৎ হুড়োকুড়ো মাথা, রুখু দাড়ি, কাঁধে ঝোলা। এদের সঙ্গে অনেক যুবতী মেয়েও আছে। আর্টিস্টদের কাছে অনেক ধনী ঘরের যুবতী দুলালীরাও আসে দেখছি, এই বাংলাদেশেও। কিসের লোভে আসে ? বোধহয় মেয়েদের একটা ক্ষীণ ধারণা আছে যে, আর্টিস্টরাই একমাত্র মেয়েদের রূপের সত্যিকারের মর্ম বুঝতে পারে। মেয়েদের ক্ষণিক রূপকে শাশ্বত করতে পারে একমাত্র আর্টিস্টরাই। যে রূপ চামড়াকে ভর করে আছে, তা দেয়ালে বা পাথরে বা ক্যানভাসে কালজয়ী হয়ে থাকবে। সে গুড়ে বালি ! আর্টিস্টদের কি আর সেদিন আছে ? এখন নগ্ন মেয়েকে মডেল করে সামনে বসিয়ে রেখেও রং আর রেখা নিয়ে হিজিবিজি কাটাকুটি খেলবে। কম্পোজিশান না কি মাথামুণ্ড!

— সুনীল, তুই একা এসেছিস ?

আমি ভূত দেখার মত চমকে উঠলুম। এখানেও চেনা লোকের হাতে ধরা পড়তে হবে ? ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলুম পরীক্ষিৎ, নূরুল আর একটা অ্যামিরিকান ছোকরা। এরও মুখে দাড়ি, ময়লা পোশাক, কাঁধে ঝোলা। নূরুল বললো, আপনার সঙ্গে শেখরবাবুর দেখা হয়েছে ? উনি তো আপনাকে খুব খুঁজছেন।

আমি মুহূর্তে দ্বিধা না করে বললুম, হ্যাঁ, দেখা হয়েছে।

পরীক্ষিৎ বললো, কখন দেখা হলো ?

— এই তো, আজকেই বিকেল চারটের সময়।

পরীক্ষিৎ গাল কুঁচকে হেসে বললো, শেখরটা কি কাণ্ড করেছে দেখেছিস তো ? ক্ষেপে গেছে একেবারে।

আমি বললুম, সত্যিই! শেখর একেবারে বেপরোয়া! এখানে বাথরুমটা কোথায় রে!

— জানি না। সেদিন তোরা বারীনদার সঙ্গে মারামারি করেছিস কেন ? তোকে নাকি বেধড়ক পেঁদিয়েছে!

— ভাগ! আমি অবিনাশ আর বারীনদার মারামারি ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিলুম ...

— যাকগে। তোর ওপর বারীনদার কোনো রাগ নেই। আজ তুই হঠাৎ এখানে একা এসেছিস যে ?

— যে এই ছবিগুলো এঁকেছে, সে হচ্ছে আমার ছোড়দির দেওর। আসতে বলেছিল অনেক করে। চল, তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

— না, থাক, আলাপ করার দরকার নেই। আমরা এখানে এলুম এই সাহেবটার জন্য। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, মিট আওয়ার ফ্রেন্ড স্যান্ডি গ্রোভার। এ ছেলেটা নিজেও একজন আর্টিস্ট, বুঝলি ? শেখরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে প্রথমে।

আমি হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়েছিলুম, ছেলেটা নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করলো। আমি বললুম, গ্ল্যাড টু মিট ইউ। ছেলেটা গম্ভীর গলায় বললো, নমস্কার।

ও, এর মধ্যেই দু'একটা বাংলা শিখে নেওয়া হয়েছে! এরপর প্যান্টালুন ছেড়ে পাজামা ধরবে, বাঁ হাত দিয়ে ভাত খাবে, জানি জানি, ওসব ঢের জানি!

পরীক্ষিৎ বললো, চল, শেখরের কাছে যাবি তো ? স্যান্ডিও যাবে আমাদের সঙ্গে।

আমি প্রফুল্ল মুখে বললুম, কোথায় ? পাঁচ নম্বর বাড়িতে ? আমি যাবো চল, আমার কিছু করার নেই এখন। একটু দাঁড়া, আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। তোরা ততক্ষণ ছবিগুলো দ্যাখ—

হলঘর থেকে বেরিয়ে আমি একটুও দেরি না করে বিদ্যুৎগতিতে সোজা চলে এলাম পার্ক স্ট্রিটে। একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সি থামিয়ে চড়ে বসলাম।

এখনও সময় হয় নি। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে আমি গাছটার নিচে একটু দাঁড়ালাম। মেয়েরা কেউ এখনো আসে নি। এখন রাস্তায় লোকজন কম নেই, তবু রাস্তাটা কেমন নীরস। যেই গানের ইস্কুল ছুটি হবে, অমনি রাস্তাটা আলো হয়ে উঠবে। মনে হয় যেন, এই বিশাল গাছটা, দু'পাশের বাড়িগুলো আমারই মতন সেই সময়ের প্রতীক্ষায় আছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা বেরিয়ে এলো কলবল করে। অন্য কোনো মেয়ের দিকে আমার চোখ পড়লো না, আজ আমি প্রথমেই যমুনাকে দেখতে পেলাম। আজ একটু বেশি সাজ করে এসেছে, মাথার চুল চূড়া করে বাঁধা, হাতকাটা ব্লাউজ, কচি কলাপাতা রঙের শাড়িটা নিশ্চিত খুব দামি। বেশি সাজে ওর সৌন্দর্য কিছু বৃদ্ধি পায় নি। সৌন্দর্য যার থাকে, তার আর বাড়ে-কমে না, সুন্দরী নারীর মুখে ব্রনো হলেও তা সুন্দর।

আমি স্থির চোখে তাকিয়ে রইলুম, কখন আমার দিকে যমুনার চোখ পড়ে। মেয়েরা সবাই মিলে এক সঙ্গে কথা বলে, তবু কে কি কথা অন্যকে শোনাতে চায় কে জানে। ঐ মেয়ে দঙ্গলের মিষ্টি গলার রিনরিনে কোলাহলে রাস্তার সব লোক ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যাচ্ছে। যমুনা দল ছেড়ে তাড়াতাড়িই এগিয়ে এলো বাস স্টপের দিকে, এবং ও নিজেই আমাকে প্রথম দেখতে পেলো।— আপনি ? আপনি কখন এসেছেন ?

— এইমাত্র। বাসে চড়ে যাচ্ছিলুম, তোমাকে দেখে নেমে পড়ে দাঁড়িয়ে আছি।

— আপনি সেদিন এলেন না ?

— কোন্‌দিন ?

— যেদিন দেখা হলো, তারপরের গানের ক্লাশের দিন ?

— আমি তো সেদিনই আসবো বলি নি।

— আপনি বললেন, আপনি পরের দিন আসবেন, আমি দাঁড়িয়ে রইলুম আপনার জন্য!

— পরের দিনই তো বলি নি। বলেছিলুম, পরে আর একদিন আসবো। তুমি সত্যিই আমার জন্য দাঁড়িয়েছিলে ?

— হ্যাঁ, অনেকক্ষণ। আমার কি রকম যেন মনে হয়েছিল, আপনি সেদিন আসবেন!

যমুনা আমার জন্য দাঁড়িয়েছিল— একথা শুনে শরীরটা হঠাৎ জলের মতন নরম হয়ে গেল। ঐটুকু একটা কচি বাচ্চা মেয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল, শুনেই বুকের মধ্যে একটা ঝাঁকি লাগলো। কি সুন্দর জড়তাহীন পরিষ্কার কণ্ঠ, বললো, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম! এরকম পরিষ্কার সত্য তো আমি নিজে বলতে পারি না। কেউ পারে না; আর কারুর মুখে শুনি নি। যমুনা ছাড়া পৃথিবীর আর সকলেরই বয়েস বেড়ে গেছে।

আমি বললুম, যমুনা, সত্যিই সেদিন আমার আসার ইচ্ছে ছিল। তোমাকে সেদিন হঠাৎ দেখার পর আমার মনটা এত ভালো লাগছে যে রোজই আমার ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আমরা দু'জনে এখন থেকে বন্ধুত্ব পাতালুম, অ্যাঁ ? কেমন ? সেদিন আসতে পারি নি, তার আগের দিন আমার দাদামশাই মারা গেলেন তো, সেইজন্যই।

— ও, তাই বুঝি ? আপনি তবে চামড়ার জুতো পরেছেন কেন ? আপনার অশৌচ না ?

— দাদামশাই মারা গেলে মাত্র তিনদিন অশৌচ হয়। পার হয়ে গেছে! চলো, তোমাতে আমাতে আজ খুব আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি পর্যন্ত যাই। যেতে যেতে অনেক গল্প করবো।

— কিন্তু আজ তো হবে না, আজ দেরি হয়ে যাবে যে!

— কত আর দেরি হবে ?

— না, আজ যে বাড়িসুদ্ধু সবাই নাইট শো'তে সিনেমায় যাচ্ছি। গিয়েই খেয়ে-দেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। মা বলেছিল, আজ গানের ইস্কুলে আসতে হবে না। কিন্তু আমার যে সামনের মাসে গানের পরীক্ষা।

— ভাগ্যিস এসেছিলে তাই দেখা হলো তোমার সঙ্গে।

— বাঃ, আপনি বুঝি বাড়িতে আসতে পারেন না ? মাকে সেদিন বলেছিলুম আপনার কথা। মা বললো, আবার দেখা হলে আপনাকে একদিন জোর করে বাড়িতে ধরে আনতে। দিদিও বললো আপনাকে নিয়ে যেতে। দিদি জিজ্ঞেস করছিল, দিদিকে আপনার মনে আছে ?

আমি বললুম, তোমার দিদির নাম সরস্বতী তো ? মনে থাকবে না কেন ?

সরস্বতীর মুখটা মনে পড়ে আমার একটু অস্বস্তি লাগলো। এ হচ্ছে সেই ধরনের মুখ যারা নিজেদের সুখ চেয়ে অপরকে কখনো সুখী হতে দেয় না। সরস্বতীকে আমার কখনো তেমন

ভালো লাগে নি। যমুনার দিদি হিসেবে ওকে মানায় না।

যমুনা বললো, আজ চলুন না!

— আজ গিয়ে কি করবো ? আজ তো তোমরা সবাই সিনেমায় যাচ্ছো।

— ও, হ্যাঁ! তাহলে বাড়িতে কবে আসবেন ?

— তোমার গানের ইস্কুল তো আবার পরশু দিন, না ?

— হ্যাঁ। সাড়ে ছ'টা থেকে আটটা। ঐ যে বাস আসছে—

— চলো, আমিও তোমার সঙ্গে বাসে উঠে পড়ি। আমি ঐ দিকেই যাবো।

— আসুন, শিগগির আসুন। যা ভিড়!

সত্যি বাসে বিষম ভিড়। সবসময় যে কেন একদল লোক বাসে উঠে জায়গা দখল করে বসে থাকে বুঝি না। এত ঘোরাঘুরির কি দরকার মানুষের ? অনবরত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় না গেলে বুঝি চলে না ? বাসের ভিড়ের লোকদের দেখে আমার গা জ্বলে গেল। যমুনা কিন্তু ভিড় ঠেলে বেশ তরতর করে উঠে পড়লো। আমি ওকে বললুম, চলো, দোতলায় চলো। সিঁড়ির লোকেরা যমুনাকে পাশ দিতেই, আমিও সেই ফাঁক দিয়ে উঠে গেলুম। সতর্ক ছিলুম, একটা লোকও যদি অসভ্যতা করে যমুনার শরীর ছুঁয়ে দেয়, তবে আমার পেরেক বসানো জুতো দিয়ে তার পা মাড়িয়ে দেবো। দোতলাতেও বসার জায়গা নেই, লেডিজ সিটে একটি মেয়ের পাশে একটি যুবক বসেছিল। যমুনাকে দেখে সে সিট ছেড়ে উঠে আমারই পাশে দাঁড়ালো। আমরা দু'জনেই দু'জনের দিকে বিরক্তভাবে তাকালাম। যমুনার পিঠের কাছে সিটের মাথায় আমার হাত।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে যমুনা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি নামবেন না ?

আমি বললুম, না। তুমি নেমে পড়ো। আবার দেখা হবে।

— আসবেন কিন্তু, ঠিক!

তৎক্ষণাৎ একটা পুরো সিট খালি হতেই আমি বসে পড়ে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। যমুনা ছোট লাফ দিয়ে নেমে খানিকটা দৌড়ে গেল। তারপর তাকালো ওপর দিকে। আমাকে দেখতে পেয়ে ফুল ফোটার মতো হাসলো। আমি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাসি ও হাতছানি পাঠিয়ে দিলাম ওর দিকে।

তারপর মনে হলো, এ বাসে আমি অনেকক্ষণ বসে থাকবো। সত্যিই তাই রইলুম। বাস ডিপোতে এসে থামার পরও আমি চুপ করে বসে রইলুম দোতলার জানালায়। সিগারেট ধরিয়ে টানলেও এখন কেউ আপত্তি করবে না। তারপর যখন আবার বাস ছাড়লো, তখন আমার খানিকটা ঘুমের মতন এসে গেছে। খানিকটা তন্দ্রার মধ্যেই বসে থাকা, দীর্ঘযাত্রার পর, বাস থেকে নেমে আমি সোজা বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি ঢোকার মুখে কি সুন্দর একটা নিঃশ্বাস পড়লো আমার।

টেলিফোনটা বড় জামাইবাবুর ঘরে, সেইজন্য বন্ধু–বান্ধবদের বলে দিয়েছিলাম, সন্ধের পর কেউ যেন বাড়িতে আমাকে টেলিফোন না করে। ওখানে টেলিফোনে কথা বলার খুব অসুবিধে। যেসব দিন পার্টি বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে, সেসব দিনে বড় জামাইবাবু সন্ধেবেলাতেই বাড়ি চলে আসেন, নিজের ঘরে বসেই কাজকর্ম করেন অফিসের। পাবলিসিটি লাইনের মানুষ, সারা বছর ধরেই বহু পার্টিতে যেতে হয়, সুতরাং মদ খাওয়াটা ওঁর অভ্যেস হয়ে গেছে। নিজের ঘরেই বোতল রাখা থাকে, কাজ করার সময় সন্ধেবেলা অল্প অল্প রোজই খান। বড়দির কড়া হুকুম আছে, বাড়ির কারুর এই সময়ে ওঁকে বিরক্ত করতে যাওয়া বারণ।

রাত্তির সাড়ে এগারোটা আন্দাজ বড়দি আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললো, ঘুমিয়েছিস

না কি ? তোকে কে যেন টেলিফোনে ডাকছে!

আমি সারা খাটময় ছড়ানো কাগজপত্র ফেলেই উঠে এলাম। এখন কে আবার টেলিফোন করছে ? বড় জামাইবাবুকে এ সময় বিরক্ত করতে সত্যি আমার লজ্জা করে। বড় জামাইবাবু অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বিছানার ওপর এক হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে আছেন, কাজ করার সময় কোনো কিছু চিন্তা করতে করতেই যেন গাঢ় ঘুম এসে গেছে। টেবিল থেকে বোতল-গ্লাস সবই বড়দি সরিয়ে ফেলেছে অবশ্য, কিন্তু ঘরে হালকা রামের গন্ধ। আমি টেলিফোন তুলে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, হ্যালো ? কে ?

ঠিক বহরমপুরের ছেলেবেলায় জানালা দিয়ে খুব ভোরে এসে শেখর যেমন ফিসফিসিয়ে ডাকতো, সেই রকম গলায় বললো, এই সুনীল, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কি করছিস ? তুই এখানে এলি না ?

বেশ কয়েকদিন পর শেখরের গলার আওয়াজ শুনলুম। নতুন কিছু একটা রহস্য পেয়ে খুব মেতে উঠেছে মনে হয়। একটু বিরক্তই বোধ করলুম আমি। চকিতে তাকিয়ে দেখে নিলাম, বড়দি ঘরে নেই, জামাইবাবু সত্যিই ঘুমন্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ? কোথায় আছিস তুই ?

— পাঁচ নম্বর বাড়িতে। বীণার কাছে। খুব জমে উঠেছে, চলে আয় এক্ষুনি!

— এখন ? না—

— ধুৎ! চলে আয় না। এমন জিনিস দেখবি, ভাবতেই পারবি না। তোর অফিসে খবর দিয়ে রেখেছিলুম, পাস নি ?

— পেয়েছিলাম। কিন্তু একটু বিশেষ কাজ ছিল।

— এখানে অনেকে আছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে টুক করে চলে আয় না—

— আমার বিষম মাথার যন্ত্রণা করছে। জ্বর উঠেছে প্রায় একশো তিন ডিগ্রি।

— তুই সন্ধেবেলা পরীক্ষিৎকে ধাপ্পা দিয়ে কেটে পড়লি কেন ?

— ঐ তো বললাম, শরীর খারাপ লাগছিল। জ্বর আসছিল তখন।

— তুই চলে আয়, দেখবি এমন জিনিস দেবো, এক মিনিটে জ্বর সেরে যাবে। কথা দিচ্ছি, বিশ্বাস কর, একবার এসেই দ্যাখ।

— শেখর, কেন বিরক্ত করছিস ? বলছি তো যাবো না।

— দাঁড়া, দাঁড়া, লাইন ছাড়িস নি। কাল অফিসের পরই সোজা চলে আয় তবে—

— আচ্ছা যাবো।

— ঠিক আসিস। এখানে নূরজাহান এসেছে। অদ্ভুত ইন্টারেস্টিং ব্যাপার—

— কে নূরজাহান ?

— তোর মনে নেই ? বীণার দিদি নূরজাহান ? ক'দিন ধরে আমি শুধু তার কান্না দেখছি। সুন্দরী মেয়ের কান্না দেখতে কি ভালো যে লাগে...

— আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি, আমি এখন ছেড়ে দিচ্ছি লাইন!

— আজ তুই এলি না, ইস! কাল ঠিক আসবি তো ? তোকে খুব দরকার। কাল বিকেলে তোর অফিসে টেলিফোন করবো—

— বাড়ি থেকে লুকিয়ে, অন্য জায়গায় রাত কাটিয়ে কি ছেলেমানুষি করছিস তুই ?

শেখরের হাসির আওয়াজ শুনতে পেলাম; কি রকম যেন লুকানো হাসি। বললো, ছেলেমানুষি নয়, তুই এলে বুঝতে পারবি।

— আচ্ছা, এখন ছেড়ে দিচ্ছি!

— কাল কিন্তু ঠিক—

সেদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমি নানান দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম। আবছা আবছা অস্পষ্ট ঘুম বারবার ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্নে, আমি বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুচ্ছি, তখন আবার আর একটা স্বপ্ন, পূর্ব বাংলার গ্রামের যে বিশাল বটগাছটায় তক্ষক ডাকতো—সেটাতে দড়ি বেঁধে কে যেন আত্মহত্যা করেছে...মনীষা হাসতে হাসতে শেখরের তাস ছুঁয়ে দিল, আমি অরুণকে বললুম, সত্যি কোনো পাগলা গারদেই সিট পাওয়া যাচ্ছে না, মনীষাকে নিয়ে তো খুব মুশকিল হলো; অরুণ চিন্তিতভাবে বললো, ভাবছি, ওকে আন্দামানে পাঠাবো...বারীনদা একটা লোহার ডাণ্ডা ঘুরিয়ে মারলো আমার মাথায়, আমার মাথার ঘিলু ফেটে ছলাৎ করে অবিনাশের গায় পড়তেই অবিনাশ বললো, তুই কিছু ভাবিস না, আমি বারীনকে এমন শিক্ষা দেবো...যতবার দরজার ছিটকিনি দিতে যাচ্ছি, ছিটকিনিটা আলগা হয়ে টং টং করে পড়ে যাচ্ছে, বাইরে থেকে কারা যেন বিষম জোরে দরজা ঠেলছে, আমি প্রাণপণে দরজাটা চেপে ধরে আছি আর পারবো না—এক্ষুনি ওরা ঢুকে পড়বে...তাপস বললো, জানিস, ছায়ার বড্ড মন খারাপ। ওর গায়ের শ্বেতির দাগ ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে, ওর ধারণা ওর ছোঁয়া লেগে আমারও শ্বেতি হবে...আমি দেখলুম একটা পিওন চিঠি দিতে আসছে, তার গায়ে দাগড়া দাগড়া শ্বেতি, চিঠি দিতে যখন হাত বাড়ালো, হাতখানা কুষ্ঠে গলে গেছে, সেই হাতে চিঠিখানা ধরা, আমি বললুম, ও চিঠি চাই না, গম্ভীর গমগমে গলায় সে বললো, চিঠি না পড়ে ফেরত দেবার নিয়ম নেই। চিঠিখানা ছুঁড়ে দিতেই সেটা উড়তে লাগলো...

দূর ছাই, যতসব বাজে বাজে স্বপ্ন! বিছানা থেকে উঠে আমি ঢকঁঢক করে খানিকটা জল খেলাম। জলের স্বাদ এখন তেমন ভালো না। রাত্তিরে প্রচুর মদ খেলে সকালবেলা জলের স্বাদ যে-রকম মিষ্টি হয়, সে রকম আর কখনো না। যারা জীবনে কখনো মদ খায় নি, তারা জলের সত্যিকারের স্বাদ জানতেই পারলো না। অর্ধেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে উঠে একবার আলো জ্বাললে, শুনেছি স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়। যাকগে, স্বপ্ন বন্ধ করার দরকার নেই। বাবা আর মা দুপুরে চলে গেছেন বহরমপুর। বাবার খাটটা এখনো আমার ঘরে পাতা রয়েছে। আমি অন্ধকারেই নিজের খাট ছেড়ে বাবার খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শয্যা বদলে দেখা যাক। ঐ সব ভূতুড়ে স্বপ্নের বদলে যমুনাকে নিয়ে একটা ছোট্ট মিষ্টি স্বপ্ন দেখা যায় না ? আমি চোখ বুজে, যমুনার হালকা মুখখানা অন্ধকারে ভাসিয়ে রেখে সেই রকম একটা স্বপ্নকে আহ্বান জানাতে লাগলুম! কোনো স্বপ্নই নেই আর, বাকি রাতটা গভীর ঘুম।

ঘুম থেকে উঠেই আমার প্রধান চিন্তা হলো, শেখরকে কি করে এড়ানো যায়। শেখর আর আমি এক সঙ্গে জীবন শুরু করেছিলুম, কিন্তু সারাজীবন এক সঙ্গে চলতে হবে তার কোনো মানে নেই। আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, কিংবা আমার বিতৃষ্ণা এসেছে, শেখরের মতন নতুন নতুন রোমাঞ্চ খোঁজার ইচ্ছে আর আমার নেই। আসলে কোথাও রোমাঞ্চ নেই, সত্যিকারের অবাক হতে তো ভুলেই গেছি, ইলেকট্রিকের আলো জ্বললেই পেত্নী যেমন হঠাৎ বেলগাছ হয়ে যায়, তেমনি মানুষের দিকে একটু খরচোখে তাকালেই তার ভানগুলো খুলে পড়ে, প্রত্যেকটি মানুষ লজ্জিতভাবে বলে ফেলে, হ্যাঁ, আমিও তোমারই মতন। অন্য মানুষরাও যে আমারই মতন এটা জেনে আমার তেমন লাভ নেই, আমিও যে অন্য মানুষের কাছাকাছি আসতে পেরেছি, এটাতে কিছুটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। তাহলে আর আত্মরক্ষার তেমন প্রয়োজন নেই, এবার মাটির ওপব

স্থির হয়ে দাঁড়ানো যেতে পারে। বেড়ালকে মাটি থেকে উঁচু করে তুললেই আপনি তার সব ক'টা লুকোনো নখ বেরিয়ে পড়ে, আমিও, একেই অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে, তার ওপর বাঙাল ও রিফিউজি, বাস্তুভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই নখ খুলে তৈরি হয়েছিলাম। এই শহর বিশাল, কিন্তু তাতে কি আসে যায়, নিজের চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী কুকুরের সামনে এসেও কি বেড়াল ফোঁস করে রুখে দাঁড়ায় না ? তারপর দেখলুম, এ শহরটা একেবারে ন্যালাখেপা, এর কোনো মাথার ঠিক নেই। নজরুল ইসলামের মতন এই কলকাতা শহর—নিজের বিপদ বা গৌরব সম্পর্কে উদাসীন। এখানে আমার কোনো বিপদ নেই, এখানে সমস্যা হলো নিজের ঠিকমতো জায়গা খুঁজে নেওয়া। শেখরের সে সমস্যা নয়, শেখরের দরকার নিজের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা, বেরিয়ে কোথায় যাবে, সেইটা খুঁজছে। আর, আমি এসেছিই বাইরে থেকে, আমি এখন নিজেকে ঠিক কোন জায়গায় বসাবো, তাই দেখছি। এইজন্য সরেজমিন তদন্ত করা আমার এত প্রয়োজন ছিল।

এখন, শেখরের কাছ থেকে পালানো তেমন সহজ নয়। সন্ধেবেলা যেখানেই যাই, ঠিক খুঁজে বার করবে। শেখর না হোক, সুবিমল কিংবা তাপস বা পরীক্ষিৎ। আমি ধরা পড়তে রাজি নই। কিন্তু যাবোই বা কোথায় ? আর যাই হোক, আমি তো আর লুকিয়ে একা গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে থাকতে পারি না। চিনে বাদামওয়ালারা পর্যন্ত আমাকে দেখে হাসবে। সুবিমল আসবার আগেই আড়াইটে আন্দাজ প্রেসে যাবার নাম করে অফিস থেকে বেরুলাম। বেরিয়ে সোজা ঢুকে গেলাম একটা সিনেমায়। মনে মনে এই রকম একটা যুক্তি তৈরি করে নিলাম যে, ইনগ্রিড বার্গমানের ছবি আমি একটাও বাদ দিই নি, সুতরাং আজ এ ছবিটার শেষদিন, না দেখার কোনো মানে হয় না, একাই দেখা যাক। একা এসে সিনেমা দেখা এমন কি অপরাধ ? সুবিমল সিনেমা দেখতে ভালবাসে না, ওকে বললেও আসতো না, শুধু শুধু আমাকে আটকে দিতো। অবশ্য সুবিমল আজ অফিসে না-ও আসতে পারতো, শুনলাম কালও আসে নি।

সিনেমা হলে বসেই মনস্থির করলুম, সন্ধেবেলা যমুনাদের বাড়িতে যাবো। আজ গানের ইস্কুল বন্ধ, আজ বাড়ি না গিয়ে যমুনার সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই। অন্য যতগুলো জায়গায় যাবার কথা ভেবেছি, সব ছাপিয়ে শুধু যমুনার কথাই মনে পড়েছে। আগে ভেবেছিলাম, খবরের কাগজের অফিস গিয়ে শশাঙ্কর সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায়, কিন্তু তাও তো বেশিক্ষণ নয়, একটু পরেই শশাঙ্ক বলবে, তুই আধঘণ্টা বোস, আমি হাতের কপিটা শেষ করে আসি। রঞ্জনদের ক্লাবে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু হয় সেখানে নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে, অথবা তাস খেলা নিশ্চিত। তাসের নাম শুনলে আজকাল গা জ্বলে যায়। বিমলেন্দুর বাড়িতেও একটা ছোটখাটো আড্ডা বসে। বিমলেন্দু মদ খায় না, যারা মদ খায়, তাদের ও ঘৃণা করে। বিমলেন্দু ফ্রেঞ্চ শেখে—একই কথা! তুমি ফ্রেঞ্চ শেখো বলে আমি তো তোমাকে ঘেন্না করি না, আমি মদ খাই বলে তুমি আমায় ঘেন্না করার কে হে ? আমি যেদিন কিছুই খাই নি, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন সেদিনও বিমলেন্দুর সঙ্গে দেখা হলে আমাকে মদ খাওয়ার অপকারিতা বিষয়ে লেকচার দেবে! আমি ফরাসি ভাষার রস বুঝি না—তাই তার নিন্দে করতেও যাই না, তুমিও মদের মর্ম না বুঝে তার নিন্দে করতে যাও কোন বুদ্ধিতে ? বোকারাম একটি! মদকে ঘেন্না করে ফরাসি ভাষা শিখছে, জীবনেও শিখতে পারবে না! ফরাসিরা শুনলে বলবে কি ?

মহীতোষ, বিমান—ওদের ওখানে তো যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওখানে এখন গরম রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমাকে ওরা পছন্দ করে না, আমি নাকি এসকেপিস্ট, আমি নাকি দেশের নানান সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই না। সত্যিই তো তাই, আমি মাথা ঘামাই না। কত লোক খেতে পাচ্ছে না জেনেও আমি দু'বেলা খাবার খাই, দেশের কত লোকের জামা-কাপড় নেই, কিন্তু

আমার জামায় ইস্ত্রি না থাকলে চলে না, ফুটপাথে হাজার লোক শুয়ে আছে দেখেও আমার দোতলার শোবার ঘরের বিছানার চাদর একটু ময়লা হলে পছন্দ হয় না। হ্যাঁ, আমি এগুলো চাই, আমি স্বার্থপর, আমি অপরাধী। আমি একটা নৃশংস, অমানুষ! কত লোককে যে বঞ্চিত করে আমি একা এত আরামে আছি, তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি এর একটাও ছাড়তে পারবো না। মহীতোষ, বিমান ওরা বেশ সুখী, কারণ ওরা দেশের সমস্যাগুলো আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পায়, আলাদা আলাদাভাবে সেগুলো সমাধানেরও যুক্তি খোঁজে। আমি খুব ভালোভাবে জেনে গেছি, যুক্তি দিয়ে কেউ কখনো কোনো স্থাবর জিনিসকে বদলাতে পারে নি। যদি কখনো যুদ্ধ কিংবা রাষ্ট্রবিপ্লব বাধে—আমি সব টান মেরে ফেলে দিয়ে রাস্তায় ছুটে গিয়ে বন্দুক হাতে নেবো। আমার একথা শুনলে ওরা হাসে। আমার এসব রোমান্টিক ধারণা? কিন্তু রোমান্টিকরা ছাড়া কে কবে ইতিহাস বদলেছে? আস্তে আস্তে দেশের অবস্থা বদলানো—আমি বাবা ওর মধ্যে নেই! আমি মরে গেলে তারপর কবে দেশের উন্নতি হবে—সে উন্নতির চেষ্টার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ভবিষ্যৎযুগকে খুশি করার জন্য, আমি নিজে এখন কোনোরকম স্বার্থত্যাগ করতে রাজি নই। সাফ কথা! আমাকে তোমরা যা ইচ্ছে ভাবো না! এই গোটা জেনারেশান না খেয়ে, হাড় ডিগডিগে হয়ে, ক্ষইয়ে, গলিয়ে, পচে গিয়ে বেঁচে থেকে, এই রকমই আর একদল পচা-গলা বংশধর রেখে যাবে—তারপর দেশের উন্নতি? আমি নেই, আমি নেই, আমি স্বার্থপর, আমি যতদিন বাঁচবো, সুস্থভাবে পুরোপুরি বাঁচতে চাই। আমি একমাত্র প্রাণ দিতে রাজি আছি যুদ্ধে। যুদ্ধে মরলে কোনো কষ্ট হয় না, খুব নরম, হালকাভাবে মরা যায়, কারণ সেটা রোমান্টিক মৃত্যু। ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থমাকে বলেছিল, আমাকে গলা টিপে দম বন্ধ করে মেরো না আমাকে তলোয়ার দিয়ে মারো, তাহলে আমি স্বর্গে যাবো।

সুতরাং বিকেলে আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। আশ্চর্য, অরুণের বাড়িতে গিয়ে মনীষার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আমার একবারও হলো না। মনীষার নামটা ভাবতেই এক ঝলক মনীষার মুখখানা ভেসে উঠলো। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠা মনীষার সেই মুখ বেশ ফুরফুরে হাসি-হাসি, আমিও হাসিমুখে, কল্পনায় মনীষার দিকে তাকালুম। না, মনীষা সম্পর্কে আমার কোনো দুঃখবোধও নেই। শুধু যমুনার কথাই মনে পড়ছে বারবার, যমুনার কথা ভেবেই একটু একটু দুঃখ পাচ্ছি। যমুনার কথা ভাবতে ভাবতে ওকে দেখার এমন অসম্ভব ইচ্ছে জেগে উঠলো যে, ভাবলুম সিনেমা শেষ না হতেই বেরিয়ে যাই। কিন্তু পুরো অফিসের সময় পার না করেই আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে গেছি— এটা যেন কি রকম। সেইজন্য, সিনেমা শেষ হবার পরও কিছুক্ষণ আমি চা খেয়ে কাটালুম।

যমুনারা আমাদের কি রকম যেন আত্মীয় হয়। কারণ সেজ কাকার বাড়িতে যমুনার মা আর বরুণকে দেখেছি আমি। যমুনাকেও দেখেছি দু'একবার, কিন্তু তখন ও এতো বাচ্চা ছিল যে আমি লক্ষই করি নি। যমুনার দিদি সরস্বতীর সঙ্গেও একবার খানিকটা পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু সরস্বতীকে আমার তেমন ভালো লাগে নি, কি রকম যেন ওর স্বভাব, মনে হতো, ওর গায় হাত দিলেই আমার হাত কেটে যাবে। কাকীমার শ্রাদ্ধের দিন সরস্বতী আমার ঘরে ঢুকে বলেছিল, এই, আমার দু'হাত এঁটো, পিঠের বোতামটা ছিঁড়ে গেল এইমাত্র, চট করে একটা সেফটিপিন আটকে দিন তো! আমি তখন একটা বই পড়ছিলুম, চোখ তুলে দেখি, যে-আমায় পিঠের বোতাম ছেঁড়ায় সেফটিপিন লাগাতে বলছে, সে দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে বুক ফিরিয়ে। মুখোমুখি দাঁড়ালে পিঠে সেফটিফিন লাগাবো কি করে? না কি ও চায় আমি ওকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দেবো? আমি বলেছিলুম, সেফটিপিন আমি কোথায় পাবো? ও বলেছিলো, কি যে করেন, কিছুই থাকে না আপনার কাছে। আমার চুড়িতে আটকানো আছে, খুলে নিন না! তারপর মুচকি হেসে

বলেছিল, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন কি আমার সময় নেই এখন! দিন দিন, চট করে, আমাকে রান্নাঘরে যেতে হবে।—যে মেয়ের বুকে আমি কখনো মাথা রাখি নি, সে কেন আমাকে ব্লাউজের পিঠের বোতাম আটকে দিতে বলবে ? না, ওকথা আমার ভালো লাগে নি।

সরস্বতী আমার কাকাকে মেশোমশাই বলতো, তাহলে ওর মা হচ্ছেন কাকীমার বোন, অর্থাৎ ওরা আমার কোনো আত্মীয় নয়। যমুনার মাকে আমি কখনো কিছু বলে ডাকি নি, আজ কাকীমা বলেই ডাকবো।

— কাকীমা, অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হলো।

— আরেঃ, এসো এসো, চেনাই যায় না এত বদলে গেছো তুমি।

— আপনারা কেমন আছেন ? যমুনার সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হলো হঠাৎ।

— হ্যাঁ, মুন্নি বলছিল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি বললুম, ধরে আনলি না কেন ? একেবারে ভুলেই গেছো আমাদের, না, না, জুতো খুলতে হবে না, আমাদের ঘরের মধ্যে সবাই জুতো পরে আসে, চলে এসো, তোমার মা কেমন আছেন ?

— মা ভালো আছেন! আপনাদের কথা মা প্রায়ই বলেন।

— মাকে নিয়ে এলে না কেন ? জামাইবাবুর সঙ্গেও অনেকদিন দেখা হয় নি।

— হ্যাঁ, সেজ কাকা আজকাল ধর্ম নিয়ে খুব মেতে উঠেছেন।

— তুমি এদিকটায় সরে এসে পাখার নিচে বোসো না। যা গরম আজ! দাঁড়াও আমি সতীকে ডাকি।

আগেকার ভারতবর্ষ, প্রবাসীতে 'আধুনিকা' বলে যে-সব ছবি ছাপা হতো, সেইসব ছবির মেয়েদের কিছুটা বয়েস বাড়লে যে-রকম দেখতে হওয়া উচিত, যমুনার মাকে সেইরকম দেখায়। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, কোঁকড়ানো মাথার চুলে এলো খোঁপা, চওড়া কল্কা পাড় সাদা শাড়ি, শাড়ি পরার ধরনটাও একটু অন্যরকম, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। ঠিক বাড়ির মা-মাসীমাদের মতন চেহারা নয়, আবার উগ্রতাও নেই। দেখতে ভালো লাগে। এ বাড়ির আসবারের মধ্যেও একটা স্নিগ্ধতা আছে। যমুনা কোথায় ? দেওয়ালের একটা বড় ছবিতে যমুনা, এক গা ফুলের গয়না পরা নৃত্য ভঙ্গিমায়, শুধু গান নয়, যমুনা নাচতেও জানে দেখছি। যমুনার ফটোগ্রাফের পাশে যামিনী রায়ের বেড়াল, তার পাশে কাচের জারে মানি-প্ল্যান্ট বাকি দেয়াল জুড়ে। যমুনার বাবা পুলিশে কাজ করেন জানি, অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, আশা করি উনি ঘুষ নেন না। এরকম শান্তিময় সুখী আবহাওয়া থাকতো কি তাহলে বাড়িতে ? যমুনা কি তাহলে অমন নিষ্পাপ সরল হতে পারতো ? যমুনা কোথায় ? বুককেসের ওপর একগাদা পিকচার পোস্টকার্ড, ওগুলো বোধহয় বরুণ আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছে। যমুনা কোথায় ?

সরস্বতী ও যমুনার মা এসে ঢুকলেন! হাতে খাবারের প্লেট ও লেমন স্কোয়াশের সরবৎ। এদের বাড়িতে নিশ্চয়ই রেফ্রিজারেটর আছে। সরস্বতীর মাথায় সিঁদুর নেই, এখনো বিয়ে হয় নি কেন ? যমুনা কোথায় ? আশেপাশের কোনো বাড়িতে খেলতে গেছে ? আমি চেয়ার ছেড়ে সামান্য উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে বললুম, কী, চিনতে পারেন ? সরস্বতী অল্প হেসে বললো, পারবো না কেন ? আপনি চিনতে পারবেন কি না—সেইটাই সন্দেহ ছিল। মুন্নি জোর করে আসতে বলেছে বলেই বুঝি এলেন ?

— না, আমি তো নিজেই এলাম। এদিকে বিশেষ আসা হয় না। আপনি কিন্তু একটু রোগা হয়ে গেছেন।

— ইচ্ছে করেই রোগা হচ্ছি। দেখতে খারাপ লাগছে ?

— না, না। অনেকদিন আপনাকে দেখি নি তো। (যমুনা কোথায় ?)

যমুনার মা হেসে বললেন, তুমি সতীকে আপনি বলতে নাকি ? ও তো তোমার চেয়ে অনেক ছোট।

সরস্বতী বললো, আগে অবশ্য উনি আমাকে তুমিই বলতেন, এখন ভুলে গেছেন সে কথা!

সত্যিই আমি ওকে তুমি বলতাম নাকি ? মনে পড়ে না। কিন্তু যমুনা কোথায় ? পরিষ্কার চারখানা দেয়ালের মধ্যে এই ঘরে বসে, লেমন স্কোয়াশ চুমুক দিতে দিতে এইসব আমড়াগাছি কথাবার্তা বলতে আমি এসেছি নাকি এখানে ? আমি যেন হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম, যমুনাকে দেখছি না ? যমুনা কোথায় ?

যমুনার মা বললেন, যমুনা তো নাটকের রিহার্সাল দিতে গেল। আমার মামাতো-ভাই রণেন একটা নতুন নাটক লিখেছে, তুমি নাম শোনো নি রণেন মৈত্রের ? আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ; নিশ্চয়ই!—কে জানে লোকটা কে!—যমুনার মা বললেন, ওদের ক্লাব থেকে তার অভিনয় হচ্ছে। যমুনাকে দিয়ে ছোট্ট নাচের পার্ট করাবে। তুমি আসবার একটু আগেই তো বেরোলো।

আমার মুখ দৃশ্যত বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি অস্ফুটভাবে বললুম, রিহার্সালে গেছে ?

— কেন, তোমাকে আজ আসতে বলেছিল নাকি ? বলেছিল আজ থাকবে ? কিন্তু ও তো আজ রিহার্সালের কথা জানতো।

আমি সামলে নিয়ে উত্তর দিলুম, না না, আমাকে সে-কথা বলে নি। যমুনা নাচ-গান দুটোই বেশ ভালোই শিখেছে বুঝি ? কি পড়ছে এখন ?

—প্রি-ইউনির্ভাসিটি পাশ করে, এ বছর ফার্স্ট ইয়ার আর্টসে ভর্তি হয়েছে ব্রেবোর্ন কলেজে। নাচ তো বেশ ভালোই শিখেছে। ঐ যে ছবিটা দেখছো, ওটা তো অল বেঙ্গল কনফারেন্সের। আরও অনেক ছবি আছে, সতী, অ্যালবামটা দেখা না—

আর কিছু আমার ভালো লাগলো না। একটা জিনিস নতুন করে শিক্ষা হলো, মনের ইচ্ছাকে চেপে রাখলে তার ফল কিছুতে ভালো হয় না। সিনেমা হলে বসে থেকে যমুনাকে আমার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল, বইটা আদ্দেক দেখে তখনি যদি আমি বেরিয়ে আসতুম, তাহলে অনায়াসে যমুনার সঙ্গে দেখা হতো। যমুনার সঙ্গে দেখা হবে না জেনে সম্পূর্ণ সন্ধেটা বিস্বাদ হয়ে গেল। মনের মধ্যে এক মুহূর্তে ঢুকে পড়লো মন-খারাপ রং। আর মন-খারাপ হলেই আমার মধ্যে সামান্য রাগ জাগতে থাকে। সরস্বতী যে অ্যালবামের পাতাটা উল্টাচ্ছিল, আমার ইচ্ছে হলো, ওর হাত থেকে অ্যালবামটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই।

যমুনার জন্য অপেক্ষা করবো ? কিন্তু এসব বাজে থিয়েটারের রিহার্সাল সহজে শেষ হয় না। আর এই নাটক-লেখা মামাতো-ভাইগুলোও বিষম ন্যাকা হয়। ওর মায়েরও দোষ, যার-তার সঙ্গে রিহার্সাল-ফিয়ার্সালে পাঠানো উচিতই নয়। ঐটুকু মেয়ের পক্ষে ওসব আবহাওয়া ভালো নয় মোটেই। আমি এসব একেবারে পছন্দ করি না। তাছাড়া কতক্ষণই বা বসে থাকবো ? আমার তো আর কিছুই কথা বলার নেই, প্রথমদিন বেড়াতে এসে কেউ বেশিক্ষণ থাকেও না। তাছাড়া, ইংরেজি মতে, অ্যালবাম দেখানো মানে উঠে যেতে বলা নয় ? এসব ঠিক বুঝতে পারি না। একবার যোধপুর পার্কের কাছে একটা অল্প চেনা বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, রাত্তির ন'টা আন্দাজ বন্ধুর মা বললো, তুমি আমাদের সঙ্গে আজ রাত্তিরে খেয়ে যাও। তেমন কিছু খাবার নেই অবশ্য, সামান্য ডালভাত, কিন্তু খেয়ে যাও আজ, কেমন ? আমরা খুব খুশি হবো, খেতে খেতে গল্প করবো, আমরা সবাই এক সঙ্গে টেবিলে বসে খাই রাত্তিরবেলা। এসো লজ্জা কি, এ তো তোমার নিজের বাড়ির মতন, খাবার দিতে বলি ? সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমি প্রবল অস্বস্তির সঙ্গে বসে, প্রথমদিন সেই বাড়িতে গিয়েই রাত্রের খাবার খেয়েছিলাম। পরে শেখর একথা শুনে হাসতে হাসতে বলেছিল, তুই করেছিস কি ? তুই তো একটা মহা উজবুক দেখছি!

সত্যি সত্যি কেউ খায় নাকি ? ও রকম খাবার কথা বলা মানে হচ্ছে, এবার তুমি চলে যাও, আমাদের এখন খাবার সময়। যত জোর করে খাবার কথা বলবে, তত বুঝবি তখুনি চলে যাবার নির্দেশ। যাকে–তাকে যখন–তখন খেতে বলার মতন যুগ আর আছে নাকি বাংলাদেশে ? হুঁ, তখন আমি অবশ্য বেশি বাঙাল ছিলাম, এখন ওসব বুঝে গেছি। যারা বেশি আদব–কায়দা দেখাবে, তাদের ওপর বেশি অত্যাচার করতে হবে। আজ যদি যমুনার মা আমাকে খেয়ে যেতে বলে, আমি মোটেই সেটাকে চলে যাবার নোটিস বলে গ্রাহ্য করবো না। তাহলে আমি নিশ্চয়ই এখানে খেয়ে যাবো। পরের বাড়িতে খাবারের স্বাদ সবসময় ভালো লাগে।

আমার পাশে এসে ঝুঁকে সরস্বতী অ্যালবাম দেখাচ্ছে, বারবার ওর বুক থেকে আঁচল খসে যাচ্ছে। এ কথা কে না জানে, মেয়েদের বুক থেকে কখনো এমনি এমনি আঁচল খসে পড়ে না। যদি মেয়েরা ইচ্ছে না করে, তবে কালবৈশাখীতেও বুকের আঁচল ওড়াতে পারবে না। কিন্তু সরস্বতীর দিকে আমার তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। হাজার হাজার লোক সরস্বতীকে বলবে সুন্দরী, কিন্তু ও যমুনার নখেরও যোগ্য নয়। সরস্বতীর মুখে কোনো স্পষ্টতা নেই, ও যেটা প্রাণপণে ফোটাবার চেষ্টা করছে তাকে ও বলতে চায় রহস্য, কিন্তু সব মেয়ের রহস্য ফোটে না, মনে হয় ভান। সরস্বতীর মুখের মধ্যে একটা চাপা কষ্টও আছে, কি যেন একটা গোপন আঘাত ও ইতিমধ্যে পেয়েছে। হয় প্রেমের ব্যর্থতা অথবা পাপ ওর শরীর ছুঁয়ে গেছে, একথা নিশ্চিত বোঝা যায়। এতদিন বিয়ে না হবার এই তাহলে কারণ! আর একটা ব্যাপার আমার এইমাত্র মনে পড়লো, কাল সন্ধেবেলা যমুনা যখন বলেছিল, আমি আপনার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম—তারপর থেকে আর আমি কোনো মেয়ের দিকে তাকাই নি! পথেঘাটে কত অসংখ্য মেয়ের দিকে রোজ দেখতেই হয়, রাস্তার এপাশে–ওপাশে যাবতীয় মেয়ের মুখ দেখে নেওয়া যেন একটা পরম দায়িত্ব, কোনো অপসৃয়মাণ মেয়ের মুখটা দেখতে না পেলে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—যদি সে একবারও মুখ ফেরায়। কিন্তু কাল থেকে যেন আমি আর একটি মেয়েকেও দেখি নি। না, মনে তো পড়ে না। এত কাছ থেকেও সরস্বতীকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে না।

যমুনার মা বললেন, সুনীল, তোমার কোনো বন্ধুটন্ধু কি আমেরিকায় আছে ?

আমি বললুম, কেন বলুন তো ?

— আমাকে একটা খবর এনে দিতে পারো ?

সরস্বতী বললো, মা, কি দরকার!

আমি বললুম, বরুণ তো এই সেপ্টেম্বরেই ফিরবে ?

— তাই তো ফেরার কথা। আবার যে অন্যরকম শুনছি।

সরস্বতী বললো, মা—। তুমি শুধু শুধু।

— কেন, ওকে বললে কি হয়েছে ? জানো, শুনলুম, খোকা ওখানে বিয়ে করেছে।

— কোনো বাঙালি মেয়ে, না বিদেশিনী ?

— শুনছি মেয়েটি স্প্যানিশ। আমাদের অবশ্য ও কিছু জানায় নি। ওর এক বন্ধু খবরটা দিয়েছে আমাদের। শুনে আমার এমন ভয় করছে, যদি সত্যিই তাই হয়।

সরস্বতী বললো, মা এতে ভয়ের কি আছে ? দাদামণি কি ছেলেমানুষ নাকি যে, না বুঝেসুজে একটা কিছু করবে ? নিশ্চয়ই মেয়েটি ভালো।

যমুনার মা খানিকটা ভর্ৎসনার সুরে মেয়েকে বললেন, ছেলেমানুষ না হলেও সবাই সবসময় নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারে না। অনেক দেখলুম তো।

সরস্বতী মুখটা মুহূর্তের জন্য অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার স্বাভাবিক চোখ ফেরালো। মায়ের সঙ্গে সরস্বতীর চোখাচোখি হলো। কি যেন একটা পুরোনো ঝগড়া ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

ওর মায়ের চোখে অপমান ও বেদনা। সরস্বতী বেশ ঠাণ্ডা গলায় বললো, ছেলেমেয়েদের কথা এত ভাবতে ভাবতেই তোমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অথচ এতটা না ভাবলেও চলে।

আমি ঠিকই বুঝেছিলুম, যমুনা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ সরল নেই। এ বাড়ির হাওয়া তো যথেষ্ট জটিল দেখছি। আমি বললুম, কাকীমা, আমি তাহলে এবার যাই। আর একটা জায়গায় যেতে হবে।

— তুমি পারবে খবরটা এনে দিতে ?

— সে রকম কোনো বন্ধুর কথা তো আমার মনে পড়ছে না। যে-সব ছেলে বিলেত-আমেরিকায় যায়, তারা কি আমাদের পাত্তা দেয়! আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো, চেনাশুনো কেউ—

— একটু দেখো, বরুণ আছে সানফ্রানসিস্কোতে।

সরস্বতী অনায়াসে হেসে বললো, ভালো লোককেই তুমি খোঁজ নিতে বলছো। ওর আর পাত্তা পাওয়া যাবে নাকি! আপনার বাড়িতে টেলিফোন আছে ?

এমন সময় সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ করে যমুনার বাবা জগদীশ রায় এলেন! সবল চেহারার সুদর্শন প্রৌঢ়, একমাত্র মোটা গোঁফে যেটুকু পুলিশী চিহ্ন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আমাকে এক পলক দেখে নিয়ে শান্তভাবে টাইয়ের গিঁট খুলতে লাগলেন। যমুনার মা বললেন, একে চিনতে পাচ্ছো ? এ হচ্ছে সুনীল, মেজদির ভাসুরপো।

জগদীশ রায় আমার দিকে আর দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে তো চিনি (অসম্ভব, উনি আমাকে আগে কখনো দেখেছেন কিনা সন্দেহ), অনেক ছোট দেখেছি।

আমি একটুক্ষণ বিগলিত মুখে দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর বিনীতভাবে বললুম, অনেকক্ষণ এসেছি। আজ যাই।—জগদীশ রায় ঘরের মাঝখানে অধিপতির মতন দাঁড়িয়ে আছেন। দুই হাত ছড়িয়ে এবার তিনি কোট খুললেন। আমার উপস্থিতিকে আর বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে বললেন, সাতটার সময় আমার কোনো টেলিফোন এসেছিল ?

ওঁর স্ত্রী বললেন, না তো। উনি বললেন, শোনো, আমি দু'দিনের জন্য জামশেদপুর যাবো, আমার সুটকেস গুছিয়ে দাও। কাল খুব ভোরে আমার প্লেন।

আমি অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম। এবার গলার স্বর উঁচুতে তুলে বললাম,— কাকীমা, আমি আজ চললুম। তারপর তিনজনের মুখের দিকেই পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে বললুম, যাই।—জগদীশ রায় এবার সোফায় বসে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলেন, আমার কথায় কোনো সাড়া দিলেন না। ওঁর স্ত্রী অন্য ধরনের ব্যস্ততার মধ্য থেকে বললেন, আচ্ছা, আর একদিন এসো কিন্তু ঠিক।

সরস্বতী আমাকে এগিয়ে দিতে আসছিল, কিন্তু আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম, একবারও আর পিছনে না ফিরে। বেরুবার সময় ইচ্ছে হলো, দড়াম করে দরজায় শব্দ করি। লেটার বাক্সটা ভেঙে দিয়ে গেলে কেমন হয় ? রাস্তায় বেরিয়েই একটা বেড়ালকে দেখে সেটাকে সুট কষাবার জন্য তাড়া করে খানিকটা ছুটে গেলাম। একটা পুরো খালি মোটরগাড়ি ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়ানো, দুপ করে আচমকা ঘুষি মারলুম সেটার জানালার কাচে। কাচ নয় বলেই ভাঙলো না, বরং আমার হাতে লাগলো। কাছেই একটা দমকলের বাক্স। ওটার কাচ ভেঙে হাতল ঘুরিয়ে একটা দমকলকে ডাকার খুবই ইচ্ছে হলো। কিন্তু ওটার পাশে দুটো ষণ্ডা মার্কা চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে।

যমুনার দেখা না পেয়ে মন-খারাপ ক্রমশ রাগে বদলে যাচ্ছিল। সন্ধে সাড়ে সাতটায় রাস্তায় একা বেরিয়ে আমার বিষম বিরক্ত লাগলো, মনে হলো, কেউ যেন আমাকে ঠকিয়েছে। আজ সন্ধেবেলা দুর্লভ কিছু একটা আমার পাবার কথা ছিল, তার বদলে একটা শুকনো পাতার মতন আমি পথের হাওয়ায় ভাসছি এখন। অথচ অন্যরকম হবার কথা ছিল। কেউ যেন আমার বিশ্বাসের

সুযোগ নিয়ে আমায় ঠকিয়েছে—এই ধরনের রাগী মন-খারাপ আচ্ছন্ন করলো আমায়। দূর ছাই! এসব হবে না আমার দ্বারা। শেখররা ওদিকে তুমুল আড্ডা জমিয়েছে, আর আমি একা পথে পথে বেড়াবো ? নাকি বাড়ি ফিরে গিয়ে ভেরেণ্ডা ভাজবো ? বীণার ওখানেই যাবার জন্য আমি চকিতে একটা ট্যাক্সি ধরে ফেললাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, যা টাকা আছে, তাতে ট্যাক্সি ভাড়াটা কুলিয়ে যাবে।

গেঞ্জি গায়, ধুতিটা লুঙ্গির মতন পরা, পালঙ্কের ওপর শেখর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। যেন ও কতকাল ধরে এখানে আছে, যেন শেখরই এখানে গৃহস্বামী। আয়নার সামনে বীণা। অবিনাশ একটা চেয়ারে বসা, তার পাশে দু'জন বয়স্ক অচেনা লোক, পালঙ্কের এক কোণে আর একটি নারী। চিন্তামণিবাবুকে দেখতে পেলাম না। আমি পর্দা সরিয়ে ঢুকলাম, সেই মুহূর্তে কি একটা কথায় ওরা সবাই হো-হো করে চেঁচিয়ে হেসে উঠেছিল, তখুনি আমি ঘরে পা দিয়েছি।

বীণা প্রথমে আমাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, ঐ তো এসেছে! বাবাঃ! কি খোঁজাখুঁজি!

শেখর ঘাড় ফিরিয়ে বললো, এসেছিস, তোকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেলুম।

আমি বললুম, সে কি রে! তোকেই তো ক'দিন ধরে আমরা সবাই খুঁজছি। কম জায়গায় ঘুরতে হয়েছে তোর জন্য ?

— যা যাঃ! এখানে এসেছিলি একবারও!

— এখানে তো তুই আসা ছেড়ে দিয়েছিলি ?

— কিন্তু আর কখনো আসবো না, তা তো বলি নি। তুই কালও এলি না, একটা জিনিস দারুণ মিস করলি! তোর জন্য কাল পর্যন্ত রেখে দিয়েছিলুম!

এখানে তুই কি পাগলামি করছিস ? তোর মা বিষম চিন্তা করছেন! ইস্, তোর চেহারাও তো খুব খারাপ হয়ে গেছে দেখছি!

অবিনাশ বললো, ঐ এলেন গুরুঠাকুর! এখন লেকচার ঝাড়বেন। তুই নিজে কি করছিস, ভাবছিস বুঝি আমরা টের পাই নি ?

শেখর পা দোলাতে দোলাতে বললো, তোকে সেজন্য ভাবতে হবে না। আমি বাড়িতে মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে এসেছি। বলে এসেছি, কলকাতার বাইরে যাচ্ছি। সপ্তাহ কয়েক ফিরবো না!

— সপ্তাহ কয়েক ? কী করবি এখানে ?

— কিছু না ! এমনিই থাকবো। বাড়ি থেকে ছুটি নিলাম কিছুদিন। লোকে চেঞ্জে যায় না ? আমিও একটু চেঞ্জে এলাম, হাওয়া বদলাতে!

অবিনাশ বললো, ওসব কথা বাদ দে। যেজন্য এসেছি, এখন কাজের কথা হোক। অজয়বাবুর বাড়িটা কোথায় ?

বীণা বললো, জামাইবাবু থাকেন তিনতলায়। চার নম্বর গেটের কাছে, ইলেকট্রিক অফিসের পাশ দিয়ে রাস্তা। অন্তত ঐখানেই তো থাকতো আগে—

অবিনাশ বললো, এখন না থাকলেও নতুন ঠিকানা খুঁজে বার করা যাবে।

আমি শেখরের পাশে এসে পালঙ্কে বসলুম। শেখরের ডান বাহুতে একটা বড়ো রুপোর তাবিজ। এটা তো কখনো দেখি নি! আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি ব্যাপার ? শেখরও হাসতে হাসতে বললো, মা বেঁধে দিয়েছে—যাতে আমার কোনো বিপদ না হয়। থাকুক না।

মা যদি খুশি হয়, তাহলে পরতে আপত্তি কি ?

অন্য মেয়েটি বললো, আপনার তাগার ওপরের ডিজাইনটা বেশ সুন্দর!

শেখর বললো, এটাকে তাগা বলে বুঝি ? বাঙালদের কথা! হুঁঃ! তাগা—বিচ্ছিরি শুনতে লাগে! আমরা বলি, মাদুলি।

— মাদুলি তো গলায় পরে।

— ভাগ্! ও সুনীল, তুই একে চিনিস! ইনি হচ্ছেন বীণার দিদি সাধনা, বিখ্যাত নূরজাহান বেগম!

আমি হাত তুলে বললাম, নমস্কার। আপনার নাম শুনেছি।

মেয়েটি প্রতিনমস্কার করে বললো, আপনার বন্ধু তো ক'দিন ধরে আপনাকে পাগলের মতন খোঁজাখুঁজি করছেন!

আমি বললাম, এইটাই মজা। আমি ওকে খুঁজছি, ও আমাকে খুঁজছে। আমি অবশ্য বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হই নি, ও-ই নিরুদ্দেশ হয়েছে।

— সত্যি, আপনার বন্ধু বেশ অদ্ভুত! কাল যা কাণ্ড করলেন।

আমি প্রশ্ন-চোখে শেখরের দিকে তাকালুম। শেখর বললো, তুই কালও এলি না ? একটা জিনিস তোর জন্য কাল পর্যন্ত রেখেছিলাম, পরীক্ষিৎ এসে তোরটা শেষ করে দিল। এমন সুযোগ তুই আর জীবনে পাবি কি না সন্দেহ!

— কি ?

— এল.এস.ডি.।

— এল.এস.ডি. ? কোথায় পেলি ? সেটা এমন কিছু মহামূল্যবান জিনিস নয়। আমার লোভ নেই।

সাধনা বললো, আপনি খান নি, ভালোই করেছেন। বিচ্ছিরি জিনিস!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আপনিও খেয়েছিলেন না কি ?

সাধনার মুখখানা বিমর্ষ হয়ে গেল যেন একটু। চোখ ফিরিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে বললো, একটা খেয়েছিলুম। উঃ! মানুষের এমনিতেই এত দুঃখ, আবার সাধ করে ট্যাবলেট খেয়ে দুঃখের ছবি দেখার দরকার কি!

শেখর বললো, তুমি বুঝি শুধু দুঃখই পেয়েছো ? আনন্দ পাও নি একটুও ?

— না।

— আমি কিন্তু পেয়েছিলাম। ওঃ, অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, শরীরটা যেন হালকা হয়ে ভাসতে ভাসতে কোথায় মিলিয়ে গেল—

আমি শেখরকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, এল.এস.ডি. ট্যাবলেটের নাম শুনেছি আগে, ঠিক ব্যাপারটা কি বল তো ? কী হয় খেলে ?

— এটা আসলে একটা ডাক্তারি ওষুধ, এখনো পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে বুঝলি,—পাগলদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করে দেখা হচ্ছে—এতে স্মৃতি ফিরিয়ে আনে—ঐ স্মৃতি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটার জন্যই সারা পৃথিবীতে এখন গোপনে নেশার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে!

— পাগলের ওষুধ ? ভাগ্যিস খাই নি।

— একটা ট্যাবলেট খেলে তবে বুঝতে পারতিস। সামান্য এইটুকু একটা ট্যাবলেট, খাবার পর কি অবস্থা, শরীরটা একেবারে বদলে গেল, চোখের সামনে অসংখ্য স্বপ্ন, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন অনবরত, একটার পর একটা।

আমি জোরে হেসে উঠে বললাম, স্বপ্ন দেখার জন্য ট্যাবলেট খেতে হবে ? তোরা কাল

খেয়েছিলি বুঝি ? আমি কিন্তু কিছু না খেয়েই, কাল রাত্রে নিজের ঘরে শুয়ে অনেক উদ্ভট উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছি। প্রায়ই দেখি!

শেখর বিচলিত না হয়ে গাঢ়স্বরে বললো, না রে, এ সত্যিই অন্যরকম। তুই খাস নি তো, তোর বিশ্বাস হবে না। তুই আর আমি এক সঙ্গে অনেক কিছু খেয়ে দেখেছি তো, কিন্তু এর অভিজ্ঞতা একেবারে অন্যরকম। সত্যি, জীবনটা বদলে গেল।

— জীবন বদলাবার জন্য তোর এত লোভ কেন ?

— চালাকি করিস নি! তোর লোভ নেই ? তুই বদলাতে চাস না ? এখন যেটা আছে— এটা কি ? এই কি জীবন নাকি ?

— ট্যাবলেট খেয়ে কী রকমভাবে তোর জীবন বদলালো ?

— যদিও অল্প সময়ের জন্য, তবু বদলে গিয়েছিলাম ঠিকই। খুব ভয় করছিল। দূর থেকে আমিই যেন আমাকে দেখছি। এতে ঘুম পায় নি, জ্ঞান হারায় নি, হাত-পা নাড়া যায়, কিন্তু শুয়ে শুয়ে চোখের সামনে ছবির পর ছবি, ছবিগুলো দেখলে অস্পষ্ট চিনতেও পারা যায়। যে সমস্ত স্মৃতি আমাদের হারিয়ে গেছে, সেগুলো কোথা থেকে যে ফিরে এলো! হারানো স্মৃতিকে দেখতে সত্যি কি রকম গা-ছম্‌ছম্ করে। তোকে বলতে গিয়ে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, দ্যাখ! সবচেয়ে অদ্ভুত কি, এতে অনেক সময় নিজের দুটো মূর্তি দেখা যায়।

— একই রকম দুটো চেহারা পাশাপাশি ?

— না, না, আলাদা আলাদা বয়সের চেহারা। আমি একবার দেখলুম, একটা চার বছরের ছেলে—পায়ে কাচ ফুটে গেছে, মাটিতে বসে কাঁদছে। ছেলেটার মুখ দেখেই চিনতে পারলুম, সেটা আমিই, আমারই চার বছরের চেহারা—ঠিক চেনা যায়। আর তার পাশে দাঁড়ানো একটা লোক—সেটা কে জানিস ? আমিই, এই বত্রিশ বছরের আমি। ভেবে দ্যাখ, চার বছরের আমি'র পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এই বত্রিশ বছরের আমি—দুটো আলাদা শরীর, আমারই, স্বপ্ন বা কল্পনা নয়, চোখের সামনে স্পষ্ট সেই দুটো মুখ, আটাশ বছরের তফাৎ কিন্তু আমার ছেলেবেলার মুখ দেখলে মনে হয় যেন আমি তিনশো বছর পেরিয়ে এসেছি!—তুই বিশ্বাস করতে পারবি না—এরকম দেখলে কি অসম্ভব সুখ আর কষ্ট হয়। লাইসারজিক এমন জিনিস—শুনলুম, যারা একসঙ্গে চারটে ট্যাবলেট খায়—তারা মায়ের পেটে সেই অন্ধকারে শুয়ে থাকার দৃশ্যও দেখতে পায়।

— আমি সে দৃশ্য দেখতে চাই না—

— তুই বুঝতে পারছিস না ব্যাপারটা। বললুম তো, তুই কি জিনিস মিস করেছিস—তুই জানিস না। তোর জন্য কাল পর্যন্ত রেখেছিলাম— অবশ্য, কাল আমার একটু অন্যরকম হয়ে গেল—

বীণার দিদি একমনে শেখরের কথা শুনছিল। মুখখানা একটু শুকনো। বললো, আমি আর কোনোদিন ও জিনিস খাবো না। আমার এত কষ্ট হয়েছিল, এমন মন খারাপ লাগছিল। যা ভুলে যাওয়াই ভালো— তাকে আর জোর করে মনে পড়িয়ে কি লাভ! কাল আপনিও যা দাপাদাপি করছিলেন, আমরা সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম।

আমি শেখরকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই এল.এস.ডি. পেলি কোথায় ? এদেশে পাওয়া যায় নাকি ?

— স্যান্ডি বলে একটা অ্যামেরিকান ছেলের কাছ থেকে কিনলাম। অ্যামেরিকান ঠিক নয়, ক্যানেডিয়ান, যাই হোক, ছ'টা ট্যাবলেট, তিনশো টাকা দাম।

— তিনশো টাকা ? স্বপ্ন দেখার জন্য ? তুই সত্যিই পাগল হয়ে গেছিস। পাগলের ওষুধ খাওয়াই তোর দরকার!

— চাঁদে যখন যাত্রিবাহী রকেট যাবে, তখন এক একটা টিকিটের দাম কত হবে জানিস ? পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, ঘোষণা হয়ে গেছে। কেউ যাবে না বলতে চাস ?

— যাক গে। ছেলেটাকে জোটালি কোথা থেকে ?

— বলছি, বোস, বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। চা খাবি ? বীণা একটু চা বানাও না। চা খাবি, না মদ খাবি ?

— চা খাবো।

অবিনাশ ওপাশ থেকে আঁতকে উঠে বললো, রাত্তির সাড়ে আটটার সময় চা ? লিভারের বারোটা বাজাতে চাস্ বুঝি ?

আমি বললাম, আমি চা-ই খাবো। বীণার হাতের চা খেলেই আমার নেশা হয়ে যায়।

বীণা বললো, আমার ঘরে চিনি নেই। দেখি রেণুর ঘরে আছে নাকি!

আমি অবাক হয়ে বললুম, সে কি ? চিনির কলের মালিকের ঘরেই চিনি নেই!

ঘরের সবাই চাপাভাবে হাসতে লাগলো। ভ্রূভঙ্গি করে বীণা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চিন্তামণিবাবুই বীণার আসল বাবু। লোকটি ভারি মজার। ওঁর সব কিছুর মধ্যেই একটা রসিকতা আছে। রাকিট এন্ড রাকিট কোম্পানির উনি পঞ্চাশ শতাংশের মালিক, ওঁদের তিনটে চিনির কল। উনি নিজেই বলেন, আমার বাবা শুধু চিনির কল খুলেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, চিনি জোগাবে চিন্তামণি—এইজন্য ছেলের নামও চিন্তামণি রেখে গেছেন। আমিও রক্ষিত বংশে জন্মে বংশের ধারা রক্ষার জন্য একটি রক্ষিতা রেখেছি। আমার বাবারও রক্ষিতা ছিল। আমার স্ত্রীও সময় বুঝে গত হয়েছেন।

রক্ষিতা রাখার ব্যাপারে চিন্তামণিবাবুর বেশ একটা বনেদিআনা আছে। বীণার কাছে তিনি শুধু শনিবার এসে সারারাত থাকেন। এইজন্য যে-মাসে পাঁচটি শনিবার সে মাসে তিনি দেন এক হাজার টাকা, যে-মাসে চারটি শনিবার সে মাসে আটশো। এই শনিবারগুলোতে বীণার ঘরের ত্রিসীমানায় কোনো পুরুষের আসা চলবে না। অন্যদিন যে-ইচ্ছে আসতে পারে। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতেও তিনি হঠাৎ হয়তো এসে হাজির হন, কিন্তু তখন বীণার ঘরে অন্য পুরুষ থাকার ব্যাপারে তাঁর কোনো বিরাগ নেই। সামান্য ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিতে দিতে, তিনি সবার সঙ্গে সহাস্যে গল্প করে ঠিক দশটার সময় বাড়ি ফিরবেন। সেদিন তিনি বীণাকে স্পর্শ পর্যন্ত করবেন না।

চিন্তামণিবাবুকে আমার ভালো লাগে, কারণ, তাঁর মধ্যেই প্রথম আমি পুরোনো কলকাতার বণিক সমাজের একজন প্রতিনিধিকে দেখতে পাই। এখন ব্যবসায়ী কথাটা শুনলেই মাড়োয়ারি বা ঐ ধরনের চালকুমড়ো মার্কা চেহারা মনে পড়ে, কিন্তু রক্ষিতবাবুরা কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতার ব্যবসায়ী। বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন মানুষটি, কোনো রকম গ্লানি বা উচ্ছ্বাস নেই চরিত্রে, বেশ শান্তভাবে পৃথিবীর যোগ বিয়োগ বুঝে নিয়েছেন। একেবারে অশিক্ষিতও নন, মাঝে মাঝে বৈষ্ণব কবিতা থেকে ভালো ভালো উদ্ধৃতি দিতে জানেন। মাথার সামনেটা টাক পড়ে গেছে, পেছনদিকের চুলগুলো সামনে পর্যন্ত টেনে এনে পাতা কাটা। প্রায় দাড়ি-গোঁফহীন সহাস্য মুখ। বয়েস পঞ্চাশ বাহান্নর বেশি নয়, কিন্তু কথা বলার সময় এমনভাবে বলেন, 'সে সব আমাদের কালে ছিল—', যেন তিনি সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের কাল থেকেই এ শহরে আছেন।

অনেকক্ষণ পরিশ্রম করার পর আরাম করে এক গ্লাশ জল খাবার মতনই সহজভাবে, সারা সপ্তাহ নিপুণভাবে ব্যবসার কাজ দেখাশুনো করে চিন্তামণিবাবু শনিবার আসেন বীণার কাছে। সেদিন তাঁর পূর্ণ বিশ্রাম চাই। অন্য দিনগুলোতে যে মাঝে মাঝে আসেন, তা যেন অনেকটা

বেড়াতে বা খোশগল্প করতে আসার মতন। ঐসব দিনেই আমার আর শেখরের সঙ্গে ওঁর কখনো কখনো দেখা হয়েছে। কোঁচানো ধুতি ও গিলে-করা পাঞ্জাবি পরে অনুত্তেজিতভাবে আসেন, এসে পকেট থেকে রুপোর পানের ডিবেটা বার করে সামনে রেখে আরাম করে বসেন। তারপর বলেন, কয়েকটা ধূপ জ্বেলে দাও তো বীণা, ছেলেবেলা থেকেই আমার ধূপের গন্ধ শোঁকা অভ্যেস, আপিসে আমার ঘরে সবসময় ধূপ জ্বলে, বাড়িতে জ্বলে, ধূপের গন্ধ ছাড়া সন্ধেবেলা আমি থাকতেই পারি না। ... চোখে কাজল দিয়েছো দেখছি, বাঃ, বেশ মানিয়েছে। — সেসব দিন বীণার প্রতি ওঁর ব্যবহার অনেকটা পিতার মতন। ভারি মধুর, স্নেহমাখানো।

চিন্তামণি রক্ষিতকে আমার ভালো লেগেছিল, কারণ উনি কলকাতার নাগরিক সমাজের একটি দিক আমাকে দেখিয়েছেন। সমাজে উনি সুদক্ষ ব্যবসায়ী, বাড়িতে নিশ্চিন্ত দায়িত্বশীল পিতা— এক ছেলেকে টেকনোলজি পড়াতে জার্মানি পাঠিয়েছেন; নিজের মেয়েকে কখনো কোনো উড়ো-সম্পর্কের দাদার সঙ্গে সিনেমা দেখতে পাঠাবেন না, পাড়ার দুর্গাপূজা কমিটিতে ওঁকে প্রতিবছর সহ-সভাপতি করা হয়, স্থানীয় ব্যায়াম সঙ্ঘের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে নিখুঁত বক্তৃতা দেবেন প্রধান অতিথি হিসেবে, নেতাজী ফিরে এলে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যাবে রাতারাতি— এ সম্পর্কেও ওঁর দৃঢ় ধারণা আছে, এমনকি প্রতিবেশীর বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে পুরোহিত মন্ত্র পড়তে ভুল করেছিল—তাও তিনি ধরে দিয়েছিলেন, এবং তিনি প্রতি শনিবার এসে বীণার ঘরে রাত কাটিয়ে যান। এর মধ্যে যেন কোনো বৈপরীত্য বা গরমিল নেই। অত্যন্ত স্বাভাবিক। চিন্তামণি রক্ষিতের আশ্রয় পেয়ে বীণা ভালোই আছে।

বীণার দিদি সাধনা খাটের ওপর এলিয়ে আধ-শোয়া হয়ে আছে, ওর পা'টা আমার গায়ে লাগছে, কিছুক্ষণ ধরেই আমি এজন্য বিরক্ত বোধ করছিলুম। সুন্দরী মেয়ে হোক আর যাই হোক, গায় পা লাগা আমি মোটেই পছন্দ করি না। আমি একটু সরে বসে আড়চোখে ওকে একবার দেখলুম। দেখলেই মনে হয়, বহু পুরুষের কাছ থেকে পদসেবা পেতে এ মেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বীণাকে দেখতে তেমন কিছু উজ্জ্বল নয়, কিন্তু বীণার দিদিকে সুন্দরী বলতেই হবে। কিংবা ঠিক সুন্দরীও হয়তো নয়, সৌন্দর্য ওর শরীরে ছড়িয়ে আছে, ঠিক যেন মিশ খায় নি। কোথাও কোথাও বড় বেশি ! একটা গাঢ় নীল রঙের পাতলা সিল্কের জরি বসানো শাড়ি পরেছে। এরকম জরি বসানো শাড়ি আজকাল কলকাতার মেয়েরা পরে না। মাথায় একরাশ চুল, মুখখানা নরম, ভারি নরম, তুলতুলে ফর্সা রং, মনে হচ্ছে ঠোঁট দু'টি, নাক, চোখের পাতা, আয়ত ভুরু— এগুলো সবই ছবির মতন আঁকা। কি জানি দু'একটা এর মধ্যে সত্যিই আঁকা কিনা, আমি তো আর হাত দিয়ে দেখতে যাচ্ছি না ! ওর সাজপোশাকে আর কী আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে বুঝতে পারছি না, কিন্তু চেহারার মধ্যে সত্যি একটা মুসলমান মেয়েদের ভাব এনে ফেলেছে। চোখে চোখ পড়তেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কবে এলেন ?

—সাত আট দিন হলো। গত সোমবার এসেছি।

—কি করে এলেন ?

—প্লেনে, কলোম্বো ঘুরে।

— থাকবেন এখানে কয়েকদিন ?

— দেখি ! একটা খুব দরকারে এসেছি, না এসে উপায় ছিল না।

— আপনার পক্ষে তো এখানে থাকা বিপজ্জনক। আপনার স্বামী জানতে পারলে মুশকিল হবে না ?

— না, কি আর হবে ! আমার মনটা আজ বড় খারাপ লাগছে, খাটের তলা থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা একটু তুলে দেবেন ?

অপরিচিত দু'জনের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, আমি দিচ্ছি ! সাধনা হাত বাড়িয়ে বললো, এই হচ্ছে এখন আমার স্বামী, এর নাম আবদুল হালিম। আর ঐ জন হচ্ছেন শহীদ চৌধুরী, আমার বন্ধু।

দামী সুট পরা লোক দু'টির মুখে কিছুটা আড়ষ্ট ভাব। তবু জোর করে হাসি ফোটাবার চেষ্টা আছে।

আমি দু'হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিলুম, তারপর কি ভেবে একটা হাত শুধু তুললুম। ওরাও দু'জনে এক হাত কপালের কাছে তুললো।

আমার একটা কথা ভেবে মজা লাগলো যে একটু আগে বীণা অজয়বাবুকে জামাইবাবু বলেছে। সে বেচারা তো খারিজ হয়ে গেছে, তবু বোধহয় পুরোনো অভ্যেস থেকেই বীণা এখনো তাকে জামাইবাবু বলে।

শহীদ চৌধুরী নামের লোকটি বললো, এবার বোধহয় আমাদের উঠতে হবে। সাধনা প্রায় ধমকের সুরে তাকে বললো, বসো না ! অত ব্যস্ত কিসের ! লোকটি বললো, না, ব্যস্ত নই, কিন্তু আমরা ঘর আটকে বসে আছি, ওদের হয়তো অসুবিধে হচ্ছে, ওদের নিজস্ব কিছু ব্যাপার থাকতে পারে ! অবিনাশ হা-হা করে হেসে উত্তর দিলো, না, আমাদের নিজস্ব কোনো গোপন ব্যাপার নেই। আমাদের সবই এক সঙ্গে। বসুন !

বীণা চা নিয়ে ঢুকে বললো, একি সবাই মদ খাওয়া শুরু করেছো, তা হলে আমি চা বানালুম কেন ? আমি বললুম, আমাকে চা দাও। আমি চা-ই খাবো। শেখরও বাথরুম থেকে ফিরে বললো, আমাকেও চা দাও, আমার মাথা ঘুরছে এখনো।

সত্যি, পুরোনো রোগীর মতন শেখর দেয়াল ধরে ধরে হাঁটছে। চোখের মধ্যে কেমন ঘোর ঘোর ! আমি বললুম, তোর কী হয়েছে ? শেখর বললো, কালকে মাথার মধ্যে কি রকম যেন হয়ে গিয়েছিল সেই থেকে শরীরটা খারাপ লাগছে। এখন প্রায় ঠিক হয়ে গেছে অবশ্য।

বীণা কোপের সঙ্গে বললো, অত করে বারণ করলুম ঐ ছাইভস্মগুলো না খেতে, তবু খাওয়া হলো !

খাট পর্যন্ত পৌঁছে, খাটের বাজু ধরে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে শেখর এক হাতে বীণাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, দূর পাগলি ! অত ভয় কিসের।

বীণা খানিকটা ছটফট করে বলে উঠলো, এই, কি হচ্ছে ! এত লোকের সামনে—!

শেখর আবেগময় গলায় বললো, কোনো লোক নেই। চোখ বন্ধ করো, তাহলেই আর কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। এসো, একটা চুমু খেতে দাও ... ওকি, জোরে ধাক্কা দিও না, পড়ে যাবো, এমনিতেই দাঁড়াতে পারছি না।

বীণা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললো, এখন নয়, পরে, পরে।

— পরে নয়, এখন, এখন ! এখন ইচ্ছে হয়েছে, এখনই।

— না না না।

আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কি রকম যেন অন্যমনস্ক লাগলো, আজকে এই ঘরের হাওয়াটা কি রকম যেন অস্বস্তিকর, কথাবার্তা বারবার কেটে কেটে যাচ্ছে। শেখরের সঙ্গে আগে যখন এখানে এসেছি, একটা প্রবল হুল্লোড় দেখেছি তখন, বীণা অত্যন্ত বেশি মদ খেয়ে নাচের ভঙ্গি করতে করতে (নাচ জানে না) হুড়মুড় করে পড়ছে একদিন আলমারির গায়—ঝনঝন শব্দে ভেঙেছে কাচ, আর, স্ত্রীলোকের কাছাকাছি কাচ ভাঙার শব্দ এমন মানায়, আমার মনে হয়েছিল মেয়েদের আশেপাশে অনবরত কাচ ভাঙতে থাকুক, সেই শব্দে আমি এত মজা পেয়েছিলাম যে ঠং করে অ্যাশট্রে ছুঁড়ে মেরেছিলাম আলমারির বাকি পাল্লার কাচে। আজ এখানে

নানা ধরনের লোকের ভিড়ে কি রকম যেন একটা মিটিং মিটিং ভাব। যমুনাদের বাড়িতে গিয়ে যমুনাকে না পেয়ে আমার মন খারাপ লেগেছিল। মন–খারাপ থেকে রাগ। যখন রাগ আসে খানিকটা অকারণে, তখন কিছু একটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে, আর পৃথিবীতে যতগুলো ভাঙার জিনিস আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে নিয়ম ভাঙা। আমি সেইরকমই কিছু একটার আশায় এখানে এসেছিলাম, যমুনাদের বাড়িতে গিয়ে অপমানিত বোধ করেছিলুম আজ। কে ঠিক অপমান করেছে তা বলা যায় না, তবু সব মিলিয়ে কি রকম যেন—যমুনাকে না পাওয়াই তো বড় অপমান। যমুনা, তোমাকে আমার চাই। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। আমি এখানে এসে ভুল করেছি। আর কোনোদিন আসবো না। এখানে কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, অন্য কিছু একটা ব্যাপার চলেছে, যার সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

শেখর প্রগাঢ়ভাবে চুমু খেলো বীণাকে। শেখরের হাত দুটো বীণার চুলের মধ্যে মুঠো করা, একটু আগে আয়নার সামনে অত যত্ন করে চুল বেঁধেছে বীণা সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বীণা বললো, উঃ রাক্ষস একটি ! অবিনাশ বললো, এদিকে এসো তো বীণা, আমিও একটা চুমু খাই !

বীণা বললো, ইস্, অত আর শখ করে না।—অবিনাশ নেকড়ের মতন লাফিয়ে এসে বীণাকে জড়িয়ে ধরলো। খানিকটা ঝটাপটির পর অবিনাশের সশব্দ চুম্বনের দৃশ্য দেখা গেল। রাগে ফুলে ওঠা বিড়ালীর মতন বীণা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললো, নিন, আপনি আর বাকি থাকেন কেন ?

আমি হেসে বললুম, আগে মুখ ধুয়ে এসো।

-- কেন, মুখ ধুতে হবে কেন ?

— অবিনাশের এঁটো কে খায় ?

অবিনাশ বললো, এই শালা—

খাটের ওপর থেকে সাধনা খিলখিল করে পাগলাটে ধরনের হেসে বললো, আমারটা এঁটো নেই, আসুন !—আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, কই আসুন,—তারপর আবদুল হালিমের দিকে বক্র চোখে তাকিয়ে সেইরকম পাগলাটে হাসি। আমি তড়াক করে খাট থেকে নেমে এসে বললুম, ওরে বাবা, তারপর খুন হয়ে যাই আর কি !

সাধনা আদুরে গলায় বললো, এই, এই, ধরো তো লোকটাকে। আবদুল, ওকে আমার কাছে এনে দাও না। ওকে আমার একটা চুমু খেতেই হবে !

আমি পালাবার ভঙ্গি করে বললুম, খবরদার আজ কেউ আমাকে ছোঁবে না বলে দিচ্ছি ! আবদুল হালিম আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, হেসে বললো, আপনি ভয় পাচ্ছেন ?

আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, ভয় না, ঘেন্না !

আবদুল হালিমের মুখখানা শুকিয়ে গেল, যেন আমার কথা ও বুঝতেই পারলো না। অবিনাশ বললো, নূরজাহান বেগম, আমাকে একটা চান্স দেবে ?

সাধনা তখন গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল। শেষ করে বললো, যাঃ, মনটা আবার খুব খারাপ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে ব্যথা করছে।

আবদুল হালিম বললো, সাধনা এবার হোটেলে ফিরবে নাকি ?

সাধনা বললো, না, শরীরটা খারাপ লাগছে। এখানে আর একটু শুয়ে থাকি। তুমি বসো না!

বীণা বললো, দিদি, তুই আর অত খাস না ! একেই তোর শরীর খারাপ—

মুহূর্তে গলার আওয়াজ বদলে গেল সাধনার, যেন ফুঁপিয়ে উঠলো, আমার শরীর খারাপ না রে, শরীর ভালো আছে, কিন্তু আমার মনটা যে কিছুতেই ভালো হচ্ছে না।

শেখর আমার হাত ধরে বললো, চল্ সুনীল, ছাদে যাবি ? যা গরম, ছাদে গেলে হাওয়া পাওয়া যাবে ! ওখানে একটা সুন্দর ছোট্ট ঘর আছে। শনিবার দিন তো চিন্তামণিবাবু এসেছিলেন— আমি সেদিন ছাদের ঘরে ছিলাম। বেশ লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন বিদেশে বেড়াতে এসেছি।

অবিনাশ বললো, চল্, ব্র্যান্ডির বোতলটা নিয়ে ছাদে গিয়েই বসি। বিলিতি জিনিস, সুনীল একটু চেখে দ্যাখ্।

ছাদে উঠে আমি শেখরকে বললুম, ওরা এসে জুটলো কোথেকে ?

— কেন, তোর ভালো লাগছে না ?

— না, একটুও না।

— অত বড় একটা ফিল্ম স্টার তোকে চুমু খেতে চাইলো, তুই রাজি হলি না ? কত লোক এই সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যেতো।

আমি বিরক্ত স্বরে বললুম, কি ছেলেমানুষের মতন কথা বল্ছিস্ ! ভারি আমার ফিল্ম স্টার ! এখানে কে চেনে ওকে ? তা ছাড়া হিন্দুর মেয়ে এই রকমভাবে কোনো মুসলমানকে বিয়ে করলে আমার ভালো লাগে না !

— তুই দেখছি কমুনাল হয়ে উঠলি !

— কমুনাল ফমুনাল জানি না ! ভালো লাগে না, ভালো লাগে না ! জাতটাতের জন্য নয়, মেয়েটার শরীরের মধ্যে লোভ ছাড়া যেন আর কিছুই নেই ! ওরকম আদুরে আদুরে ন্যাকা ন্যাকা ঢঙের মেয়ে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না ! সিনেমায় নামার লোভে নিজের স্বামীকে ছেড়ে একটা মুসলমানকে বিয়ে করা—

অবিনাশ বললো, একটা নয় তিনটে। ঐ আবদুল হাসিম ওর তিন নম্বরের নিকে করা স্বামী।

শেখর বললো, যার যা ইচ্ছে, সে তার নিজের পছন্দ মতো কাজ করবে, মানুষের এই স্বাধীনতায় তুই বিশ্বাস করিস না ?

—করবো না কেন ? যার যা ইচ্ছে সে তাই করতে পারে, কিন্তু তার সবগুলোই যে আমার পছন্দ হবে তার কোনো মানে নেই। শুধু লোভ দিয়ে তৈরি করা একটা শরীর, দেখলে আমার ঘেন্না হয়। দয়া–মায়া–স্নেহ এগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই।

শেখর আস্তে আস্তে বললো, শুধু একটা লোভী মেয়েকে দেখলে আমারও সহ্য হতো না। কিন্তু ঐ মেয়েটার আর একটা অসম্ভব দুর্বলতা আছে, যা ওর মতো মেয়ের পক্ষে অবিশ্বাস্য—

—যাক গে, চুলোয় যাক্। ওর কথা বাদ দে। তুই এখানে হঠাৎ লুকোবার কথা ভাবলি কেন ? গোড়া থেকে বল্। এল এস ডি খাবার জন্য এখানে এসে দিনের পর দিন পড়ে রইলি?

একটাই মাত্র গ্লাশ এনেছিল অবিনাশ, তাতে প্রায় ভর্তি করে ব্র্যান্ডি ঢাললো। নূরজাহান বেগমের আনা দামী ফরাসি ব্র্যান্ডি। অবিনাশ একটা চুমুক দিয়ে বললো, একটু চেখে দেখবি নাকি ? আমি ওর হাত থেকে গেলাশটা নিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে সবটা গলায় ঢেলে দিলাম। জিভ না ছুঁয়ে জিনিসটা জ্বলতে জ্বলতে গলা দিয়ে নামতে লাগলো। আঃ, শুকিয়ে ছিল গলাটা, জ্বালিয়ে দিয়ে জাগিয়ে তুললো, আঃ, আর একটু জ্বলুক, এবার জ্বালাটা এসে পৌছালো বুকে, সাপের মত মোচড়াতে লাগলো, আরও নিচে নামবে, পেট পর্যন্ত, পেটের কাছে জ্বলছে, জ্বলুক, গলা–বুক–পেট, এতক্ষণ এদের কথা মনেও পড়ে নি, এখন বুঝতে পারলুম ওরা আছে, জ্বালা করছে বলেই টের পাচ্ছি, আর একটু জ্বলুক। আমি অবিনাশকে বললুম, দে, আর একটু দে আমায় ! শেখর বললো, আমি খাবো না। আমার মাথার মধ্যে এখনো বোঁ–বোঁ করছে। অবিনাশ জোর দিয়ে বললো, নে না একটু। অসুখ হলেই তো লোকে ব্র্যান্ডি খায় ! তুই কাল দুটো ট্যাবলেট একসঙ্গে খেতে গেলি কেন ?

— একটা দারুণ ইচ্ছে হলো, দেখি না কি হয়। ভেবেছিলুম অলৌকিক একটা কিছু দেখতে পাবো। উঃ, কাল হরিবল্ নাইট গেছে !

আমি বললুম, কি করে জোগাড় করলি বল না ! এখানে কেউ কখনো এল এস ডি খেয়েছে বলে তো শুনি নি।

শেখর বললো, ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমি প্রথমে কিনতে চাই নি। প্রথমে রিফিউজ্ করেছিলুম। তারপর হঠাৎ মত বদলে ফেললুম। ব্যাপারটা কি হলো জানিস্, গত সপ্তাহে সেদিন ছিল সোমবার, বাড়ি থেকে অফিসে বেরুচ্ছি সেজেগুজে, পালিশ করা জুতো, টাই-ফাই সব ঠিক ছিল, মনের মধ্যেও কোনো খিঁচ ছিল না, আস্তে আস্তে শিস দিচ্ছিলাম পর্যন্ত, দরজা দিয়ে বেরুতে যাচ্ছি—হঠাৎ চৌকাঠে একটা হোঁচট খেলাম। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম। মা বললেন, অমঙ্গল, এক্ষুনি বেরোস না, আবার ঘরের মধ্যে একটু বসে যা ! জানিস তো মায়ের ব্যাপার, আমি এসব অগ্রাহ্য করে মাকে কষ্ট দিতেও চাই না। ঘরের মধ্যে ফিরে এসে চেয়ারে আবার বসলাম। ঠিক করলুম, মনে মনে একশো গুনে আবার বেরুবো। সেই একশো পর্যন্ত গোনা কি যে অসহ্য মনে হতে লাগলো তোকে কি বলবো। বিরক্ত হয়ে তেতো মুখে এক একটা সংখ্যা গুনছি—আর মাথার মধ্যে যেন দম্‌দম্ করে হাতুড়ি পড়ছে। যাই হোক, তারপরে বেরুলাম, তখন থেকে মনটা খিঁচড়ে রইলো। বেরিয়ে এসে ট্রামে-বাসে উঠতে পারি না—এত ভিড় ! অন্যদিনও তো এরকম হয়, কিন্তু সেদিন যেন রাগে গা জ্বলে যেতে লাগলো। ইচ্ছে হলো গলার টাইয়ের দুটো ফেট্টি দু'দিকে জোরে টেনে ধরে দমবন্ধ করে নিজেকে মেরে ফেলি। বুঝতে পারছিস্ আমার কী রকম লাগছিল ?

অবিনাশ বললো, খুব স্বাভাবিক। মাইরি, ভেতরে ভেতরে যেন রাগ জ্বলছে সবসময়। কখন কিসে ফস্ করে বেরিয়ে পড়বে ঠিক নেই। এক এক সময় আমাদের অনেকেরই কিসের ওপর যে রাগ তাও বোঝা যায় না।

আমি বললুম, তা ঠিক। কাচের গ্লাসে জল খাবার পর ইচ্ছে করে, এক এক সময় গ্লাশটা ছুঁড়ে ভেঙে ফেলতে—তার কারণ হয়তো সকালবেলা কাগজে ভিয়েৎনামে বিশ্রী যুদ্ধের খবর পড়েছি। উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষে চরিত্রে লোকের না-খেয়ে মরার খবর শুনলে হয়তো বিকেলবেলা একটা মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়। তুই যে সেদিন বারীনদাকে মারতে গেলি, তোর আসল রাগ হয়তো বারীনদার ওপর ছিল না, তোর রাগ ছিল কলকাতা কর্পোরেশনের ওপর।

অবিনাশ খুক করে হেসে বললো, ব্যাপারটা বোধহয় এত সরলও না— অন্য লোকের দুঃখ-টুঃখ নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না। ভেবে দ্যাখ অনেকের তুলনায়, আমাদের বেশ ভালো থাকার কথা। আমাদের সবারই চাকরি আছে, স্বাস্থ্যও খারাপ নয় হেসে খেলে বেশ তো সুখে জীবনটা কাটিয়ে দেবার কথা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিসের যে এত ছটফটানি কিচ্ছু বুঝি না।

শেখর বললো তারপর শোন না। অফিসে তো পৌঁছোলুম। আমাদের সেই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান গো-ডাউন ইনস্পেক্টারটা, ল্যারি, ওর পাশে দেখলুম একটা ছোকরা সাহেব বসে আছে। ল্যারিকে মনে আছে তো ? সেই যে আমাদের হাওড়ায় একটা হাউজি খেলার আড্ডায় নিয়ে গিয়েছিল !

অবিনাশ বললো, ওটা তো একটা মহা চিটিংবাজ। আমাদের অনেক টাকা ঠকাবার চেষ্টা করেছিল সেবার। নেহাৎ তোর অফিসের লোক বলেই দাঁত ক'খানা ভেঙে দিই নি !

—ল্যারি আমার সঙ্গে সাহেবটার আলাপ করিয়ে দিল। ছেলেটার নাম স্যান্ডি গ্রোভার, জাতে ক্যানেডিয়ান, আমেরিকায় থাকে, আর্টিস্ট, সারা পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছে। ঐ বীটগুলো যেমন

বাওরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদেরই একটা আর কি ! ল্যারি আমাকে ফিস্‌ফিস্ করে বললো, আর য়ু ইন্টারেস্টেড ইন এল এস ডি ? ইউ ক্যান হ্যাভ ইট ফ্রম হিম্ ! — স্যান্ডি বলে সেই ছোঁড়াটা আমাকে বললো, ও কতগুলো এল এস ডি ট্যাবলেট স্মাগ্‌ল করে নিয়ে এসেছে। ওর নিজের ব্যবহারের জন্য, ও নাকি অ্যাডিক্ট। যাই হোক, ওর হংকং যাবার প্লেন ভাড়া নেই, ও আমাকে ছ'টা ট্যাবলেট বিক্রি করতে পারে তিনশো টাকায়। আমি বললুম, স্যরি, আমার দরকার নেই। এই বলে ওদের কাটিয়ে দিলুম। তখন আমি ভেবেছিলুম কিছু একটা বাজে জিনিস আমাকে গছাবার চেষ্টা করছে। জিনিসটা যাই হোক, তখনো আমি পুরোপুরি পালাবার কথাটা ভাবি নি।

শেখর আমার দিকে চোখ তুলে বললো, কিন্তু না কিনে আমার উপায় ছিল না। কে আমাকে কিনতে বাধ্য করলো, কে জানে ! একটা জিনিস লক্ষ করেছিস্, আমাদের ইচ্ছেশক্তি কি রকম দুর্বল হয়ে গেছে এখন ! মুহূর্তে মুহূর্তে ইচ্ছেগুলো কি রকম বদলে যায় !

অবিনাশ বললো, তা নয়, ভেতরে ভেতরে সবসময় একটা তীব্র ইচ্ছে থাকে, বাইরের নানা যুক্তি দিয়ে সেটাকে কাটাবার চেষ্টা করি, কিন্তু হঠাৎ সেটা ঠিক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে।

— লাঞ্চ পর্যন্ত আমি ঠিক ছিলুম, সকাল দশটার চাপা রাগটা অনেকটা কমে আসছিল, মন দিয়ে কাজ করে সব ভুলে যাবার চেষ্টা করছিলুম। এমন সময় দুটো ঘটনা ঘটলো। আরাদের অফিসে একটি রেকর্ড সাপ্লায়ার আছে, বিষ্টুপদ—রোগা সিড়িঙ্গে চেহারার লোকটা। আমি লাঞ্চ খেতে বেরুচ্ছি, এমন সময় বিষ্টুপদ এসে আমার সামনে হাত কচলাতে লাগলো। বললে, স্যার, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমি বললুম, কী ব্যাপার, তাড়াতাড়ি বলুন, আমি বেরুবো। লোকটা বললো, স্যার, আমাকে কুড়িটা টাকা দিন। আপনার কাছে না চেয়ে উপায় ছিল না, তাই এলাম। তিনদিন বাড়িতে রান্না হয় নি, পাঁচটা ছেলেমেয়ে, কাল থেকে কিছু জোটে নি—। আমি বিব্রত হয়ে বললুম, এরকম করে ধার দেওয়া আমি পছন্দ করি না—। বিষ্টুপদ বললো, ধার নয় স্যার। আপনি আমাকে দান করুন। অফিসে কোথাও আমার কিছু পাওনা নেই, বাড়িতে একটা জিনিস নেই যা বিক্রি করে দিতে পারি, অনেকের কাছে ধার করেছি—শোধ দিই নি, ধার চাইলে কেউ আমাকে আর দেবে না। সারা অফিসে আপনিই একমাত্র ভালো লোক, আপনার কাছেই প্রথম দান চাইতে এলাম। অন্তত কুড়িটা টাকা না হলে এ-মাসটা কিছুতেই চালাতে পারবো না। ভেবে দ্যাখ, সারা অফিসের মধ্যে আমাকেই দাতা হিসেবে বেছে নিয়েছে ! শুনলে রাগ হয় কিনা ! লোকটার প্রার্থনার মধ্যে এমন একটা নির্লজ্জতা ছিল যে, শুনলে গা ঘিনঘিন করে। তিন দিন ধরে খাক্ বা না খাক্ তিনচারদিন দাড়ি কামায় নি, মুখের চেহারাটা কেমন রুক্ষ আর হিংস্র। এই রকম মুখওলা লোকেরাই আত্মহত্যা করে। তা ছাড়া আমি লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি, এই সময় একটা ক্ষুধার্ত লোক এসে আমার কাছে টাকা চাইছে ব্যাপারটা কি রকম ভাল্‌গার। আমার ব্যাগে গোটা কুড়িক টাকাই ছিল, আমি ওকে সব টাকা দিলে আমার খাওয়া হয় না, কিন্তু একথা ওকে বলা যায় ? লোকটা ঘ্যান ঘ্যান করে যাতে আমার নামে প্রশংসা বেশিক্ষণ চালিয়ে না যেতে পারে—এই জন্য আমি ওকে বিদায় করতে চাইলাম। খুব অস্পৃশ্য জিনিস বাধ্য হয়ে ছুঁতে গেলে যেমন হয়, আমি দু'আঙুলে নোটগুলো তুলে ওকে দিয়ে, কড়া গলায় বললুম, লাল ফ্লাগ লাগানো ফাইলগুলো সব বড় সাহেবের ঘরে দিয়ে আসুন এক্ষুনি ! কারুকে কিছু দান করলে মনের মধ্যে একটা অহঙ্কার আসার কথা, কিন্তু আমার বিরক্ত লাগতে লাগলো।

—আর এই জন্যই তুই আবার তিনশো টাকা খরচ করে ফেললি ? অবিনাশ বললো। আমি বললুম, উঁহু, শেখর তো বললো, আর একটা ঘটনা আছে। সেটা কি ?

—সেটা ঠিক ঘটনা নয়। বিষ্টুপদকে টাকাটা দিয়ে আমি হাত মুখ ধোবার জন্য বাথরুমে এলুম। অস্পৃশ্য জিনিস ছোঁয়ার মতই গা'টা ঘিনঘিনে লাগছিল। তখন সত্যি সত্যি ঐ রকম একটা

জিনিস ছুঁয়ে ফেললুম ! বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করতে গেছি, দরজার হাতলের গায় একটা টিকটিকি ছিল—আমি সেটা দেখতে পাই নি। ওফ্, টিকটিকির গায় হাত লাগলে কি বিচ্ছিরি লাগে জানিস্ তো, জানি না তোদের লাগে কিনা, আমার হাতখানা যেন পচে গেল, সেই ঠাণ্ডা জিনিসটার গা ছুঁয়ে ফেলে আমার যেন শরীর শিউরে উঠলো। টিকটিকিটা চটাস্ করে পড়লো মাটিতে—আমি রাগে দাঁতে দাঁত ঘষে, ড্যাম ইট, ড্যাম ইট বলে, সেটাকে জুতো দিয়ে মারার চেষ্টা করলাম। মারা সহজ নয়, সেটা সাড়াৎ করে দেয়াল বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে গেল, একেবারে পালিয়ে গেল না, সেই শুয়োরের বাচ্চা টিকটিকিটা প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। বাথরুমে এমন একটা কোনো জিনিস নেই—যেটা দিয়ে আমি ওটাকে খুঁচিয়ে মারতে পারি। কি অসহ্য রাগ, অসহায় ভাব আর ঘেন্না জেগেছিল তখন কী বলবো ! আমি বেসিন থেকে জল নিয়ে সেটার দিকে ছিটিয়ে দিতে লাগলাম। সেটা আর একটুও নড়লো না। শুয়োরের বাচ্চাটাকে না মারতে পারলে আমার কিছুতেই গায়ের ঝাল যাচ্ছিল না। কিন্তু সেটাকে মারার কোনো উপায় নেই। আমার তখন কান্না পেয়ে যাবার মতন অবস্থা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেই দেখি আবার বিষ্টুপদ। বিষ্টুপদ বললো, স্যার, বড় সাহেব বললেন—। আমি তার দিকে রক্তচক্ষু তুলে বললাম, ড্যাম ইট ! তারপর সোজা ক্যাশে এসে কো-অপারেটিভ ফান্ড থেকে পাঁচশো টাকা ঝট করে তুলে নিয়ে ল্যারিকে গিয়ে বললাম, কোথায় তোমার সেই বন্ধু ? আমি ওগুলো কিনবো। তোরা হয়তো বলবি, আমার ও ব্যবহারের মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। সত্যিই নেই হয়তো, আমি দেখাতে পারবো না, কিন্তু সেই তখন শুধু একটা কথাই আমার মনে হচ্ছিল, আমার ছুটি চাই, আমার ছুটি চাই—তোরা হয়তো ঠিক বুঝতে পারছিস না আমার তখনকার—

অবিনাশ বললো, ঠিকই বুঝতে পারছি। তারপর বলে যা—

—ল্যারিদের পাড়ায়, ইলিয়ট রোডের একটা হোটেলে স্যান্ডি গ্রোভার ছেলেটা থাকে। ঠিকানা নিয়ে আমি ওকে খুঁজে বার করলাম। ও আমাকে বলে দিল যে, যেখানে সেখানে বসে ওই ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। একটা নিরাপদ জায়গা দরকার, যেখানে বিছানায় শুয়ে থাকা যায় এবং মাথার কাছে সবসময় একজন দেখাশুনো করবার লোক থাকবে। যে দরকার হলে যদি তেষ্টা পায় জল এগিয়ে দেবে, মাঝে মাঝে কথা বলে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করবে, পায়ের তলাটা হাত দিয়ে ঘষে দেবে। এ ট্যাবলেট খেলে তো সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় না, অনেকটা পেথিড্রিন নেবার মতন নেশা। একা একা খেলে নাকি দারুণ মৃত্যুভয় আসে। তখন আমি ভেবে দেখলুম, বীণার এখানে আসাই বেস্ট। তোদের কারুর কথা তখন মনে পড়ে নি, আসলে আমি ভেবেছিলুম, এমন দামী জিনিস—নিজেই একা এর সুখটুকু ভোগ করবো। কিন্তু খাবার পর দেখলুম, এতে শুধু সুখই নেই, দুঃখও হয় প্রচণ্ড। ভুলে যাওয়া স্মৃতিকে আবার দেখার মধ্যে একটা বিষম দুঃখ আছে। দুঃখ পাবার পরই বুঝলুম, এটা তোদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া দরকার। তোর জন্য আমি কাল পর্যন্ত একটা রেখেছিলুম—

— কাল রাত্রে তোর কি হলো বল্ !

— প্রথম দিন সন্ধেবেলা যখন এলুম, তখন বীণার ঘরে লোক ছিল। তাকে কাটাতে কাটাতে ন'টা বাজলো। একটা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে রইলাম, বীণা যত্ন করেছিল খুব, যখন নেশা কাটলো, তখন রাত দেড়টা প্রায়, শরীর অসম্ভব দুর্বল, বাড়ি ফেরার কোনো উপায় নেই। পরের দিন সকালবেলাই তো নূরজাহানরা এসে হাজির। তখন এমন একটা নতুন ধরনের ফুর্তি আর আমোদের ব্যাপার আরম্ভ হলো যে, মনে হলো দূর ছাই, আর বাড়ি ফিরে কি হবে? এই তো বেশ আছি ! অফিস থেকে বাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে একটা কোথাও চেঞ্জে এসেছি। মেয়েছেলের বাড়িতে রাত্তিরে আসা এক জিনিস—আর সকাল থেকে সারাদিন সারারাত থাকা সত্যিই অন্য

জিনিস। সবই স্বাভাবিক, দয়া–মায়া–মান–অভিমান সবই আছে শুধু কোনো বন্ধন নেই। অদ্ভুত না? আমি এরকম স্বাদ আগে পাই নি। যাই হোক, পরদিন রাত্তিরে, আমি আর নূরজাহান দু'জনে দুটো ট্যাবলেট খেলাম, বীণা রাজি হয় নি। এল এস ডি খেয়ে নূরজাহানের কি কান্না! তুই বললি, ওর শরীরে শুধু লোভ? সেই কান্না যদি তুই দেখতিস! কি সব স্মৃতি ওর মনে পড়েছিল কে জানে! কিছুই বলে নি, কিন্তু পরের দিনও সারাদিন কেঁদেছে। এরপর তোদের খোঁজ করতে লাগলুম। তোকে পাওয়া গেল না, তোর বাড়িতে কে যেন মারা গেছে শুনলুম। কে মারা গেছে রে?

—দাদামশাই।

—তোর সেই বহরমপুরের দাদামশাই? আহা, বেশ ভালো লোক ছিলেন।

নিচতলা থেকে একটা অস্পষ্ট গোলমাল শোনা গেল। কে যেন শেখরের নাম ধরে ডাকছে। শেখর বললো, দাঁড়া দেখে আসি!

বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে, দূরে হাওড়া ব্রিজের মাথায় লাল আলোটা দেখা যায় এখান থেকে। অবিনাশ ব্র্যান্ডির বোতলটা প্রায় শেষ করে এনেছিল, বললো, আর একটুখানি আছে, খাবি নাকি? আমি শেষটুকু চুমুক দেবার সময় অবিনাশ বললো, তুই ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে কি করছিস রে?

আমি চমকে উঠে বললুম, কোন্ বাচ্চা মেয়ে?

—ভাবছিস টের পাই না? সব খবর পাই। তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, বাচ্চা মেয়েরা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক জিনিস। আমি শান্তাকে ছুঁতে গিয়েছিলাম, আমার দু'হাত এখনো ঝলসে আছে, দ্যাখ!

—তুই কার কথা বলছিস?

—ন্যাকামি করছিস কেন? কাল তোকে দেখলুম, একটা বাচ্চা খুকীর সঙ্গে বাসে উঠছিস ভবানীপুর থেকে। তোর চোখ মুখ দেখেই বুঝেছিলুম, তুই একটা মতলব ভাঁজছিস ওকে নিয়ে। তোকে সত্যি সাবধান করে দিচ্ছি, ওরা ডেঞ্জারাস! ওরা প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করে, যে তোর সব কথা বিশ্বাস করবে, তার কাছে তুই একটা মিথ্যে কথা বলেও পার পাবি না।

—অবিনাশ, প্লিজ, তুই ঐ মেয়েটি সম্পর্কে কিচ্ছু বলিস না!

অবিনাশ বিষম অবাক হয়ে বললো, কেন, কি ব্যাপার?

আমি বললুম, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করিস না। আমি এই একটা ব্যাপার সবার কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই।

—গোপন! —অবিনাশ বিশ্রীভাবে নেশা ধরা গলায় হাসতে লাগলো। আবার বললো, পারবি গোপন রাখতে?

—তুই অন্তত আমার পেছনে স্পাইগিরি করিস না। আমাকে কয়েকটা টাকা দে তো, আমি এখন এখান থেকে সরে পড়বো। আমার এ জায়গাটা ভালো লাগছে না।

শেখর ফিরে এসে বললো, নূরজাহান বেগম অজ্ঞান হয়ে গেছে!

কথাটা কি রকম নাটুকে ভগ্নদূতের ঘোষণার মতন, আমার হাসিই পেয়েছিল, কিন্তু অবিনাশ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন, কি ব্যাপার?

শেখর ওর হাত ধরে টান দিয়ে বললো, বিশেষ কিছু না, তুই বোস না! বুকের মধ্যে ব্যথা করছে, শরীর খারাপ লাগছে—এই রকম বলছিল, হঠাৎ ছটফট করে বিছানার ওপর গড়াতে গড়াতে জামাকাপড় খুলে ফেলার চেষ্টা করে পাগলের মতো। তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায়। বীণা খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তবে ওর সঙ্গে লোক দু'জন বললো, এরকম নাকি ওর বছর দুয়েক ধরে মাঝে মাঝেই হচ্ছে, খানিকক্ষণ ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যায়। এইজন্যই এত ঝঞ্ঝাট করে

ওকে কলকাতায় নিয়ে আসা !

আমি বললুম, কেন, ঢাকায় বুঝি চিকিৎসা হয় না এর ! সত্যি সত্যি রোগ না ন্যাকামি ?

শেখর বললো, সুনীল, তুই পুরো ব্যাপারটা না জেনেই আগে থেকে একটা ভুল ধারণা করে আছিস। সাধনা কলকাতায় এসেছে ওর ছেলেকে নিয়ে যেতে।

—ওর আবার ছেলে আছে নাকি এখানে ?

—তুই না জেনেই ওকে কেন খারাপ ভাবছিস ! অজয়বাবুর কাছে ওর ছেলেটা রয়ে গেছে। সেই ছেলের জন্যই ওর এই অসুখ। ছেলেকে না পেলে ও আর কলকাতা থেকে ফিরবে না।

—অজয়বাবু ছেলেটাকে দিতে চান না ?

—না ! সেই তো মুশকিল।

বীণা আর সাধনার পূর্ব ইতিহাস আমি অস্পষ্টভাবে জানতুম। শেখরের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিলুম এখন সম্পূর্ণটুকু। বীণাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের খুব মিল আছে। ওরাও তিন বোন, এক ভাই বুড়ো বাবা–মা'র সঙ্গে পাকিস্তান থেকে চলে আসে। এখানে ওদের কোনো আত্মীয় ছিল না, বীণার বাবা লেখাপড়াও জানতো না, বেলঘড়িয়ার একটা মুদির দোকানে কাজ নিয়েছিল বীণার বাবা, বীণার ছোট ভাই ট্রেনে ট্রেনে চানাচুর ফিরি করতে গিয়ে কাটা পড়ে। তারপর যা হয় আর কি, বাড়িতে তিনটে সমর্থ যুবতী মেয়ে, ওদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার লোক জুটতে এবং ওরাও ছিনিমিনি খেলার সামগ্রী হতে রাজি হতে বিশেষ দেরি হয় না। বাঙাল দেশের মেয়ে কলকাতা শহর দেখলে তো হকচকিয়ে যাবেই,—আমিই গিয়েছিলাম—ওদের আর দোষ কি। বাড়িতে অভাবের সংসারে দিনরাত বকুনি আর মুখঝামটা, অথচ রাস্তায় বেরুলেই ভালো ভালো পোশাক পরা লোকেরা পুজোকরা চোখে তাকিয়ে, তৈলাক্ত নাক নিয়ে কান পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে কথা বলতে এগিয়ে আসে, সুতরাং মাথা ঘুরতে দেরি হলো না। সবচেয়ে বড় বোন জ্যোৎস্না প্রথম ঝরে গেল, একদিন রাত্রে সে বাড়ি ফিরলো না, আর কোনোদিনই ফেরে নি। জ্যোৎস্নার আর কোনো সন্ধানই পায় নি ওরা। সাধনাই বরং সৌভাগ্যের মুখ দেখেছিল কিছুদিন, একটা সাবান কোম্পানির সেলসগার্লের চাকরি পেয়েছিল, সেখানেই আলাপ অজয় সেনগুপ্তের সঙ্গে। অজয় সাধনাকে ধর্মমতে বিয়ে করেছিল। বেশ সুখেই ছিল কিছুদিন, বাপ–মাকে কিছু সাহায্যও করতো তখন, বীণাকেও কাছে রেখে লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সাধনার রূপের ছটা ছিল, একটু ঘষামাজা রূপ ও ব্রেসিয়ার–ব্লাউজ পরার ফলে সেই রূপকে অনেকে ভেবেছিল দুর্লভ। এ রকম রূপ তিলজলার এঁদো গলির একতলা বাড়িতে আটকে রাখা যায় না। রূপ হচ্ছে সকলের ভোগের জন্য। সুতরাং অজয় তার রূপবতী বউকে সিনেমায় নামাবার চেষ্টা করলো। অজয়ের একজন ফটোগ্রাফার বন্ধু ছিল, সে লোভ দেখিয়ে ঘোরাঘুরি করালো কিছুদিন—দু' একটা অ্যামেচার থিয়েটারে পার্ট, দু' একটা সিনেমায় সখী কিংবা ঝিয়ের রোলে দু'এক সিন। অজয় পেলো টাকার স্বাদ, সাধনার লাগলো নেশা। এসব একেবারে ছক বাঁধা, শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, কলকাতায় এখনই এই মুহূর্তেই অন্তত তিরিশটা বাড়িতে ফটোগ্রাফার কিংবা সিনেমার দালালরা চা খেতে খেতে তিরিশজন রূপসী, নম্র, নতমুখী মেয়েকে বলছে, আঃ সিনেমায় নামলে আপনাকে যা মানাতো!—সেই তিরিশজনই অবশ্য শেষ পর্যন্ত সিনেমায় নামার যা যা আনুষঙ্গিক ও অনুপান সেগুলো শরীরে মেখে, শেষ পর্যন্ত দেয়ালের লেখায় কোনোদিন নিজের নাম খুঁজে পাবে না। সাধনাও ঐভাবেই শেষ হয়ে যেতো, হঠাৎ একটা নাটকীয় ব্যাপারে তার ভাগ্য বদলে গেল।

পাকিস্তানে বাংলা ফিল্ম তোলার জন্য নায়িকার অভাব, ওখানে তখন সদ্য ফিল্ম তোলা শুরু হচ্ছে, ঢাকা থেকে কয়েকজন ফিল্মের লোক এসেছিল কলকাতায়, সেই ফটোগ্রাফার বন্ধু

তাদের কাছে সাধনাকে চালান করে দিল। কিছুদিন হোটেলে হোটেলে খুব ফুর্তি হলো, অজয় রোজ পকেটভর্তি টাকা ও গলাভর্তি মদ নিয়ে বাড়ি ফেরে। তখনও নেহরু-লিয়াকত চুক্তি বানচাল হয়ে যায় নি, দু' দেশে অবাধ বাণিজ্য ছিল, ঠিক হয়েছিল পাকিস্তানের ফিল্ম কলকাতাতেই তৈরি হবে। কিন্তু একদিন পাখি উড়ে গেল, সাধনাকে সঙ্গে নিয়ে লোকগুলো পালিয়ে গেল ঢাকায়।

ইতিমধ্যে বীণারও সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছিল। বাড়িতে ফিল্মের নষ্ট লোকজনের অবাধ যাতায়াত, সেখানে একটি স্বাস্থ্যবতী ডবকা মেয়ে আর কতদিন অনাদরে থাকবে ! আর একটি ফটোগ্রাফার বিয়ে করার লোভ দেখিয়ে বীণাকে ঘরের বার করলো, কালীঘাটে নাকি মালা-সিঁদুরও পরিয়েছিল, সে বীণাকে নিয়ে চলে যায় দিল্লীতে। অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য জানা গেল, বর্ধমানে লোকটার নিজের বাড়িতে তিনটি বাচ্চা সমেত বেশ একটি জবরদস্ত বউ আছে। সেই লোকটা নানা পার্টিতে নিয়ে গিয়ে বীণাকে বুড়ো দাঁত-নখ উঠে যাওয়া ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিত। সেখানে নানান হাত ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌছোয় চিন্তামণি রক্ষিতের কাছে। এখন চিন্তামণি রক্ষিতের বাঁধা হয়ে ও বেশ ভালোই আছে বলতে হবে। ওর বুড়ো বাপ-মা এখনো বেলঘড়িয়ায় বীণার রোজগার খেয়েই বেঁচে আছে।

ওদিকে ঢাকায় গিয়ে সাধনার নাম বদলে হয় নূরুজাহান বেগম। 'কুড়োনো মেয়ে' ছবিতে নায়িকার পার্ট পেয়ে প্রচুর হাততালির শব্দ শোনে বুকের ভিতর পর্যন্ত। দু'এক বছরের মধ্যেই ঢাকার ছোট আকাশে সবচেয়ে জ্বলজ্বলে নকল তারা হয়ে দেখা দেয়। পুরানা পল্টনে এখন যেখানে বিশাল হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, তার কাছেই সাধনার চোখ-ধাঁধানো বাড়ি, বাড়ির নাম দিয়েছে 'নূরমহল'। নারায়ণগঞ্জে জন্ম সাধনার, ছেলেবেলায় যে ঢাকা শহরে এসে একদিনও শখ করে ঘোড়ার গাড়ি চাপতে পারে নি, এখন সেই রাস্তা দিয়ে ওর হলুদ-রঙা মোটর গাড়ি ধুলো উড়িয়ে যায়। সাধনা টাকা পেয়েছে, স্বামী হবার জন্য ব্যগ্র পুরুষ পেয়েছে, কিন্তু আর সন্তান পায় নি। ওসব জীবনের পক্ষে ছেলেমেয়ে থাকাই তো ঝঞ্ঝাট, না হয়ে তো ভালোই হয়েছে। কিন্তু ও সন্তান চায়। এখন ও নাকি ছেলের জন্য পাগল। আট বছর পর কলকাতায় এসেছে ওর প্রথম জীবনের একমাত্র ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

সব ঘটনা শুনে আমার একটুখানি বুক ছমছম করতে লাগলো। আমার তিন দিদিরই ভালো বিয়ে হয়েছে, আমাকে টেনে টেনে চানাচুর ফিরি করতে গিয়ে কাটা পড়তে হয় নি। আমি তো ভালো আছি, আমি কলকাতার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছি, আমাকে আর কেউ চিনতে পারবে না।

শেখর বললো, বীণা আমাদের এত উপকার করে, আমাদের উচিত ওর দিদিকে একটু সাহায্য করা !

আমি বললুম, এতে আমাদের কি করার আছে ?

—সাধনার টাকার অভাব নেই। প্রচুর ডলার নিয়ে এসেছে গোপনে। অজয়কে টাকা দিয়ে ভুলিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করা যেতে পারে। আর তাতে যদি রাজি না হয় তো তা হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি নীরস গলায় বললুম, শেখর, তুই এর মধ্যে খামোকা নিজেকে জড়াস নি। ব্যাপারটা বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।

শেখর সচকিত হয়ে উঠে বললো, বিপদ ! এর মধ্যে কিসের বিপদ? একজন মা তার ছেলেকে ফেরত পেতে চাইছে, এর মধ্যে অন্যায়টা আবার কী ?

অবিনাশ সব কথা শুনছিল কিনা ঠিক নেই, তবু এ সময়টা হঠাৎ মুখ তুলে বললো, কাওয়ার্ড ! আমাদের মধ্যে সুনীলটা চিরদিনই কাপুরুষ থেকে গেল ! তোর ভয় থাকে তো তুই পালা !

আমি চটে উঠে বললুম, পালাবোই তো ? আমি এর মধ্যে একটুও থাকতে চাই না। একজন ছেলে তার নিজের মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসে এখন অন্য একজন মাকে তার ছেলে খুঁজে দেবার জন্য ব্যাকুল ! আমি এর মাথামুণ্ডু বুঝি না।

শেখর প্রথম যেন আমার কথা বুঝতেই পারলো না। খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থেকে তারপর একটু হেসে বললো, ও, তুই আমার কথা বলছিস ? আমি তো মার কাছ থেকে পালাই নি। আমি তো পরশু গিয়ে মাকে বলে এসেছি, ক'দিন কলকাতার বাইরে যাচ্ছি !

—মিথ্যে কথা তো বলে এসেছিস।

—এ ঠিক মিথ্যে কথাও নয়। আসলে ক'দিন ছুটি নিয়েছি। ক'দিন আমি মায়ের ছেলে, ছোট ভাই-বোনের দাদা, অফিসের ছোট সাহেব—এইসব পোস্ট থেকে ছুটি নিয়েছি। অনেক মিলিটারি অফিসারকে দেখবি ছুটি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। চোখের নিমেষে যারা মানুষ মারতে পারে, তারা সামান্য একটা মাছ মারার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, অনেক সময় বড়শিতে ছোট মাছ উঠলে সেটাকে আবার জলে ছেড়ে দেয়, এত দয়া। সেই রকমই আর কি। ইমপারসোনেশান, অর্থাৎ মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ ধরে অন্য মানুষ হওয়া— এছাড়া জীবনে আর কোনো স্বাদ পাবার আশা নেই এখন। আমার এখানে বেশ লাগছে রে !

—যাই বলিস, সাধনাকে আমার ভালো লাগছে না। ওর ছেলেকে ফেরত নিতে আসার মধ্যে আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না, যাতে আমার কৌতূহল জাগাতে পারে। তা ছাড়া, ছেলের বয়েস এগারো বছর, তারও তো একটা মতামত আছে এখন। সেও তো তার বাবাকে ছেড়ে এই গোলমেলে স্বভাবের মায়ের কাছে আসতে না চাইতেও পারে।

—ঠিক তাই। সেইটা দেখার জন্যই আমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। এগারো বছরের ছেলে আট বছর পরে তার মাকে দেখে কী করে—সেইটে দেখার জন্যই আমি ছটফট করছি। ছেলেটা নিশ্চয়ই অনাদরে মানুষ, ময়লা হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়ায়, সেই ছেলেকে আট বছর পর দেখে তার রুপোলি পর্দা থেকে নেমে আসা জরির কাপড় পরা মার মুখ কি রকম হয়ে যায়, সেটা দেখতেও তোর কৌতূহল হয় না !

—না। আমার এসব দিকে মন নেই এখন। তোরা এর মধ্যে থাকতে পারিস, আমি উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে এখন বেঁচে যেতে চাইছি।

—পারবি বাঁচতে ?

—দেখা যাক। আমি এবার যাই। অবিনাশ, আমাকে দুটো টাকা দে।

—আজ রাত্তিরটা এখানে থেকে যা না।

—অসম্ভব !

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বীণার ঘরে একবার উঁকি দিলাম। পুরুষ দু'জন রুটি আর মাংস খাচ্ছে নিঃশব্দে। বীণা ঘরে নেই। খাটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে একটু মুচড়ে পড়ে আছে সাধনা। এখন অজ্ঞান কিংবা গভীরভাবে ঘুমন্ত, তা ঠিক বোঝা যায় না। ব্লাউজের বোতামগুলো খোলা, কালো রঙের ব্রেসিয়ার দেখা যাচ্ছে, একটা হাত নিচে, আর একটা হাত নিজের বাম বুক ছুঁয়ে আছে। শোওয়ার ভঙ্গিটা কেমন যেন অসহায়, কারুর উচিত ছিল ওকে একটু সোজা করে শুইয়ে দেওয়া। এক চোখের কোণ দিয়ে নেমে আসা মোটা জলের ধারা এখনো শুকোয় নি। শরীরের যন্ত্রণা বা যে-কোনো যন্ত্রণাতেই হোক অজ্ঞান হবার আগে মেয়েটা কেঁদেছিল ঠিকই। কাঁদুক। কান্না খারাপ নয়। কাঁদলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। যে-শিশুকে ফেলে পালিয়েছিল, তাকে ফিরে পেতে হলে তো কাঁদতে হবেই।

৬

—যমুনা আজ তোমায় গানের ইস্কুলে যেতে হবে না।

—সে কি, আজ যে আমাদের নতুন গান শেখাবে।

—শেখাক, আমি তোমাকে রেকর্ড কিনে দেবো।

—ধ্যাৎ ! 'আজি বহিছে বসন্ত পবন'— এ গানটার বুঝি রেকর্ড আছে ?

—না থাক। ওটা এমন কিছু শক্ত গান নয়, তুমি পরের দিন শিখে নিও।

—আপনি ও গানটা জানেন ?

—না, জানি না। কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার এখন কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে ! তুমি বুঝি এখনো ক্লাশ পালাতে শেখো নি ?

—শিখবো না কেন ? এই তো ক'দিন আগে কলেজে আমরা তিন–চারজন ক্লাশ থেকে কেটে পড়ে সিনেমা দেখে এলুম।

—একা একা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলে ? তোমার সাহস তো কম নয়।

—আহা, সিনেমা দেখতে আবার সাহস লাগে নাকি ? তাছাড়া আমরা তো চারজন ছিলুম।

—আচ্ছা, এসো তা হলে ঐ বাসটায় উঠে পড়ি। এখানে দাঁড়ালে তোমার গানের ক্লাশের মেয়েরা দেখে ফেলবে। তা হলে আমার লজ্জা করবে।

—কেন, আপনার লজ্জা করবে কেন ?

—তা হলে ওরা ভাববে, এই বুড়ো লোকটা তোমাকে ক্লাশে যেতে দিচ্ছে না।

—আপনি বুঝি বুড়ো ! ইস—

—তোমার সঙ্গে তুলনা করলে তো বুড়োই। চলো, বাস এসে গেছে।

—কোথায় যাবো ?

—চলো না—

যমুনাকে প্রথমে খানিকটা অসন্তুষ্ট মনে হয়, কেননা ও বেশ হন্‌হন্ করে গানের ইস্কুলে প্রায় ছুটে যাচ্ছিল, এমন সময় আমি ওকে থামিয়েছি—আমার রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য ছিল না, আমার কথায় ও ঠিক খুশি হয়েছে কিনা এখনো বুঝতে পারছি না। বাসের ভিড়ের মধ্যে পা–দানিতে আমি ওর পিছনে দাঁড়িয়ে, আমি খুব ভালো করে লক্ষ করে দেখলুম ওর ঘাড়ের কাছে একটুও ময়লা নেই। মেয়েদের যত বয়েস বাড়ে ততই ঘাড়ের কাছে ময়লা জমে। এমন কি ওর কানের ফুটোটাও কি চমৎকার, কচি শশার মতন তরতাজা, ওখানেও একটুও ময়লা নেই নিশ্চিত। খানিকটা দূর যেতে না যেতেই আমি আলতোভাবে ওর গা ছুঁয়ে বললাম, চলো নেমে পড়ি। জলের ওপরের ময়লা সরাবার মতন দু'হাত দিয়ে ভিড় সরাতে লাগলুম ওর জন্য।

নেমেই যমুনা প্রশ্ন করলো, টিকিট কাটলেন না ? আমি বললুম, না, একদিন বাসে আমি পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিলাম, কন্ডাকটার বলেছিল, খুচরো নেই, একটু পরে দিচ্ছি। দু' আঙুলের ফাঁকে নোটটা গুঁজে রেখেছিল তারপর আমি আর চাইতে ভুলে গেলুম, লোকটাও আর আমাকে দিল না। এমন পাজি ! সেইজন্য আমি ঠিক করেছি, আর কুড়িদিন বাসে টিকিট কাটবো না!

যমুনা ফুরফুর করে হাসতে লাগলো। হালকা শরীরেই হাসি মানায়। যাদের ভারি চেহারা, তাদের হাসির মধ্যে কি রকম হাতুড়ি পেটার শব্দ। আমি জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, ক্লাশ পালিয়ে আসার জন্য তোমার মন খারাপ লাগছে না তো ? তোমার ভালো লাগছে আমার সঙ্গে যেতে ? ভুরু কুঁচকে যমুনা একটু চিন্তিত ভঙ্গি করলো, তারপর ফট করে আলো জ্বালার মতন উদ্ভাসিত

মুখে বললো, খুব ভালো লাগছে। একটা ক্লাশে আর কি হবে ?

আজ একটা সূর্যমুখী রঙা শাড়ি পরেছে। নতুন শাড়ি পরতে শিখেই আধুনিক কায়দা জানা হয়ে গেছে দেখছি, ব্লাউজ ও চটির রংও হলদে। বলতে যাচ্ছিলুম যে, হলুদ শাড়িতে তোমায় খুব মানায়, কিন্তু তখনই মনে পড়লো, আগের দিন লাল রঙা শাড়িতেও তো ওকে অসম্ভব মানিয়েছিল। এক রকমের চাবি আছে নাকি যাতে সব রকমের তালা খোলা যায়, সেই রকমই এক একজনের শরীরও সব রংকে জয় করতে পারে, যমুনার সেই শরীর। অবশ্য শুধু শরীর নয়। মনের মধ্যেও একটা সব তালা খোলার মতন চাবি থাকা দরকার, মনের মধ্যে গ্লানি থাকলে সব রঙের সম্মুখীন হওয়া যায় না। সুতরাং আমি বললুম, রোজ রোজ এক একটা নতুন শাড়ি পরে আসো, তোমার অনেক জামা-কাপড় বুঝি ?

যমুনা বললো, এইটা ? এটা তো দিদির কাপড় ! আমি দিদির সব শাড়ি পরি। মেয়েদের খুব মজা, না, শাড়ি তো আর ছোটবড় হয় না। একজনেরটা আর একজন পরতে পারে, ছেলেদের জামা-প্যান্ট তো তা হয় না !

—দিদি তোমাকে সব কাপড় পরতে দেয় ? দিদি তোমাকে খুব ভালবাসে বুঝি ?

—দেবে না কেন ? দিদির তো বেশি দরকারই লাগে না। দিদিকে তো মা আজকাল বেরুতে দেন না বেশি।

বেরুতে দেন না ? কেন !

যমুনা একটু গম্ভীর হয়ে বললো, কি জানি ! বাবা রাগ করেন।

—তোমার দিদির বিয়ে হচ্ছে না কেন এখনো ?

—দিদির যে কারুকে পছন্দ হয় না। দিদি নিজেই কতবার ঠিক করলো, আবার নিজেই ভেঙে দিল।

—তোমাকে একা একা বেরুতে দেয় ?

—হুঁ-উ। আমায় মা কিচ্ছু বলেন না। কিন্তু আমায় কেউ বেড়াতেই নিয়ে যায় না। আমাদের ক্লাশের শেফালী ওর বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে কত ঘুরে বেড়ায় ! এবার আমিও গিয়ে ওকে বলবো—

আমি ধমকের সুরে বললুম, আমি তোমার বয়ফ্রেন্ড বুঝি ? খুব বাজে বাজে কথা শিখেছো—

যমুনা হাসতে হাসতে বললো, বয়ফেন্ড থাকা খারাপ ? আপনি কিচ্ছু জানেন না। আমারও বয়ফ্রেন্ড আছে, তপনদা—

—তপনদা কে ?

—ডিভিশনাল কমিশনার সেনগুপ্তর ছেলে, খুব ভালো, কিন্তু খালি খেলাধুলো নিয়েই ব্যস্ত।

—যাকগে, তুমি আমার সামনে আর তপনদার নাম বলো না।

—নাম বলবো না ? কেন ?

—কি দরকার ? যখন তপনদার সঙ্গে থাকবে— তপনদার কথা, এখন আমার সঙ্গে রয়েছো তো—

—কেন, নাম বলবো না কেন, বলুন না !

—তোমার মুখে অন্য কোনো ছেলের নাম শুনতে আমার ভালো লাগবে না। কারণ, আমি তোমায় ভালবাসি কিনা।

ক্যাথিড্রালের পাশে নির্জন রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে যমুনা আমার মুখের দিকে তাকালো। চোখের মধ্যে একটা অসহায়তা ফুটে উঠলো, মেয়ে তো, ভালবাসার ব্যাপার বুঝুক আর না বুঝুক, ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসা কথাটা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে। শুনলে চিনতে পারে। একবার যেন শরীরটা দুলে উঠলো ওর। চোখের পাতা দুটো যেন ভারি হয়ে উঠে পলক ফেললো,

স্বাভাবিকভাবে পলক উঠতে যেটুকু সময় লাগে, তার চেয়ে একটু বেশি সময় পরে চোখ খুলে ম্লান কণ্ঠে যমুনা বলল, আপনি আমায় ভালবাসেন ? সত্যি ? কী করে ভালবাসলেন ?

আমি সর্বক্ষণ যমুনার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম, বললাম, এমনিই। আসলে সেই বিয়েবাড়িতে সিঁড়ির ওপর তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আমি তোমাকে ভালবেসেছি। এতদিন একথা আমার মনে ছিল না—তাই জীবনের অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেল, এখন মনে পড়েছে।

—আপনি আমার সঙ্গে কথাই বললেন না, কিছু না, এমনি এমনিই ভালবাসা হয় বুঝি ?

—বেশি কথা বলা হলে, তারপর আর ভালবাসার কথা বলা যায় না, আমি জানি। তাই আগেই বলে নিলাম। এরপর অনেক কথা বলবো।

—সুনীলদা, আপনি আমাকে খুব ছেলেমানুষ ভাবছেন, না ? আমি মোটেই ততো ছেলেমানুষ নই, আমার বোঝার মতন বয়েস হয়েছে। আমার বয়েস...

—তোমার বয়েস সাড়ে পনেরো বছর।

—যাঃ ! আমার সতেরো বছর বয়েস, এখন সতেরো বছর তিন মাস চলছে আসলে—

—তা হতেই পারে না। তোমার সতেরো হলে আমার চৌতিরিশ হতে হয়। কিন্তু আমার যে একতিরিশ।

—এ আবার কি কথা ? এর কোনো মানে হয় না। আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন !

—মোটেই ঠাট্টা করছি না। তোমার হাতটা দাও তো, —তোমার হাত খুব গরম, পাখির বাসার মতন গরম। আমি জানতুম।

—কী জানতেন ?

—জানতুম, তোমার হাত ঘাম-ভেজা হবে না। এই রকম গরম হবে, আর থরথর করে কাঁপবে।

যমুনার মুখখানা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। মুখের মধ্যে অসংখ্য পলাতক ছবি। লাল রঙের গানের খাতাটা এমন আলতো করে ধরে আছে—যেন এখনি পড়ে যাবে। আমি ওকে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে একটা পাথরের বেদিতে বসালাম। আমার ইচ্ছে ছিল, ওকে ওপরে বসিয়ে আমি ওর পায়ের কাছে মাটিতে বসি। এসব বাড়াবাড়ি ? এইটুকু একটা কচি মেয়েকে নিয়ে বেশি বেশি আদিখ্যেতা ? কিন্তু আমি যমুনার সঙ্গে তো অসম্ভব রকমের বাড়াবাড়িই করতে চাই। যেদিন ওকে প্রথম চুমু খাবো, সেদিন, প্রকাশ্যে, চৌরঙ্গিতে, রাস্তার মাঝখানে সমস্ত ট্রাফিক থামিয়ে আকাশের তলায় যমুনাকে চুমু খাবো। কিন্তু আপাতত আমার তেমন মনের জোর নেই, কেননা চকিতে চোখ ঘুরিয়ে আমাকে আশেপাশের ভ্রাম্যমাণ মানুষদের একবার দেখে নিতেই হলো। আমি ওর পাশে একটু দূরত্ব রেখে বসলুম, যাতে ওর সঙ্গে আমার গায়ের ছোঁয়া না লাগে। এই বালিকাটি এখন চুপ করে আছে, হয়তো ওর হৃৎস্পন্দন দ্রুত। আমি আমার গোটানো জামার হাতা সম্পূর্ণ খুলে বোতাম আটকালাম। গলার কাছের বোতামটাও লাগিয়ে নিলাম, এইভাবেই তো বিচারকের সামনে বসতে হয়। এবার থেকে কোনো মন্দিরে ঢুকলেও আমি এই রকমভাবে যাবো। বললাম, যমুনা, তোমার অবাক লাগছে ? যমুনা পুরো দু'চোখে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে বললো, আমায় সত্যিই ভালবাসবেন ? আপনি সত্যি কথা বলছেন তো?

—এবার থেকে সব সত্যি কথা বলবো। জানো, সেদিন তোমায় বলেছিলাম, তোমাকে দেখে আমি বাস থেকে নেমে পড়েছি, ও কথা মিথ্যে বলেছিলাম। আসলে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

—সত্যি ? সেদিন বলেন নি কেন ?

—মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। সবাই তো মিথ্যে কথাই বলতে শিখিয়েছে আমাকে। তুমি মিথ্যে কথা বলতে শিখো না—

—দু' একটা মিথ্যে কথা বললে কিচ্ছু হয় না। সবসময় সত্যি কথা বলা কী রকম যেন বিচ্ছিরি!

যমুনাকে হাসতে দেখে আপনিই আমার ঠোঁটে হাসি এলো। আমি বললুম, এই তো হাসি ফুটছে, তোমাকে একটু গম্ভীর হতে দেখে আমার খারাপ লাগছিল। তুমি একটুও গম্ভীর থেকো না। হাসাহাসি করার জন্যই তো ভালবাসা।

—আপনি সত্যিই আমাকে ভালবাসবেন ?

—হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসবো। কিন্তু তোমার এখন আমাকে ভালবাসার দরকার নেই। তুমি তো ছেলেমানুষ, তুমি আস্তে আস্তে ভালবাসা শিখে নিও।

— আপনি আবার আমাকে ছেলেমানুষ বলছেন ?

— আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি ছেলেমানুষ নও। কিন্তু তোমার এখন ভালবাসার দরকার নেই। তোমার মুখে ভালবাসা কথাটা এখন পাকা–পাকা শোনাবে।

—কেন আমি বুঝি পারি না। আপনি একাই পারেন ?

—ও কথা এখন থাক, এর উত্তর তোমায় পরে বলবো। তুমি একটা গুনগুন করে গান করো তো।

আমি একটা সিগারেট ধরাতেই যমুনা চোখ বুজে ধোঁয়ার গন্ধ নিল। শিশুর মতন পা দোলাতে দোলাতে বললো, আমাকে একটা সিগারেট দিন তো। আমি বললুম, না, তোমাকে সিগারেট খেতে হবে না। আমার সিগারেট খুব কড়া। ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে ও বললে, ও সিগারেট আমি অনেক খেয়েছি। চোদ্দ বছর বয়েস থেকে সিগারেট খাচ্ছি আমি !

চোখ গরম করে আমি বললুম, খুব ডেঁপো মেয়ে হয়েছো দেখছি। কার সঙ্গে সিগারেট খাও?

—কলেজের মেয়েদের সঙ্গে। বাড়িতেও তো বাবার প্যাকেট থেকে চুরি করে দিদি আর আমি খাই। বাবার কিছু মনে থাকে না ? দিন না একটা।

—লোকে দেখলে কি ভাববে ?

—দেখুক গে, বয়ে গেল।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে আমি ওকে সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। বেশ পাকা ভঙ্গিতে জোরে টানতে গিয়ে দু'বার খক্‌খক্ করে কাশলো। তারপর চোখের জল সমেত হাসিমুখে বললো; আমি কিন্তু কক্ষনো কাশি না, বিশ্বাস করুন, আজ হঠাৎ—।

আমি বললুম, বুঝেছি, এই দ্যাখো এইভাবে ছাই ঝাড়তে হয়, বুড়ো আঙুলটা দিয়ে এইভাবে তলায় টুস্‌কি মারো !

ও বললো, বাবার এক বন্ধু আছেন, তাঁর ছাই ঝাড়ার সময় প্রত্যেকবার চটাস চটাস করে টুস্‌কির শব্দ হয়।

যমুনার একটা হাত প্রায় আমার উরুর ওপর, আমি খুব সূক্ষ্মভাবে একটু দূরে সরে গেলাম। না, ওর শরীরের সঙ্গে আমার শরীরের ছোঁয়া লাগা উচিত নয়। শরীর বড় সহজে শরীরকে কাছে টানে, আমি অনেক দেখেছি, আর না। কয়েকবার সিগারেটে টান দিতেই আমার একটা কথা মনে পড়লো। আমি বললাম, জানো, তোমার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম গানের ইস্কুলের সামনে দেখা হয়, সেদিন তুমি বলেছিলে, আমি জোরে জোরে কথা বলছি, তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে আমার চোখ লাল কেন ? মনে আছে ? সেদিনও আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আসলে সেদিন আমি মদ খেয়েছিলাম।

একটুও বিচলিত না হয়ে ও বললো, আপনি মদ খান বুঝি ? কেন খান ?

আমি বললুম, কী জানি, ঠিক জানি না।—সঙ্গে সঙ্গে কিছু না ভেবেই আবার বললুম, তোমার বাবা মদ খান না ?

গম্ভীর হয়ে গিয়ে যমুনা বললো, একটুও না। বাবা ভীষণ মদ খাওয়া অপছন্দ করেন। দিদির এক বন্ধু অলকেন্দুদা, তিনি মদ খান শুনে বাবা ওঁর সঙ্গে দিদিকে মিশতে বারণ করেছিলেন।

—তুমিও তা হলে আমার সঙ্গে মিশবে না ?

অকারণেই যমুনা হেসে উঠলো সশব্দে। তারপর বললো, সেদিন আমি একটুও বুঝতে পারি নি তো ? সেদিন কিন্তু আপনার কথা শুনতে খুব ভালো লাগছিল। আপনি প্রত্যেকটা কথা মন থেকে বলছিলেন। রাস্তায় অনেকের সঙ্গে দেখা হলে যে বলে, কি, কেমন আছো—কি রকম ভাসা ভাসাভাবে যেন বলে। আপনারটা সে রকম না, একটুও বুঝতে পারি নি তো যে আপনি মদ খেয়েছেন ?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, খুকুমণি, তুমি কি করে বুঝবে ?

— আবার খুকুমণি বলছেন ?

— আচ্ছা খুকুমণি নয়, তোমাকে আমি বুলবুলি বলবো।

মুখ বন্ধ রেখেও নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে এক ধরনের হাসি হয়, সেই রকম হাসি শুনিয়ে যমুনা বললো, বুলবুলি ? যাঃ—। যমুনা ওর কাঁধ আমার শরীরে লাগিয়েছে, এবার ইচ্ছে করে একটু চাপ দিল। ঐ উষ্ণ কচি শরীর আমার এতো কাছাকাছি আসা সাঙ্ঘাতিক। আমার পক্ষে, ওর পক্ষেও। আমার লোভ যদি চড়াৎ করে একবার জেগে ওঠে, আমি তাহলে হয়তো একটু নুন মাখিয়ে এক গ্লাশ জল দিয়ে ওর সমস্ত শরীরটা এক গ্রাসে গিলে খেয়ে ফেলবো। ওর পক্ষেও বিপদ, ও জানে না ওর শরীরের কথা, তাপ বিকিরণ করতে করতে সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই ওর ঐ বারুদ শরীর নিজেকে ধ্বংস করার জন্যে হঠাৎ মেতে উঠবে। না, শরীরের খেলা বড় সহজ, আমি অনেক দেখেছি, এই মেয়েটিকে আমার স্পেয়ার করা দরকার। জুতোয় ফিতে বাঁধার ছলে নিচু হতে গিয়ে আমি একটু দূরে সরে গেলাম। সেই রকম মুখ নিচু অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলাম, যমুনা, আমার সঙ্গে বসে থাকতে তোমার ভালো লাগছে ?

— হুঁ-উ। খুব। এখানে রোজ আসবো—

— না, তা হয় না। তোমার বাড়িতে জানতে পারলে বকুনি দেবে। শোনো যমুনা, আমি মদ খাই শুনে তোমার খারাপ লাগলো না আমাকে ? জানো আমি আরও অনেক খারাপ কাজ করেছি, কিংবা অনেক খারাপ ব্যাপারের মধ্যে ইচ্ছে করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয়, আমি মানুষ হিসেবে ভালো আছি বা ক্রমশ ভালো হয়ে উঠছি। ঠিক বুঝতে পারি না। তোমাকে সব বলছি, তুমি শুনে দ্যাখো তো, এরপরও আমাকে তোমার খারাপ মনে হয় কিনা ?

— কী খারাপ কাজ করেছেন, কারুকে মেরেছেন ?

আমি ভাবতে লাগলুম কখনো কারুকে মেরেছি কিনা। মনে পড়ে না। অনেককেই মারতে চেয়েছি, অনেককেই মারতে পারতুম বা খুন করা উচিত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি, যুক্তির কথা ভেবে আটকে গেছে। যুক্তির কথা উঠলে আর মারা যায় না। মানুষকে মারার সত্যিই তো কোনো যুক্তি নেই। কারুকে মারতে গেলে সেও উল্টে মারতে আসে যে,—এও এক মুশকিল। আমি আত্মরক্ষার জন্যই সতর্ক ছিলুম। হঠাৎ আমার রবির কথা মনে পড়লো। রবির মুখটা ভেসে উঠতেই মনটা ভারি হয়ে গেল। আমি বললুম, জানো, রবি বলে আমার এক বন্ধু ছিল, মরে গেছে, বোধহয় তার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।

যমুনা ব্যাকুল হয়ে উঠে বললো, না, না—

আমি বললাম, শোনো ঘটনাটা—

সেদিনকার সন্ধেবেলার প্রতিটি টুকরো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, দু'বছর আগের সেই সন্ধে আমার বিরক্ত মুখ, রবির একঘেয়ে অনুনয়, বারবার আমার হাত জড়িয়ে ধরা। রবি আমায় বলেছিল, আমায় ফেলে যাচ্ছিস ? আচ্ছা, একদিন এর শোধ নেবো!—আমি ধাক্কা মেরে রবিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। রবি আমার কলেজের বন্ধু ছিল, কলেজের পড়া অবশ্য রবি শেষ করে নি, তার মধ্যেই রবি অধঃপাতে যেতে শুরু করে। হ্যাঁ, রবিই অধঃপাতে গিয়েছিল, আমি যাই নি ! রবির সঙ্গে আমার মদের দোকানে ও নানান পাড়ায় দেখা হয়ে যেতো, তবু নিজেকে আমি কখনো রবির সমান ভাবি নি। রবির চোখেমুখে একটা চোরের ছাপ পড়েছিল। রবির হাতে কোথা থেকে অসৎ টাকা আসতে শুরু করে, পড়াশুনো ছেড়ে রবির চোখে কালো চশমা ওঠে। চেহারা সুন্দর ছিল রবির, কিন্তু কয়েক মাস বাদে বাদে যখনই ওকে দেখতুম, দেখতে পেতাম ওর চোখের কোণে ভাঁজ পড়ে যাচ্ছে, অসৎ টাকা সহ্য করার শক্তি সবার থাকে না, একটা গ্লানির ভারে নিচের দিকে নামতে থাকেই, রবির সেই অবস্থা হয়েছিল। দু'একজন লোক থাকে যাদের সঙ্গে কোনো দরকার নেই, বন্ধুত্ব নেই, দেখা হলে খুশি হই না, তবু মাঝে মাঝেই তাদের সঙ্গে দেখা হয়, রবির সঙ্গেও সেই রকম দেখা হতো, রবি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতো, ও একটা গোপন সিঁড়ি আবিষ্কার করে ফেলেছে। ধাপে ধাপে ক্রমশ চূড়ায় উঠে যাবে। কিসের চূড়ায় তা কে জানে ? একদিন মৌলালির মোড়ে সেইরকম দেখা, আমি তখন মেসে থাকি। রবির মুখখানা শুকনো ও অপ্রস্তুত, আমাকে বললো, তুই কোথায় থাকিস রে ? আমি হাত দিয়ে মেসটা দেখিয়ে দিলুম। রবি হঠাৎ কোটের পকেট থেকে একটা খাম বার করে বললো, এইটা তোর কাছে রাখ তো, এতে দু'হাজার টাকা আছে, আমি পরে নিয়ে যাবো, রেখে দে, প্লিজ!—আমি বিরক্তভাবে সরে গিয়ে বললুম, না ওসব টাকা-ফাকা আমি রাখতে পারবো না !—রবি কাঁচুমাচু মুখে বললো, একটু উপকার কর, প্লিজ ! আমি এক জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে হয় টাকাটা খরচ হয়ে যাবে, না হয় কেড়ে নেবে। প্লিজ—আমি বললুম, সেখানে না গেলেই নয় ! কিংবা বাড়িতে টাকা রেখে যা। রবি ব্যস্ত হয়ে বললো, তার সময় নেই। তুই আমার পুরোনো বন্ধু, আমার এইটুকু উপকার কর্ ভাই।

আমি রুক্ষভাবে বললুম, না, আমি মোটেই তোর বন্ধু নই। তুই তোর নিজের কাজে পার্টির লোকদের কাছে যা ! রবি আমার হাতে খামটা গুঁজে দিয়ে ঝট করে রাস্তা পার হয়ে গেল।

আমি মেসে ফিরে ব্রজেশ্বরদাকে বললুম, ব্রজেশ্বরদা, দেখুন তো কি কাণ্ড ! এমন রাগ হচ্ছে আমার রবির ওপর। ব্রজেশ্বরদা বললেন, খামটা খুলে প্রথমে গুণে দেখো, সত্যিই দু'হাজার টাকা আছে কিনা। তারপর ভালো করে দেখে নাও, ওগুলো জাল নোট কি না। যদি না হয়, তাহলে এসো দু'জনে মিলে টাকাটা খরচ করে ফেলা যাক !

আমি হতভম্ব হয়ে বললুম, খরচ করে ফেলবো কি ? এতো টাকা—

ব্রজেশ্বরদা বললেন, তা ছাড়া কী করবে ? ওসব উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ করাই ভালো ! এ টাকা কি ওর উপার্জন করা টাকা ভেবেছো ? উপার্জনের টাকা লোকে নিজের কাছে রাখতে ভয় পায় না।

আমি বললুম, এটা তো আমারও উপার্জন করা টাকা নয়। এটা ছুঁতেই বিচ্ছিরি লাগছে। ঠিক আছে, যদি খরচ করতে চান, আপনি নিন্। খামটা আমি ব্রজেশ্বরদার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। ব্রজেশ্বরদা শিউরে উঠে বলেছিলেন, না, না না, আমাকে দিও না। আমি ওর মধ্যে নেই। তুমি খরচ করলে আমি তার ভাগ নিতে পারি। যাই হোক সে টাকা খরচ করা হয় নি। দু'দিন পর

রবি এলো। আমার সামনেই খাম থেকে টাকাগুলো গুণে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। ওর ধারণা ছিল, অন্তত পঞ্চাশ কি একশো টাকা ওর থেকে আমি খরচ করে ফেলবোই, সেজন্য ও প্রস্তুতই ছিল, করি নি যখন, তখন আমি নাকি একটা মহাপুরুষ। শুনে আমার গা জ্বলে গেল। আমি কড়া গলায় বললুম, দ্যাখ রবি, এরপর আবার কোনোদিন আমার সঙ্গে এরকম কাণ্ড করতে এলে মুশকিল হবে বলে দিচ্ছি। তুই খবরদার আমার কাছে আর কখনো আসবি না।—রবি বিচলিত হলো না, বললো, তুই এই পেনটা রাখ, তোকে এমনিই দিলাম, আসল জার্মানির জিনিস। আমি বললাম, না, চাই না, আমার পেন আছে। ও বললো, রাখ না, একটা উপহার। আমি পেনটা নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তিক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, ফেলে দেবো রাস্তায় ? এই নে তোর জিনিস, যা ভাগ এখান থেকে !

কিন্তু রবির সঙ্গে এরপরেও হঠাৎ দেখা হলেই ও সাগ্রহে এগিয়ে আসে, সঙ্গে বন্ধু থাকলে আলাপ করিয়ে দেয়, কোথাও বসে পানাহার করার জন্য টানাটানি করে। রবিকে দেখলেই আমার বিরক্ত লাগে—এই রকম অবস্থা।

একদিন রবির সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে আমার দেখা হলো। রবি তখন টং মাতাল। সেদিন আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, সেদিন সন্ধেবেলা অনেকক্ষণ মনীষাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেও মনীষার দেখা পাই নি। মনীষার দুর্বোধ্যতা আমাকে ক্রমশ বিমর্ষ করে তুলেছিল। আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের খুঁজতে গিয়েছিলাম, তারা কেউ ছিল না, কিন্তু রবিকে দেখতে পেলাম। রবিকে দেখেই আমি সরে পড়ার চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু ও আমাকে দেখতে পেয়ে টলতে টলতে ছুটে এলো, জড়িয়ে ধরে বললো, আয়, আজ তোকে আমাদের সঙ্গে খেতে হবে। চল্ আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, এই তিনজন আমার বন্ধু, জাহাজের ক্লিয়ারিং এজেন্ট, মস্তো লোক—। আমি বললুম, না, আমি একজনকে খুঁজতে এসেছিলুম, চলে যাবো।—রবি আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো, আয় না, ওরা ভালো লোক, তোর যদি কখনো বিলিতি ঘড়ি কিংবা ট্রানজিস্টার দরকার হয় বলিস, ওদের কাছ থেকে—আয় না।—আমি গলার স্বরটা একটু নরম করে বললুম, তোকে আর খেতে হবে না। তোর যা অবস্থা, এবার বাড়ি যা।—

রবি চোখ পাকিয়ে বললো, চোপ্, আজ তোকে পেয়েছি, আজ বিরাট পার্টি হবে। কতখানি বল্? তোর যা ইচ্ছে, তোর যা মন চায়, বুঝলি, তোর যা মন চায় খুলে বল্, সব দেখে, বুঝলি, আজ মাইরি... ধৈর্য রেখে আমি তবু বললুম, বাড়ি যা না, ভালো কথা বলছি।—রবি আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললো, তুই আমায় বাড়ি পৌঁছে দিবি ? আমি একা আজ যেতে পারবো না, আমার পকেটে অনেক টাকা... ও শালাদের আমি বিশ্বাস করি না, অনেক টাকা... মাইরি, তুই আমায় আজ দেখিস, তোর পায়ে ধরছি।—কিছুতেই এড়াতে না পেরে আমি ওদের টেবিলে গিয়ে বসেছিলাম, ওর বন্ধু তিনজনই সব মধ্যবয়স্ক, পরনে দামী পোশাক, কিন্তু কি রকম যেন নিষ্ঠুর মুখ। যখন নীরব থাকে—তখন চোয়ালগুলো শক্ত দেখায়—এরকম শক্ত মানুষ আমি অনেক দেখেছি, এদের আমার পছন্দ হয় না। আমি এক গ্লাস খেয়েই উঠে পড়ার চেষ্টা করলুম, কেন না, ওদের কথাবার্তা সম্পূর্ণ অন্যজাতের, যখন 'জাহাজ' কথাটা উচ্চারণ করে তখন যেন সম্পূর্ণ জাহাজের ছবি ওদের মনে পড়ে ভাসে না, জাহাজের একটা অংশের কথা ওদের চোখে ভাসে শুধু। রবি আমার হাত ধরে বললো, বোস্ না, মাইরি, আজ ফোয়ারা ছোটাবো... যাবি না। আমাকে তুই বাড়ি পৌঁছে দিবি ! রবি পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে আবার অর্ডার দিল—কিন্তু সেদিন আমার নিজস্ব মন খারাপ ছিল, মনীষার কথা ভেবে বারবার বুকের ভেতরটা অপমানিত দুঃখে মুচড়ে উঠছিল, ওখানে আমার একটুও মন বসছিল না, আমি বাথরুমে যাবার নাম করে পালাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু আমার প্রতিই রবির সেদিন সম্পূর্ণ নজর, দরজার কাছে

গিয়ে আমাকে আবার ধরলো, এমন টলছিল যে দোকানের সবাই হাসছে, রবির চোখ মুখ টকটকে লাল, কপালের পাশে শিরা ফুলে উঠছে, পাগলের মতন বিড়বিড় করছে। ওর এখানে থাকতেও ভয় করছে, অথচ যেতেও চায় না, বললো, তুই পৌঁছে দিবি—ওদের হাতে ফেলে যাচ্ছিস, ওরা ডেঞ্জারাস... এক সঙ্গে যাবো। মাইরি, আজ তোতে আমাতে এক সঙ্গে, আয় না, কিছুই তো খাস নি, আয় না, আজ প্রচুর খাবো, তোর সঙ্গে, বাড়ি পৌঁছে দিবি তো ? আমি রুক্ষভাবে বললুম, যাবি তো এখন চল্, আমি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি !—রবি যেতে চায় না, আমাকেও ধরে রাখতে চায়, ঐ লোকগুলোকে বিপজ্জনক মনে করেও কেন ও ওদের সঙ্গে বসে থাকতে চায় কে জানে। আমি বললুম, তোর যা ইচ্ছে কর্, আমি আর বসবো না ! রবি তবু আমাকে শক্ত আঙুলে ধরে রইলো। ধৈর্য শেষ হওয়ায় আমি রবিকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিলাম। টলে গিয়ে পড়তে পড়তে দেয়াল ধরে ঘোলাটে চোখে বললো, তুই আমাকে ঠেলে দিলি, আচ্ছা শালা, দেখে নেবো একদিন... আমায় ফেলে যাচ্ছিস্ যা, একদিন এর শোধ নেবো—

—জানো, যমুনা, তার দু'তিনদিন পর আমি আবার সেই দোকানটায় গেছি, রবির সেই তিনজন বন্ধু বসেছিল, একজন আমায় বললো, আপনার বন্ধু রবির খবর শুনেছেন ? আমি জিজ্ঞেস করলুম, কি খবর ? একজন চোখ বুজে হাতের তালু উল্টে দেখালো। আমি জিজ্ঞেস করলুম, কি ? একজন বললো, রবি মারা গেছে। শুনে প্রথমটা আমার কিছুই মনে হয় নি। স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করলুম, কী করে ? সেই লোকটা বললো, সেদিন একেবারে পোঁচি মাতাল হয়ে গিয়েছিল। আমরা বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলুম, বিশ্বাস করলো না, দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা—একেবারে ঘিলুফিলু বেরিয়ে ফর্দাফাঁই ! পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে সগ্যে চলেছে।—শুনে, সত্যি কথা বলছি তোমায় প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, যাক্ বাঁচা গেছে, একটা পাপ চুকেছে। তাকিয়ে দেখি লোক তিনটের চিবুক সেদিন কঠিন নয়, খুব মসৃণ, তিনজনেই মাথা নিচু করে আছে, ওদের টেবিলে একটা খালি চেয়ার। মনে হল যেন, রবির ছায়ামূর্তি সেখানে বসে আছে। আমি ওখান থেকে চলে এলুম, তখনও আমার কিছু মনে হয় নি। অন্য টেবিলে বসে অন্য গল্প করছিলুম। একটু বাদে বাথরুমে গিয়ে দেখি, ইয়ে, মানে পেচ্ছাপখানার দেয়ালে পেন্সিল দিয়ে বড় বড় করে লেখা 'রবি আর নাই।' ওর বন্ধুদেরই কেউ পেন্সিল দিয়ে লিখেছে। আমার হঠাৎ যখন চোখে পড়লো, 'রবি আর নাই' আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠলো। আর একটু হলে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যেতুম। হঠাৎ মনে হলো আমিই দায়ী। আমি যদি সেদিন রবিকে বাড়ি পৌঁছে দিতুম, তাহলে বোধহয় ও মরতো না। কিংবা ও এই রকমভাবেই মরতো একদিন না একদিন, কিন্তু সেইদিনটা তো অন্তত বাঁচতে পারতো। আমি ইচ্ছে করলেই ওকে একটা দিন বেশি বাঁচিয়ে রাখতে পারতুম ঠিকই। কিন্তু সেদিন যে আমার ইচ্ছে হয় নি। এজন্য আমি দায়ী ? জানো, রবির কথা ভাবলেই আমার বিষম কষ্ট হয় একথা আমি কারুকে বলি নি, কিন্তু মনে হয় এজন্য আমাকে একদিন শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু, দোষ করলেও আমি না জেনে করেছি, ও সেদিন বোধহয় বুঝতে পেরেছিল মৃত্যুর কথা, সেইজন্য আমাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ওকে আশ্রয় দিই নি, আমি ওকে সাহায্য করি নি, আমি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলাম, এত কষ্ট হয় ভাবলে !

যমুনা দু'হাত দিয়ে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বললো, ও কি, আপনি ওরকম করছেন কেন ? থাক, আর বলতে হবে না—

আমি ওর দিকে ফিরে বললাম, বলো, আমার দোষ ? না, আসল দোষ মনীষার ? মনীষা আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল বলেই তো সেদিন আমি অন্য মানুষের কথা ভাবতে পারি নি।—যমুনা চুপ করে রইলো। আমি আবার বললাম, বলো, কার দোষ ? যমুনা কাঁপা গলায় বললো,

জানি না ! আমি কি করে জানবো ?

ওর গলার আওয়াজ শুনে আমার কিরকম যেন মনে হল, অন্ধকারে আমি এক আঙুলে ওর চিবুকটা তুলে ধরলাম। কলাগাছের একেবারে ডগায় যে পাতাটা থাকে, সেই পাতার মতন নরম পবিত্র মুখ যমুনার, সেই মুখে দু'ফোঁটা শিশিরের মতন চোখের জল। আমি সচকিত হয়ে উঠে বললুম, তুমি কাঁদছো !

— না তো। আপনি এমনভাবে বলছিলেন, আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল লোকটার জন্য।

— আরে ধ্যাৎ ! এসো, আমি তোমার মুখটা মুছে দিই—না, থাক্, তুমিই তোমার মুখটা মুছে নাও ভালো করে।

রবির জন্য আমি কখনো কাঁদি নি। কাঁদতে তো ভুলেই গেছি বলা যায়। রবির জন্য যমুনাকে কাঁদতে দেখে আমার বুকটা অনেকটা হালকা হয়ে গেল। রবির মৃত্যু একেবারে অবহেলিত রইলো না, রবি আর একদিনের জন্য বেঁচে গেল। রবির জন্য আমার কষ্টটা মিলিয়ে গিয়ে যমুনার জন্যই কষ্ট হলো। কেন আমি এই শিশুটিকে কাঁদালুম ! কিংবা, কান্নায় বোধহয় কোনো কষ্ট নেই, সুখই আসলে।

মুখ মুছে যমুনা বললো, সুনীলদা, আপনি আর ওখানে কখনো যাবেন না।

— কোথায় ?

— ঐ দোকানটায়।

— না, আর কখনো যাই নি, যাবোও না। চলো, এবার উঠে পড়ি, এবার তোমার বাড়ি ফেরা উচিত।

উঠে, নিঃশব্দে কয়েক পা এগুবার পর, যমুনা জিজ্ঞেস করলো, মনীষা কে ?—আমি বললুম, ও একটা মেয়ে। ভারি পাজি। ওর কথা তোমাকে পরে বলবো।—বলতে বলতেই দুদ্দাড় করে বৃষ্টি এসে গেল বড় বড় ফোঁটায়। তখন আমরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বললুম, ছুটতে পারবে ? এসো !—যমুনা হরিণীর মতন তর তর করে ছুটতে লাগলো, গানের খাতাটা ছিটকে পড়ে গেল হাত থেকে, আমি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে, দু'জনে হাত ধরাধরি করে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে একটা গাছের নিচে দাঁড়ালাম। বেশি ভিজি নি, রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললাম, তোমাকে বাড়িতে বকুনি দেবে আজ। যমুনা কিন্তু বেশ মজা পেয়েছে, একটু আগেই কান্নার মুখ সরিয়ে ফেলে, হাসিতে শরীর ছটফট করছে, আমার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে চায়। অজান্তেই নিশ্চিত। ওকে বুঝতে না দিয়ে আমি সরে যেতে লাগলুম। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎই বৃষ্টি চলে গেল।

গাছতলা থেকে একটু এগিয়ে যেতেই কয়েকটা চোঙা প্যান্ট পরা ছেলে আমাদের দিকে একটা কুৎসিত মন্তব্য করলো। আমি আড়চোখে দেখে নিলুম, ওরা কদাকার পাঁচ-ছ'জন। না শোনার ভান করেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। যমুনা বললো, কি অসভ্য কথা বলে ! আমি থমকে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি ওর সব ক'টা কথার মানে বুঝেছো ? যমুনা উত্তর দিল না। মুখ দেখেই জানলুম, ও বুঝেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাগে আমার শরীর শক্ত হয়ে গেল, ছেলেগুলোর প্রত্যেকটার মুণ্ডু ছিঁড়ে গেণ্ডুয়া খেলার ইচ্ছে হলো আমার। ফিরেও দাঁড়িয়েছিলাম, ছেলেগুলো তখন অন্য কথা বলতে বলতে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করেছে, হয়তো আমাদের কি বলেছে—এর মধ্যেই ভুলে গেছে। এই রকমই তো আত্মবিস্মৃত ওরা, কোথায় কি ঘটে যাচ্ছে কিছুই জানে না, পাগলের মতন যা খুশি বলে যায়। কিন্তু ওরাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ। খানিকটা সাহসের অভাবে, খানিকটা নাটক করার প্রতি বিতৃষ্ণায় আমি আর ওদের ঘাঁটালুম না। শরীর আবার সহজ করে নিয়ে যমুনার পাশে আবার হাঁটতে হাঁটতে একটা কথা জানার জন্য আমার খুবই কৌতূহল হলো। আমি ওকে

ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, তোমায় কেউ কখনো চুমু খেয়েছে ?

যমুনা মুখ তুলে বললো, যাঃ—

— বলো না, লজ্জা কি ?

— যাঃ ! আপনি এমন।

আমি ওর খুব কাছে সরে এসে বললুম, এমনি জিজ্ঞেস করছি, বললে কিছু হবে না !

মুখ সামান্য লাল হয়ে গেল ওর। আদরের ভঙ্গি করে বললো, না—আ—

আমি আবার বললুম,—বলো না। এতে লজ্জার কী আছে ?

— না—হ্যাঁ।

— কে ?

— তপনদা।

— আর কিছু ?

— আর কি ?

— না কিছু না। ঠিক আছে, ওতে কোনো দোষ নেই। তুমি খুব ভালো মেয়ে।

যমুনা হাসতে হাসতে বললো, আপনি যা ভাবছেন, আমি কিন্তু মোটেই তেমন ভালো মেয়ে নই !

আমিও ওর কাঁধে আলতোভাবে ছুঁয়ে দিয়ে বললুম, বুলবুলি, আমি তো আর তোমাকে সে রকম ভালো ভাবছি না। তুমি একটা অন্য রকমের ভালো মেয়ে !

সঙ্গীতের প্রতি আমার এমন কিছু মমতা নেই যে, আমি ভাববো যমুনা কয়েকখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত না শিখলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে। সুতরাং আমি যমুনাকে গানের ক্লাশে যাবার পথ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে লাগলুম। এমনকি একদিন ওর দুপুরের কলেজ থেকেও ওকে কাটিয়ে নিয়ে ঘুরে এলুম ব্যারাকপুর। যমুনার কোনো ভয়-ডর নেই, এইভাবে লুকিয়ে বেড়াতে যাবার মধ্যে ও একটা নিষিদ্ধ আনন্দের স্বাদ পেয়ে ঝলমলিয়ে উঠেছে। ওর চঞ্চল হাসিখুশি ও ছড়ার ছন্দের মতন কথাবার্তা আমাকে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করে তুলতে লাগলো। পৃথিবীর কোনো কথা শুনতেই ও ভয় পায় না, কোনো বস্তু সম্পর্কেই ও আগে থেকে খারাপ বা ভালো ধারণা করে রাখে নি, বরং মাঝে মাঝে পূর্ণ বিস্ময়ময় চোখ তুলে বলে, তাই নাকি ? সত্যি ? আমি ওকে একদিন নূরজাহান বেগমের ঘটনাটাও শুনিয়ে দিলুম। কিন্তু নূরজাহানের ব্যাপারটা ও ভালো বুঝতে পারলো না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ছেলেকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল কেন ? আমি বললুম, সেইটাই তো মুশকিল। যমুনা বললো, একবার বিয়ে করলে আবার বিয়ে করা যায় ? ও হ্যাঁ, ক্রিশ্চানদের হয় শুনেছি।

— আজকাল সবারই হয়।

— আচ্ছা, বিয়ে করলেই তো ছেলেমেয়ে হয়। আবার বিয়ে করেছে যখন, তবে আবার ছেলেমেয়ে হলো না কেন ?

এখুনি একথার উত্তর যমুনার জেনে যাওয়া ভালো কি না আমি এক মুহূর্ত ভাবলুম। তারপর মনে হলো এখন থাক্‌। বললুম, তা হয় বটে, কিন্তু ওর তো আর হয় নি।

যমুনা বললো, আচ্ছা, ওর যদি আবার ছেলেমেয়ে হতো, তাহলেও কি এই আগের ছেলেটার জন্য ফিরে আসতো ?

এ প্রশ্নটা খুবই দুর্বোধ্য, সুতরাং বেশি ভাবার চেষ্টা না করে আমি বললুম, কি জানি !

যমুনার সংস্পর্শে এসে আমার মন প্রত্যেকদিন হাল্‌কাতর হয়ে আসতে লাগলো, বহুদিন পর সরলভাবে খুশি হতে লাগলুম আমি, যমুনার কথায় অবাক হওয়া দেখে, আমারও মনে হতে লাগলো, পৃথিবীতে আমারও অবাক হবার মতো এখনো অনেক কিছু আছে। এখন আমি সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় এক সঙ্গে দু'তিন ধাপ পেরিয়ে যাই, ট্রামে বাসে মানুষের ভিড় দেখলে আর রাগ হয় না, এমনকি দেশের খাদ্যসমস্যা অচিরে মিটে যাবে এ রকম মনে হয়। বৃষ্টি পড়লে মনে হয়, আজকের দিনটা খুব সুন্দর, কোনোদিন চচ্চড়ে রোদ উঠলেও হয়, আঃ আজকের দিনটা কি সুন্দর।

এর মধ্যে আমি যমুনার হাত ধরেছি শুধু, শরীর ধরি নি। ব্যারাকপুরে রেলের নির্জন ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠেও চুম্বন করি নি। ম্যাজিশিয়ানের মতন আমি ওর বুকের সামনে হাত ঘুরিয়েছি, কিন্তু ছুঁই নি। ওর তপনদা ওকে চুমু খাক, ওর তপনদা সাঁতার শেখাবার নাম করে লেকের সুইমিং ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ওর নবীন শালগমের মতন বুক দেখুক একদিন না একদিন। আমার ওসব দরকার নেই এখন। যমুনা কখনো না জেনে, অচেতনভাবে, নেহাৎ প্রাকৃতিক কারসাজিতে আমার খুব কাছে আসতে চেয়েছে, আমি তেল আর জলের মতন ওর সঙ্গে মিশ খাই নি। পুরুষের শরীরে আদিমতা আছে, কিন্তু আত্মঘাতের বীজ নেই। মেয়েদের শরীর সাঙ্ঘাতিক ! হয়তো অবান্তর, তবু রামকৃষ্ণের একটা কথা আমার মনে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন, ও কে, তা ও নিজে জানে না। যেদিন জানতে পারবে, সেদিন আর ও মানুষের মধ্যে থাকবে না। তেমনি আমার মনে হয়, মেয়েরা নিজের শরীর সম্পর্কে প্রথমে কিছুই জানে না, যেদিন জানতে পারে সেদিনই দেবীত্ব বিসর্জন দিয়ে শুধু মেয়ে হয়ে যায়। মেয়ে তো অনেক দেখা হলো, এবার কিছুদিন দৈব সংসর্গে আত্মাকে শুদ্ধ করে নেওয়া যাক। যে ক'দিন পারা যায়।

কিন্তু জীবনটা বড় শক্ত। আমি ঠিক যে-রকম বা যে-টুকু চাইবো, তাই যে আমি পাবো, তার কোনো মানে নেই। অন্য কোথায় কতজনের প্রাপ্য হয়তো আমি মেটাই নি। যা-যা করেছি, তার ভালোমন্দের বিচার হতে পারে হয়তো, কিন্তু যা-যা করি নি কখনো ?

একদিন ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে যমুনা আমাকে বললো, সুনীলদা, আপনি আমাকে ভালবাসেন বলেছিলেন, মোটেই সে কথা সত্যি নয় ! আমি হঠাৎ ও কথা শুনে অবাক হয়ে বললুম, কেন ?

— আপনি আমাকে একটাও চিঠি লেখেন নি।

— চিঠি লিখবো কেন ? তোমার সঙ্গে একদিন অন্তর দেখা হয়, তবে চিঠি কিসের ?

— কিন্তু, তপনদা তো আমাকে চিঠি লিখেছে ! এই দেখুন ! দুটো বানান ভুল, তিনটে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছে বটে, কিন্তু তপন চিঠিটা বেশ ভালোই লিখেছে। বেশ আবেগময় এবং ভুল আবেগ কম। চিঠিটা পড়ে আমি হাসিমুখে যমুনার দিকে তাকালুম।

বিষম চিন্তিতের মতন যমুনার ভুরু কুঁচকোনো, বললো, আমি এখন কি করি বলুন তো ? ওর ঐ কচি মুখে অমন দুশ্চিন্তা দেখে আমার সত্যিই হাসি পায়। আমি আঙুল তুলে আলতোভাবে ওর ভুরুতে বুলিয়ে দিয়ে বলি বুলবুলি, তোমার এখন কিছু ভাবতে হবে না। তোমার অনেক ভালবাসা দরকার। আমি একা আর কতটা পারবো ? আরো অনেকে তোমাকে ভালবাসুক। কিন্তু আমার শুধু তোমাকেই দরকার। আমার অনেকটা ক্ষয় হয়ে গেছে তো !

যমুনা দুর্বোধ্যভাবে তাকিয়ে থেকে আবার সেই রকমই দুর্বোধ্যভাবে হাসলো। মুখ নিচু করে বললো, আপনিও তো আগে অনেককে ভালবেসেছেন ?

আমি বললুম, উঁহু ! আমি কারুকে ভালবাসতে পারি নি আগে। কারুর কাছে নিজের কথা বলতেই পারলুম না। কিন্তু তোমায় বলেছি না, তুমি ভালবাসার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না!

এইটুকু মেয়ের মুখে ভালবাসার কথা খুব পাকা-পাকা শোনায় !

— বারবার আমাকে এইটুকু মেয়ে, এইটুকু মেয়ে বলবেন না, বলছি।

— ওঃ, কি বড় হবার শখ ! যখন সত্যি বড় হয়ে উঠবে, তখন দেখবো নিজেকে এইটুকু মেয়ে সাজাবার কী চেষ্টা। তোমার দিদি যেমন ! যমুনা এবার অকপটে হাসতে হাসতে বললো, সত্যি দিদিটা যেন কি ! বাড়ি থেকে তো বেরুতে পারে না, সারাদিন তাই শুধু টেলিফোন করে! আর কি সব বিচ্ছিরি কথা !

— কাকে টেলিফোন করে ?

— ওর সব বন্ধুদের। আমার ভালো লাগে না ! আমার নামে আবার বাবার কাছে খুব লাগায়।

— কী লাগায় ?

— কে জানে ? সুনীলদা, আমি দিদির মতন মোটেই হবো না !

আমি চোখ দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ আদর করে বলি, তুমি যে-রকম আছো, ঠিক সেই রকম থাকো।

৭

বন্ধু-বান্ধবদের আমি এ ক'দিন খুব কায়দা করে এড়িয়ে যাচ্ছিলুম। সুবিমল ও অবিনাশকে কাটাবার জন্য প্রত্যেকদিন সকালবেলা উঠে আমাকে নতুন নতুন পরিকল্পনা ভাবতে হয়। শেখর এখন বীণা আর নূরজাহানের সঙ্গে কী কাণ্ড নিয়ে জড়িয়ে আছে, তা জানতে আমার একটুও কৌতূহল হয় না। একদিন পরিতোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল শুধু। রাস্তা দিয়ে ছাত্রদের একটা মিছিল, ভিড়ের মধ্যেও আমাকে দেখতে পেয়ে পরিতোষ মিছিল থেকে বেরিয়ে আসে। মুখে সেই ইকনমিকসের ছাত্রসুলভ প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। যেন ওর অস্তিত্ব পৃথিবী বা ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়, আর আমাদের তো থাকলেও হয়, কিংবা না থাকলেও ক্ষতি নেই। আঙুল দিয়ে টিপে চশমাটা সোজা করে পরিতোষ আগের মতই তীব্র অভিমানভরা স্বরে বলে, সুনীলদা, দাদাকে বলবেন একটা মুখোশ কিনে পরতে ! আমি কাষ্ঠহাস্যে বলেছিলুম, কেন, শেখরের আবার কী হয়েছে ?

পরিতোষ বললো, দাদা বাড়িতে বলে গেছে তিন সপ্তাহের জন্য আসামে বেড়াতে যাচ্ছে। কিন্তু পরশুদিন গণেশ এভিনিউয়ের কাছাকাছি দাদাকে একটা ট্যাক্সিতে দেখা গেছে, সঙ্গে একটা বাঈজি চেহারার মেয়ে ছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

আমি এবার বেশ ধমকে বললাম, পরিতোষ, তোমার দাদা কি করে না করে সেটা তুমি আমাকে বলতে আসো কেন ? আমি তার জন্য দায়ী ?

— না, আপনি মাকে কি সব কথা দিয়ে এসেছেন, শুনলাম !

— আমি যা কথা দিয়েছি, তা আমি বুঝবো। তুমি এর মধ্যে মাথা গলাতে এসো না—

পরিতোষ আর বাক্যব্যয় না করে ফিরে যায়। বেশ জোরে জোরে পা ফেলে গিয়ে আবার মিছিলের মধ্যে নিজের জায়গায় ঢুকে পড়ে ও চিৎকার করে দাবি জানাতে থাকে।

পরিতোষজনিত অস্বস্তি মন থেকে মুছে ফেলে আমি যমুনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছুটে যাই। অস্বস্তি, বিরক্তি, ঝঞ্ঝাট, যন্ত্রণা—ধ্যাৎতেরি ! আমাকে বাঁচতে হবে তো ! গানের ইস্কুলের সামনে থেকে যমুনাকে তুলে নিয়ে ঝট করে একটা ট্যাক্সি ধরে সাঁ করে চলে আসি গঙ্গার ধারে। ওর হাত ধরে প্রায় ছুটে যাওয়ার মতন ভাবে জেটির দিকে নামতে নামতে বলি, এসো, যমুনা, আমরা লুকোচুরি খেলি। অনেকে আমাদের খুঁজছে, আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি !—যমুনা

জিজ্ঞেস করলো, কারা খুঁজছে ?—আমি বললুম, ভিঁড়ের প্রত্যেকটা লোক, শহরসুদ্ধ সবাই !—এরকম ছুটোছুটি করতে যমুনার ভালো লাগে। ও জিজ্ঞেস করে, মনীষা কে ? আপনি পরে বলবেন বলেছিলেন ? আমি ওর বেণী ধরে একটা হ্যাঁচটা টান মেরে বলি, এত জানার ইচ্ছে কেন খুকী ! বড় হয়ে উঠছো বুঝি ? যমুনা রাগ করে বলে, এই লাগছে, লাগছে। চুলে হাত দেবেন না বলছি ! বলুন না, কে ? আমি বললুম, মনীষা হচ্ছে কলকাতা শহরের একটা মেয়ে, যে আমাকে ভিড়ের মধ্যে খুব আপন করে নিতে চায়, কিন্তু কিছুতেই একা একা ওর সঙ্গে মনের কথা বলার সুযোগ দেবে না। কলকাতা শহরটাই এরকম। ভাগ্যিস, আমি তোমার দেখা পেয়েছিলাম !—যমুনা তখন আমার হাতের পাঞ্জা ছেড়ে দিয়ে বাহু ধরতে চায়। ওর শরীর ক্রমশ বেশি তপ্ত। আমি সেই মুহূর্তে সিগারেট কেনার অছিলায় ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাই। দূর থেকে তাকিয়ে দেখি, ওর মুখে একটা দুর্বোধ্য আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। এই একটা সমস্যা, এ নিয়ে কি করবো এখন বুঝতে পারি না। যমুনাকে আদর করার জন্য আমারও তো শরীর ভর্তি আদর অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখুনি কি তার ব্যবহার করবো ? আগে অন্যদের সঙ্গে শরীরের ভাষা ব্যবহার করে দেখেছি, পরে আর অন্য ভাষা খুঁজে পাই নি। খুব আত্মগোপন করতে ইচ্ছে হয়েছে। এখন অন্য কথাগুলো বলার আগেই কি শরীরের ভাষায় কথা বলা ঠিক হবে ?

যমুনাকে নিয়ে এখন আমি কী করবো ? এখন আমার কোনো নেশা নেই, সমস্যা নেই, বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা কিংবা পাপবোধ নেই, যমুনা আমাকে প্রভূত উল্লাস এনে দিয়েছে। যমুনা বুঝুক বা না বুঝুক ওর আয়ত চোখের সামনে বসে আমি অনেক কথা বলতে পারি। কখনো কান্নায় ওর চোখ টলটল করে উঠেছে, কখনো হাসিতে ভেঙে পড়ে ও বলছে, যাঃ, আপনি বানিয়ে বানিয়ে সব কথা বলছেন !—হ্যাঁ, একথা ঠিক, আমি এখনো কিছু কিছু বানিয়ে বলছি ওর কাছে। অথবা বলার সুরের মধ্যে নিজেকে কিছুটা বড় করার চেষ্টা আছে। কিন্তু আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আমি ক্রমশ সৎ হয়ে উঠবো নিশ্চিত। কিন্তু এরকম তো বেশিদিন চলা সম্ভব নয়, আমি মনে মনে টের পাচ্ছি, জীবন তো এই জায়গায় থেমে থাকবে না। আহা, যদি থাকতো কোনোরকমে!

একদিন গানের ইস্কুলের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, যমুনার সঙ্গে সরস্বতীও এসে নামলো বাস থেকে। যমুনার মুখ একটু ভয় মাখানো ও শুকনো। তখন আমার পালাবারও সময় নেই, সরস্বতী আমাকে দেখে ফেলেছে। সরস্বতী বললো, কী ব্যাপার আপনি এখানে ? আমি উদাসভাবে বললাম, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় যাবো ভাবছিলাম।

সরস্বতী বললো, তুই যা মুন্নি, আমি আবার আটটার সময় এসে তোকে নিয়ে যাবো।

যমুনা বললো, মা তোমাকে ছোট মামার বাড়িতে যেতে বলেছে, তুমি খবরটা দিয়ে এসো ঠিক !

সরস্বতী ধমকে উঠলো, তুই যা না ! সে আমি বুঝবো।

যমুনা চলে যেতেই সরস্বতী আমার দিকে ফিরে বললো, চলুন !

আমি আড়ষ্টভাবে বললুম, কোথায় ?

—চলুন না, কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। পার্ক স্ট্রিটে যাবেন ? অনেকদিন এসপ্রেসো কফি খাই নি। খাওয়াবেন ?

নিজের গালে আমার চড় কষাতে ইচ্ছে হলো। কেন প্রথমেই বললুম, কোথায় যাবো ভাবছি! নইলে তো অনায়াসেই বলা যেতো, আমার বিশেষ কাজ আছে, ট্যাক্সির জন্য দাঁড়িয়েছিলাম ! এই সব ছোটখাটো ভুলগুলো কিছুতেই আমি সামলাতে পারি না। সরস্বতী খুব উগ্র পরিচ্ছদ ও হাই হিল পরে এসেছে। এই মেয়েকে কি কেউ সুন্দরী বলবে ? রাস্তার বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে যাচ্ছে অবশ্য, তাতে কিছু আসে যায় না। আমিও তো রানী থেকে মেথরানী কারুকেই না দেখে ছাড়ি না, প্রথমে মুখ ও সঙ্গে সঙ্গে দুই বুক, তারপর সর্বাঙ্গ ও আবার মুখে চোখ রাখি যদি পছন্দ হয়, রিপিট, যেরকমভাবে মেয়ে দেখা নিয়ম। সরস্বতীর বুক ও নাক উদ্ধত, অনাবশ্যক গর্ব ওর বাহুর ভঙ্গীতে ও চিবুকের নিচে। ব্লাউজটা স্বচ্ছ, ভিতরে ব্রেসিয়ার দেখা যায়। আমি ওর বুকের দিকে চোখ ফেলেছি লক্ষ করে ও ঈষৎ শরীর ফিরিয়ে আমাকে অপর বুকটা দেখালো। এই রকমই একটা মেয়েকে মেট্রো সিনেমার সামনে সুবিমল উচিত কথা বলেছিল। আমি আর সুবিমল আসছিলাম, সুবিমলের প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যেকদিনই একটা না একটা ভালো কাজ করবে, মেট্রো সিনেমার সামনে সুবিমল থমকে দাঁড়িয়ে বললো, দাঁড়া, আমার গুড টার্নটা সেরে আসি ! আমি অবাক হয়ে বললুম, এখানে তুই আবার পরোপকারের কী সুযোগ পেলি ? সুবিমল বললো, তুই একটু সরে গিয়ে দাঁড়া না ! —বাজপাখির মতন চোখ সুবিমলের, সিনেমা হলের থেকে একটু পাশে একটি রূপসী মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, নিশ্চয়ই কারুর প্রতীক্ষায়, মুখে সেই অধীরতা। মেয়েটির পোশাক এমন যেন সারা শরীরে রঙের দাগ বেঁধে গেছে, এবং মেয়েটিকে রূপাশ্রিতা বলতেই হবে। মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা। কাঁধ ছুঁয়ে ফেলে আর কি—এত কাছাকাছি গিয়ে সুবিমল বললো, মেয়েটিকে, কী খবর ? এখানে ? — স্পষ্টতই মেয়েটি সুবিমলকে চেনে না, চমকে তাকালা, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকালো না। সদ্য পাট ভাঙা ধুতি ও পাঞ্জাবি সুবিমলের, মোলায়েম কণ্ঠস্বর, কার্তিক মাসের কার্তিকের মতন মুখ—তাতে আবার একটা শান্ত ভদ্রতার বার্নিশ মাখানো। ওকে দেখে কে বলবে, ওর পকেটে একটিও পয়সা থাকে না, আসলে নরদেহধারী খোক্কশ একটি ! মেয়েটি বললো, আমি তো ঠিক—। সুবিমল আহত হয়ে বললো, চিনতে পারছেন না ? আপনি বালিগঞ্জে থাকেন না ? মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললো, হ্যাঁ, বালিগঞ্জে, কিন্তু—। সুবিমল প্রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতন করুণভাবে বললো, আমাকে চিনতে পারলেন না ? আপনাদের বাড়িতে আমি কতবার—আপনার দাদা অমল আমার বিশেষ বন্ধু !— মেয়েটি এবার উজ্জ্বল মুখে বললো, আপনার ভুল হয়েছে, আমার দাদার নাম তো অমল নয়। সুবিমল ফ্যাকাশে মুখে বললো, নয় ? তাহলে আমার সত্যি ভুল হয়েছে। মাপ করবেন, কিছু মনে করবেন না, একেবারে অবিকল ইন্দ্রাণীর মতন দেখতে আপনাকে !— তারপর সুবিমল মেয়েটির দিকে ভালো করে আবার তাকিয়ে দেখলো অপাঙ্গে, সুবিমলের দু' পকেটে হাত, সামান্য জড়তাও নেই। একটু নিচু গলায় মেয়েটিকে বললো, একটু অমিল আছে। আপনার মুখের মধ্যে অহঙ্কার মাখানো। ঐ অহঙ্কারটা মুছে ফেলুন। আপনাকে সত্যি ইন্দ্রাণীর মতন সুন্দর দেখাবে। বিশ্বাস করুন আমার কথা ! চলি !

আমি সুবিমল চোখে এখন একবার সরস্বতীকে দেখলুম। মনে হচ্ছে আজ আর যমুনার সঙ্গে দেখা হবার আশা নেই, তবু ক্ষীণ আশায় বললুম, আপনাকে মামার বাড়ি যেতে হবে না ?

সরস্বতী ঠোঁট উল্টে বললো, সে দেখা যাবে। চলুন না ! কতদিন বাড়ি থেকে বেরোই নি!

— আপনি বাড়ি থেকে বেশি বের হন না বুঝি ?

— মা বেরোতে দেন না। আমাদের বাড়িতে খুব পুলিশী শাসন ! আপনি আমাকে আপনি বলছেন কেন ? আগে তো তুমি বলতেন।

— ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।

কফির দোকানে বসে আমাকে বেশি কথা বলতে হলো না ! সরস্বতীরই বহু কথা। আমি কোথায় চাকরি করি, আমি বিকেলে কোথায় থাকি, আমার কোনো প্রেমিকা আছে কিনা। কথা বলার সময় আমি যখন মুখখানা একটু ডানদিকে ঘুরিয়ে রাখি—তাতে নাকি আমাকে খুব দুষ্টু মনে হয়। আমার মতন লাজুক লোক নাকি মেয়েদের সঙ্গে একেবারে সুবিধে করতে পারে না।

আমি কেন গোঁফ রেখেছি—মেয়েরা আজকাল গোঁফ পছন্দ করে না। রাত জেগে পড়াশুনো করা আমার উচিত নয়, তাতেই নাকি চোখের কোণে কালি পড়ে। সপ্তাহে একদিন আমি চুলে শ্যাম্পু করি তো নিয়মিত ? আমি কি কখনো ফুটবল খেলতুম ? আমার চেহারা দেখে নাকি তাই মনে হয়, অন্তত সরস্বতীর মনে হয়।

বাড়ি থেকে বেশি বেরুতে পারে না, তাই কি সরস্বতীর এত প্রগল্ভতা ? খাঁচার পাখিকে ছেড়ে দিলে সে প্রথমেই সোজা উড়ে যায় না, খানিকটা উড়েই ডানদিকে বেঁকে যায়, আবার উল্টো দিকে ফিরে কিছুদূর এসে হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরে বহুদূর যায়, আমি লক্ষ করে দেখেছি। সরস্বতীও একটু ওড়াওড়ি করে নিচ্ছে। হঠাৎ ও আমাকে দুম করে জিজ্ঞেস করলো, আপনি বাঙাল, না ?

আমি বললুম, হ্যাঁ। কেন হঠাৎ—

সরস্বতী খুকখুক করে হেসে বললো, তাই বলুন ! বাঙালরা বিষম একগুঁয়ে হয়, আর—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আর কি ?

সেই রকম হাসতে হাসতেই বললো, শুনবেন ? আর খুব প্যাশনেট হয়।

আমি বললুম, বাঙালরা নিগ্রো নাকি ? তা ছাড়া তুমি জানলে কি করে ?

রহস্য ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ও বললো, জানি !

আমার হাসি পেল। এ যে ছেলেধরা হয়ে গেছে দেখছি। সর্বনাশ ! নাকের ডগায় একটু ঘাম, বগলের কাছটাও নিশ্চয়ই ঘামে ভেজা। এসব ঢের জানি। ওর বাপ-মায়ের উচিত এক্ষুনি ধরে-বেঁধে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। ওর বোধ হয় ইচ্ছে, এমন রূপ নিয়ে এখুনি ধরা পড়ে কি হবে? একটু খেলাধুলো করে নেওয়া যাক ! পাগলি মেয়ে, খেলাধুলো করতে গেলে হাত মুখ ছড়ে যায়, পাও ভাঙতে পারে— সে খেয়াল আছে ? আমি বললুম, চলো এবার ওঠা যাক। আমার কাজ আছে একটা—

আদুরে ভঙ্গি করে সরস্বতী বললো, যতই কাজ থাক, আমাকে মামাবাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মামাবাড়ি কোথায় ? — কালীঘাট।

রাস্তায় বেরিয়ে আমি ট্যাক্সির দিকে একেবারে লক্ষই করলুম না। এ যা মেয়ে দেখছি, ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি যথেষ্ট বিপজ্জনক। আজ থেকে তেইশ দিন আগে যদি যমুনাকে আমি পথের ওপর দাঁড়ানো না দেখতে পেতুম, তবে আমার এমনভাবে জীবন বদলাবার কথা মনেও পড়তো না, তাহলে, সরস্বতী, তোমাকে নিয়ে আমি কি কাণ্ড করতুম, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

পার্ক স্ট্রিট ধরে এগোলাম চৌরঙ্গির দিকে, বাস ধরার জন্য। কথা ঘোরাবার জন্য আমি বললাম, তোমার দাদা বরুণ কি সত্যিই বিয়ে করেছে নাকি বিদেশে ?

ঠোঁট উল্টে সরস্বতী বললো, কে জানে ! কিছু একটা কাণ্ড বাধিয়েছিল বোধহয়, বিয়ে না করে আর উপায় ছিল না ! ও নিয়ে এত ভাববার কি আছে ? ইচ্ছে হয়েছে, করেছে ! মা'র যত বাড়াবাড়ি !

আমি বরুণের চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করলুম। পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হতো, পালিশ করা পুতুলের মতন চেহারা, ওর পক্ষেও কি কোনো কাণ্ড বাধানো সম্ভব নাকি ? কি জানি, চেহারা দেখলে কিছুই বোঝা যায় না।

একটু দূরে গিয়েই সরস্বতী চেঁচিয়ে উঠলো, সান্যালদা !—একটা খাকি রঙা জিপ ঝট করে থামলো। তারপর ব্যাক করে আমাদের পাশে এলো, পুলিশের গাড়ি, ডগলাস-গোঁফওলা একজন ইন্সপেক্টর মুখ বাড়িয়ে বললো, কি ব্যাপার ? তুমি এখানে ? মা কেমন আছেন ?

—একটু ভালো আছেন। আপনি আমাদের গ্রেপ্তার করুন তো !

লোকটি হাসতে হাসতে বললো, কোথায় যাবে ? সরস্বতী একই রকম তুলতুলে গলায় বললো, আপনি আমাদের গ্রেপ্তার করে কালীঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিন।

আমি বললাম, সরস্বতী, আমার আর তাহলে যাবার দরকার নেই। ও বললো, আসুন না। পুলিশের গাড়ি বলে বুঝি আপনার লজ্জা করছে ? আসামী আসামী মনে হবে নিজেকে ?

উত্তর না দিয়ে ওর সঙ্গে আমিও জিপটায় উঠলাম। সরস্বতী বললো, সান্যালদা, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এই আমার বন্ধু—

৮

কলেজগুলোতে স্ট্রাইক চলছে, সুতরাং দুপুরবেলা যমুনাকে এখন কিছুতেই পাওয়া যাবে না। পরপর দুটো গানের ক্লাশেও যমুনা এলো না। আমার তো আর কিছু কাজ নেই, আমি ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়েছিলুম গানের ইস্কুলের সামনে। কত মেয়েরা গেল ও বেরিয়ে এলো, অনেককেই দেখতে প্রায় যমুনার মতন, কিন্তু যমুনা কেউ না। নদীগুলোও প্রায় সবকটাই একরকম দেখতে, কিন্তু সব নদীতে স্নান করলেই তো আর পুণ্য হয় না। দু'ঘণ্টা ধরে একা রাস্তার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে যে কি অশেষ যন্ত্রণা—কখনো বুঝি নি আগে। এই দু'ঘণ্টা এত দীর্ঘ, যে মনে হয়, পৃথিবীতে এক জায়গায় সবচেয়ে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারে আমি রেকর্ড স্থাপন করে ফেলেছি। যেসব দণ্ডী সন্ন্যাসীরা সূর্যের দিকে এক হাত তুলে দাঁড়িয়ে থেকে তপস্যা করে, ধৈর্যে আমি তাদেরও পরাস্ত করেছি মনে হয়। সেইসব সন্ন্যাসীরা কি শেষ পর্যন্ত কিছু পায় ? আমি তো পেলাম না। বাস স্টপের পাশে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলাম। রাস্তার সব লোকই যাচ্ছে, আমিই একা দাঁড়িয়ে আছি। অনেকে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে, যেন জেনে ফেলেছে, আমি একজন ব্যর্থ মানুষ।

যমুনাকে না পেয়ে আমি তখন যে কি করবো বুঝতেই পারলুম না। আগে আমার দিনগুলো কেমনভাবে কাটতো আর মনেই পড়ে না। যমুনাকে না পেয়ে এখন শুধু মনে পড়ে, সামনে দীর্ঘ সন্ধ্যা ও বিশাল রাত্রি পড়ে আছে—এ নিয়ে আমি কি করবো ? কোথায় যাবো ? কোথায় যাবো? কোথায় যাবো বলো তো হে ? আমি পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলুম। বাতাসে মাথা ঝাঁকিয়ে গাছটা বললো, আমি কি জানি ! আমি তো কোথাও যাই না, আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি। একদিন তোমাতে আমাতে দু'জনেই শ্মশানে গিয়ে পুড়বো !

আমি বললাম, ভাগ ! তারপর জ্বলন্ত সিগারেটটা গাছের গায়ে চেপে ধরলাম। বললাম, এবার দেখো না চাঁদ, পুড়তে কেমন লাগে !

যমুনাকে না পেলে তো আমার চলবেই না দেখছি। এতখানি ওতপ্রোতভাবে যমুনার মধ্যে আমি ডুবে গেছি, আমি নিজেও আগে বুঝি নি। সেদিন ধুতির সঙ্গে চটি পরে বেরিয়েছিলুম, একটা লোক আচমকা আমার পা মাড়িয়ে দিল। আমি যন্ত্রণায় আঃ শব্দ করে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে লোকটিকে বললুম, ইডিয়েট ! চোখ নেই ? লোকটি বললো, মাপ করবেন, দেখতে পাই নি। তখনো আমার পা জ্বলছে, আমি সেইরকম কর্কশভাবেই বললুম, ননসেন্স ! দেখতে পাও না কেন ? লোকটি অবাক ভাবে আমার দিকে তাকালো, নিরীহ চেহারার প্রৌঢ়, হাতে ভারি ব্যাগ, বোধহয় অধ্যাপক-টধ্যাপক হবে, লোকটি মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো, সত্যি দেখতে পাই নি, বিশ্বাস করুন ! এত ভিড়ের মধ্যে, বিশ্বাস করুন, ইচ্ছে করে কেউ কারুর—। আমি সহ্য করতে

পারছিলুম না, বললুম, থাক্ হয়েছে হয়েছে, আর বক্‌বক করতে হবে না। লোকটির মুখ ক্রমশ করুণ হয়ে যায়, আমাকে প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করে, আমি ক্রমশ রেগে উঠতে থাকি। এমন সময় আমার চড়া গলা শুনে, অন্য অনেকের সঙ্গে একটি মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক ভাবে তাকালো। মেয়েটির মুখের সঙ্গে যমুনার কোনো মিল নেই, এ মেয়েটির রং কালো ও মুখখানা ভারি, তবু মুহূর্তে আমার যমুনার কথাই মনে পড়লো। যেন এই মেয়েটির অবাক চোখের মধ্য দিয়ে যমুনা আমাকে বলছে, ছিঃ, কেন এই লোকটির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন? উনি তো সত্যিই ইচ্ছে করে আপনার পা মাড়িয়ে দেন নি—আপনিও তা জানেন!—ভিড়ের বহু লোক তখন আমার বিরুদ্ধে, তবু আমি বেপরোয়ার মতন উদ্ধত হয়ে রইলুম, আমার চোখ তখন জ্বালা করছে, আমি যমুনাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বললুম, বেশ করবো, খারাপ ব্যবহার করবো। যমুনা, তুমি কেন আমার সঙ্গে দেখা করছো না? তাহলে আমি যা ইচ্ছে তাই করবো। আমি আগে কখনো ট্রামে বাসে ঝগড়া করেছি? আমি আগে কখনো কোনো প্রৌঢ় লোককে তুমি বলেছি? এখন বেশ করবো, বলবো, কেন তুমি দেখা করছো না?

অফিসে বড় জামাইবাবু একদিন ঘরে ডেকে নিয়ে আমায় বললেন, তুমি নাকি বনমালীবাবুকে বুড়ো শকুন বলেছো? ছি ছি, ভদ্রলোক আমার কাছে নালিশ করতে এসে একেবারে কেঁদে ফেলেছেন! বুড়ো মানুষ, দু'একটা কাজে ভুল করতে পারেন, তা বলে এরকম বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করা তোমার অন্যায়। ছি ছি—

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে নত চোখে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার সর্বাঙ্গে অভিমান। আমি মনে মনে বিড়বিড় করেছি, বেশ করবো, বলবো, আবার বুড়ো শকুন বলবো, শুয়ারের বাচ্চা, ছাগলের গু, এঁটো শালপাতা, হেঁপো রুগীর সিকি—এই বলে যাকে–তাকে গালাগাল দেবো, বেশ করবো, যতদিন না যমুনার সঙ্গে আমার দেখা হয়। যমুনার সঙ্গে কেন আমার দেখা হবে না!

যমুনাদের বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করছিলুম, ইচ্ছে করেই ভেতরে যাই নি, দেয়ালের সবক'টা পোস্টার মুখস্থ হয়ে যাবার পর দেখলুম, যমুনা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে, সঙ্গে আরও দু'টি মেয়ে। বাঃ, চমৎকার, আজকের সন্ধেবেলাটা ভারি চমৎকার তো! ঐ একরত্তি মেয়েটাকে দেখেই আমার মনটা ভালো হয়ে গেল। অথচ আমি তো লোভ করি নি, ঐ যে সুন্দর শরীর, এখনো ও শরীরের সবক'টা ভাঁজ খোলা হয় নি, এমন টাটকা, আমি তো ঐ শরীরের লোভ করি নি, আমি শুধু ওর মাধুর্যটুকু চেয়েছি। কিন্তু যমুনাকে আমার একা চাই, পাশের ঐ আজেবাজে মেয়ে দুটো কারা?

আমাকে দেখতে পায় নি, বেশ ব্যস্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা বাসস্টপের দিকে, এক্ষুনি যদি বাসে উঠে পড়ে, তাহলে আবার যমুনা হারিয়ে যাবে। আমি দ্রুত হেঁটে প্রায় কাছাকাছি এসে ফের গতি মন্থর করে এগিয়ে গিয়ে বললুম, কোথায় যাচ্ছো? কি জানি আমার গলার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ছিল কিনা, যমুনা অত্যন্ত বেশি রকম চমকে পিছন ফিরে তাকালো। তারপর, আমায় দেখে, থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের বাড়ি যাচ্ছিলেন বুঝি?

— গেলেও তো তোমায় পেতুম না। আগে একদিন গিয়েও তোমাকে পাই নি। আজ কোথায় যাচ্ছো? রিহার্সাল?

—না, সিনেমায়। টিকিট কাটা আছে যে।

আমার বলার ইচ্ছে হলো, আজ সিনেমায় যেও না। কিন্তু, একথা মুখে বলা যায় না। সুতরাং, আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, কোন্ পাড়ায়, চৌরঙ্গিতে? দেরি হয়ে গেছে তো তাহলে, তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়ো।

—হুঁ, আমাদের জন্য ওখানে অনেকে দাঁড়িয়ে থাকবে !

যমুনা ওর বান্ধবীদের ছেড়ে আমার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বললো, সুনীলদা, আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে ! চলুন !

—না, না। তোমার বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে আমি গিয়ে কি করবো ! ওদের অস্বস্তি লাগবে।

—মোটেই তা না। আপনার সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দেবো, ঐ যে ওরা অর্চনা আর নবনীতা, আমার ক্লাসের মেয়ে—এই নবনীতা, তোদের সেই সুনীলদার কথা বলেছিলুম না—চলুন, আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে, আপনার সঙ্গে কোনোদিন সিনেমা দেখি নি—

— না খুকী, আজ না, আর একদিন।

— আবার খুকী ?

নবনীতা নামের মেয়েটি বললে, ঐ যে বাস আসছে, এটাতে উঠবি ?

যমুনা আমার মুখের দিকে তাকালো। আমি আর একটু হলে বলতে যাচ্ছিলুম, আমিও ঐ দিকেই যাবো, চলো, তোমাদের সঙ্গে বাসে এক সঙ্গে যাই—কিন্তু, শেষ মুহূর্তে একথা না বলে, আমি জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, তোমাদের সঙ্গে বাসের রাস্তাটুকু এক সঙ্গে যাবো ?

— আপনি কি ঐ দিকেই যাবেন ?

— আমার যে কোনোদিকে গেলেই হলো।

দোতলার দুটি সিটের লোকেরা উঠে দাঁড়ালো। আমি যমুনার সঙ্গে একসঙ্গে বসলুম, গায়ে গা না ছুঁয়ে উপায় নেই, যমুনার শরীরের আঁচ আমার গায়ে লাগতে ভারি ভালো লাগলো। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওর বুক দুলে দুলে উঠছে, সারা দেহময় সুগন্ধ। আমি জিজ্ঞেস করলুম, খুব সেন্ট মেখেছো, বুঝি ? ও অবাক হয়ে বললো, বাঃ, সিনেমায় যাবার সময় সেন্ট মাখবো না ?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, ও সিনেমায় যাবার সময় সেন্ট বুঝি মাখতেই হবে ? নিয়ম?

— সবাই মাখে।

— তুমি গানের ইস্কুলে আর যাচ্ছো না কেন ?

মা বলেছেন, একমাস আর গানের ইস্কুলে যেতে হবে না। সামনেই কলেজের পরীক্ষা !

— সিনেমায় যেতে পারো, আর গানের ইস্কুলে গেলে কি ক্ষতি হয় ?

যমুনা ক্ষুণ্ন হয়ে বললো, আপনি আমায় বকছেন ? কিন্তু আমার কী দোষ ?

না বকি নি, আমি তো ওকে বকতে চাই নি, আমার ইচ্ছে হলো ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলি, না, বুলবুলি, তোমাকে আমি বকি নি। আমার মেজাজটা তোমার জন্যই রুক্ষ হয়ে আছে। আঃ, ট্রামে-বাসে কি কথা বলার কোনো উপায় আছে ? আশেপাশের গাদা-গাদা লোক হাঁ করে তাকিয়ে ! যেন আশেপাশে আর কিছু দেখার নেই, সবার চোখ আর কান এদিকেই ফেরানো। ঐ পাশের সিটেও তো বেশ দুটো ফুরফুরে মেয়ে বসে আছে, সেদিকে তাকা না হতভাগারা ! না, শুধু দু'টি মেয়ের চেয়ে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং, তাদের কিছুতেই নির্জনতার সুযোগ দেওয়া হবে না, এদিকেই ব্যাকুলভাবে ট্যারা চোখে তাকিয়ে থাকতে হবে। আমি একটা ক্রোধের দীর্ঘশ্বাস ফেললুম।

বাসটা এত জোরে ছুটছে, পৌঁছোতে আর কতক্ষণই বা দেরি লাগবে ! সময় নেই, আর সময় নেই। গলার আওয়াজ যথাসম্ভব মৃদু করে আমি বললুম, যমুনা, তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমার খুব ইচ্ছে হয়।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে যমুনাও মৃদুস্বরে বললো, আমারও।

— তোমার সঙ্গে যে আমার দেখা হওয়ার খুবই দরকার।

— দিদিটা যে ভীষণ সর্দারি করছে আমার ওপর ! ভালো লাগে না !

— কিন্তু, আমার যে খুবই দরকার।

— আমাকে এখন আর একা বেরোতে দেয় না !

ওপাশের সিট থেকে অর্চনা নাম্নী মেয়েটি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, এই যমুনা, দ্যাখ দ্যাখ, ঐ যে টি কে পি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বলেছিলুম না, ওঁর বিয়ে হয়ে গেছে। সঙ্গে ওঁর বউ।

যমুনা ব্যগ্র হয়ে বললো, কই, কই ?

বাসটা তখন থেমেছিল, আমাকে হাঁটু সরিয়ে পাশ দিতে হলো, যমুনা উঠে ওপাশের জানলার দিকে ছুটে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, টি কে পি কে ?

— আমাদের ইংরেজির প্রফেসার !

— যাই বলিস, ওঁর বউকে মানায় নি। টি কে পি এমন হ্যান্ডসাম।

— যাঃ, ওঁর বউকেও খুব স্মার্ট দেখতে।

— ওঁর বউও প্রফেসার, বেথুনের।

—এই অত মাথাটা ঝোকাস্ নি, আমাদের দেখতে পাবে।

— দেখুক না !

তিনটি বালিকা মিলে কলকল করতে লাগলো। কোথাকার কে এক ইংরেজির ছোকরা প্রফেসার, তার জন্যও সময় নষ্ট, সেও আমার শত্রুতা করবে। যমুনা তো ব্রেবোর্নে পড়ে, সেখানেও পুরুষ লেকচারার আছে নাকি ? কিংবা হয়তো কোনো কোচিং ক্লাশের বা প্রাইভেট টিউটর, অর্থাৎ একটা এলেবেলে লোক, তার জন্যও আমার দুর্মূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ! আমি সেই সময়টা বিরস মুখে বসে রইলুম। এক একটা মুহূর্তও যেন মাইল পোস্টের মতন দূরে। তারপর মনের ভেতরটায় একটা নাড়াচাড়া দিয়ে ঠিক হয়ে নিলুম। আমারই দোষ। কয়েকটা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের মেয়ে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, তারা নিজেদের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে হাসি–ঠাট্টা করবে, ছোকরা প্রফেসারের বিয়ে হয়েছে কিনা এই নিয়ে কৌতূহল দেখাবে, শায়রাবানু আর দিলীপকুমারকে নিয়ে আলোচনা করবে— এইগুলোই তো স্বাভাবিক, মাঝখান থেকে আমি এসে গলাভারি করে কাতরভাবে কথা বলবো— এইটাই অস্বাভাবিক। আমার স্বার্থপরতা। একা দেখা না হলে আমার চলবে না। ঠিক সময় একথাটা বুঝতে পেরে আমি মনের গ্লানি দূর করে হালকা হয়ে গেলুম। হাসি মুখে তাকালুম ওদের দিকে।

জায়গা আসতে, ওদের নেমে যাবার সময় আমি আর সঙ্গে নামলুম না। আমি বসেই রইলুম। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে যমুনা হঠাৎ আবার ফিরে এলো, হাসিমুখে ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, যাই ? কি সুন্দরভাবে চুলগুলো ওর দুলে উঠলো কথা বলার সময়। শাড়ির আঁচলটা বাঁ হাতে পাকিয়ে নিয়েছে। আমিও গ্লানিহীন হাসিমুখে বললুম, শিগ্‌গির যাও, বাস ছেড়ে দেবে ! যমুনা তবু দু'এক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলো, তারপর আকস্মিকভাবে গলার আওয়াজটা বদলে ফেলে অভিমানের সঙ্গে বললো, সুনীলদা, আপনি আমাকে একটাও চিঠি লিখলেন না ! বলেই নেমে গেল।

চিঠি লিখলেন না ? একথার মানে কি ? চিঠি লিখে কি হবে ? এত কাণ্ডের পর এই বয়েসে আমি আবার চিঠি লিখে প্রেম করা শুরু করবো নাকি ? ধ্যাৎ ! যমুনার ঐ চিঠি কথাটার মানে বুঝতে পারি নি, কিন্তু ঐ শেষ মুহূর্তের তাকানো এমন অসম্ভব ভালো লেগেছিল যে বুঝতে পারছি আমার পালস্ রেট বেড়ে গেছে। আঃ, বাতাস এখন খুব হাল্কা, অনায়াসেই বারবার বুক ভরে ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়।

বাস কিছুটা দূর যাবার পর ট্রাফিক জ্যামে থেমে রইলো। ভাগ্যিস আগে আটকায় নি, তা হলে যমুনাদের সিনেমার দেরি হয়ে যেতো। আহা, ওরা এখন হাসিখুশি নিয়ে রঙিন ফিলম্

দেখুক ! জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি একজন চেনা লোককে দেখতে পেলুম। অফিসের বনমালীবাবু। দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ের হাত ধরে ফুটপাত থেকে ছিটের জামা কিনছে। ওঁকে আমি বুড়ো শকুন বলেছিলুম, ভেবে আমার একটু হাসি পেল। বনমালীবাবুকে দেখলে মনে হয়, আগে ওঁর বেশ ভালো স্বাস্থ্য ছিল, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগা হয়েছেন। দু'পাশের কাঁধ দুটো যেন ডানার মতন উঁচু হয়ে উঠেছে, অত বেশি পাওয়ারের চশমাটাও বড় বিশ্রী দেখতে—একটু শকুন শকুন ভাব আছে ঠিকই। চোখে ভালো দেখতে পান না বলে অফিসে ওঁর কাজে ভুল হয়, অফিসে সবসময় ওঁর মুখে কিরকম যেন একটা অপরাধী অপরাধী ভাব ফুটে থাকে, কিন্তু এখন ছেলেমেয়েদের হাত ধরে তাঁর মুখের চেহারা অন্যরকম, আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকারীর মতন আস্থাবান, কি প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে দোকানদারকে ধমকাচ্ছেন। এখন উনি যেন অন্য মানুষ। আমার হঠাৎ ইচ্ছে হলো, নেমে গিয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই এখন। একটু উঠে দাঁড়িয়েও ছিলুম, কী ভেবে আবার বসে পড়লুম। ব্যাপারটা একটু নাটকীয় হয়ে যাবে, উনি হকচকিয়ে যাবেন, মুখে আবার সেই বিগলিত ভাবটা ফিরে আসবে, আমার ক্ষমা চাওয়ায় উনি খুশি হওয়ার বদলে বিকৃত ও ভীত হয়ে উঠবেন বেশি। আমায় যে বড় জামাইবাবু ডেকে ধমকেছেন, সে কথা নিশ্চয়ই ওঁর কানে গেছে, তাতেই খুশি হয়েছেন নিশ্চয়ই ! আমি তো মনে মনে ক্ষমা চেয়ে নিতেও পারি, একই কথা। জানলা দিয়ে আমি একদৃষ্টে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। বনমালীবাবু, আসলে আমি সত্যিই তেমন খারাপ লোক নই। রাগের মাথায় বলে ফেলেছিলুম। আমায় আপনি ক্ষমা করবেন তো ? রাগের মাথায় মানুষ দু'একটা ভুল তো করেই। যমুনার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছিল না বলেই তো আমার মেজাজ খারাপ। যমুনার সঙ্গে আর কয়েকদিন একা দেখা হলেই আমার মেজাজ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। আমি সম্পূর্ণ বদলে যাবো।

একা কোথায় দেখা হবে ? কিছুতেই যমুনাকে পাচ্ছি না। গানের ইস্কুলেও যায় না, কলেজ বন্ধ। যমুনাকে কোথায় পাবো ?

কয়েকদিন যমুনার দেখা না পেয়েই আমার পায়ের তলা আবার খসখস করতে লাগলো। যমুনার সঙ্গে থাকার সময় মনে হতো, আমি যেন সবসময় খালি পায়ে নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছি, চারপাশে সবুজ গাছের নিঃশ্বাসের সুবাতাস। এখন আবার ভিড়ের মানুষের গরম নিঃশ্বাস আমার গায় লাগতে লাগলো। নাইলনের মোজার ছোঁয়ার পায়ের তলায় বিশ্রী স্বাদ। কিন্তু যমুনাকে পাবার জন্য আমি কি করতে পারি—কিছুই বুদ্ধি আসে না মাথায়। একটা ষোলো বছরের মেয়েকে আমি চাই, আমার একার জন্য—একথা পৃথিবীর লোক বিশ্বাস করবে না। কিছু না ভেবেই আমি যমুনাদের বাড়িতে একটা টেলিফোন করলাম। তারপরই একটা ছোট ভুল করে ফেললুম আবার। কি করবো, যমুনার কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে যে সত্যি কথা বলতে পারি না। আর সকলেই সত্যি কথা শুনলে ভুল বোঝে। টেলিফোনে একবার মাত্র রিং করার পরই একটি গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো, ইয়েস—জগদীশ রায়ের গলা, কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আমি ভাবলুম, জগদীশ রায়কে কী বলা যায়, যমুনাকে ডেকে দিন ! আমি শুধু ওরই সঙ্গে কথা বলতে চাই ? নাঃ—যায় না। তখন আমি অন্য একটা নম্বর বানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি এই নম্বর ? সেই গম্ভীর কণ্ঠ বললো, না—।

৯

পরদিন শনিবার, আমি দুপুরের দিকে যাদবপুরে সুবিমলের বাড়িতে চলে এলাম। এ–ক'দিন একা একা থেকে একাকীত্বটা বুকের মধ্যে বিষম ভারি হয়ে উঠেছে। সুবিমল চুপচাপ শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিল, মাথার কাছে কাগজপত্র ছড়ানো, কিছু লেখার চেষ্টা করছিল বোধ হয়। রাস্তার পাশের কাঁচা ড্রেন পেরিয়ে আমি এসে ওর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বললুম, কি রে ? ভেতরে ডেকে নেবার পর সুবিমল বললো, তোদের কি ব্যাপার ? তুই আর শেখর দু'জনেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেলি ?

আমি বললুম, কোথায় আবার নিরুদ্দেশ হয়েছি ! শেখরও হয় নি।

সুবিমল ড্রয়ার ঘেঁটে সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে বললো, জানি জানি, তোদের দু'জনের ব্যাপার জানি। তুই একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কিছু একটা কারবার করছিস—আর শেখর একটা বাঈজিকে নিয়ে মেতে আছে।

—তুই এসব কথা কোথা থেকে শুনলি ?

—অবিনাশের কাছে।

—সে গুণ্ডাটার নিজের কি খবর ?

—সে এখন শেখরের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। শেখরের অবস্থা জানিস তো, খুব শোচনীয়। এল এস ডি ফেলেসডি কি নাকি সব ট্যাবলেট খেয়েছিল, এখন ওর প্রত্যেকদিন মাথা ঘোরে, চলতে গিয়ে পড়ে যায়—তবু বাড়ি ফিরবে না, ঐ বেজাতের মেয়েমানুষটাকে নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। আর সে মেয়েমানুষটাও ছেলে ছেলে বলে একেবারে পাগল। এদিকে পরিতোষের সঙ্গে আমার কাল দেখা হলো, ওর মা না–কি ঠাকুরঘরে পুজো জানতে পেরে গেছেন যে শেখর ওঁকে মিথ্যে কথা বলে গেছে। খুব কান্নাকাটি করছেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত না, শেখরের মা কাঁদছেন তাঁর ছেলের জন্য, আর শেখর এদিকে আরেকটি মায়ের ছেলে খুঁজে দিতে ব্যগ্র। ভাবছি এই নিয়ে একটা নাটক লিখবো। আর সেই মেয়েটার চরিত্রও অদ্ভুত। আমি—

—থাক, ওর কথা শুনতে চাই না এখন।

—তুই ওর পুরো ব্যাপারটা জানিস ?

—জানি।

—আমি কয়েকদিন আগে গিয়েছিলুম বীণার ওখানে। বীণার দিদি সেই নূরজাহান বেগম—অমন সুন্দরী, কিন্তু পোশাকটোশাক সব এলোমেলো, ঘনঘন ফিট হচ্ছে। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে।

—অভিনয় নয় তো এসব ? সিনেমার মেয়ে !

সুবিমল একটু হেসে বললো, না–রে, কোন্‌টা অভিনয় আর কোন্‌টা অভিনয় নয়—এখন বড় বেশি বুঝতে পারি। এত বেশি বুঝতে না পারলেই ভালো হতো।

—ওর স্বামী কি বলছে ? ছেলে ফেরত দেবে না ?

নাঃ ! সে–লোকটা মহাপাজি। সে আরেকটা বিয়ে করেছে, সে বউকেও সিনেমায় নামাবার চেষ্টা করছে। ছেলেকে ফেরত দেবে না তার কারণ হিসেবে অবশ্য বলছে, নূরজাহান যদি ছেলেকে ঢাকায় নিয়ে যায়—তাতে তো ছেলেটাও প্র্যাকটিকালি মুসলমান হয়ে যাবে—সে তাতে রাজি নয়। তারও তো ছেলেকে দেখতে ইচ্ছে করে। আসলে লোকটার ইচ্ছে, নূরজাহানকে এখানে ধরে রাখে; ঠিক স্ত্রী হিসেবে নয় রক্ষিতা হিসেবে—আর নূরজাহানকে

এখানকার সিনেমা লাইনে ঢুকিয়ে যদি কিছু টাকা পেটা যায়।

—নূরজাহান ওর নামে মামলা করুক না।

—তা কখনো পারে ! নূরজাহান তো পাকিস্তানের সিটিজেন। ও তো আর নিজেকে সাধনা বলে স্বীকার করতে চায় না। এইটাই তো মুশকিল, বাবা আর মা যদি দু'দেশের নাগরিক হয়, আপাতত দুই শত্রুভাবাপন্ন দেশের—তা হলে ছেলের কী অবস্থা হবে ?

—এক্ষেত্রে নূরজাহানকেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তারই দোষ। সেই তো স্বামী আর ছেলেকে ফেলে পালিয়েছিল। তখন মনে ছিল না ? ঐ মেয়েটাকে আমার একদম পছন্দ হয় না।

—তুই যা বলছিস, যুক্তির দিক দিয়ে তা ঠিক। কিন্তু এখানে যে যুক্তি টিকছে না। ছেলের জন্য নূরজাহানেরই বা এত ব্যাকুলতার কী যুক্তি ! মেয়েটার কোনোরকম নীতিজ্ঞান নেই, টাকা আর ভোগ সুখের স্বাদ পেয়ে এখন ওছাড়া আর কিছু জানে না, সেসব তো পেয়েছেই, পূর্ব পাকিস্তানের ফিল্‌মে ওর নামটাম হয়েছে শুনেছি, অনেক টাকাও করেছে, তবু সামান্য একটা ছেলের জন্য এই পাগলামি কেন ?

আমি কিছুটা বিরক্তভাবে বললুম, তোরা এ জিনিসটাকে বড্ড বাড়িয়ে দেখছিস্। এতো অ্যানিমাল ইন্সটিংকট ! জন্তু জানোয়াররাও নিজের বাচ্চা হারালে ছটফট্ করে—পৃথিবীতে অন্য অনেক কিছুর চেয়ে এ দুঃখটা এমন কিছু বড়ো নয়।

সুবিমল বললো, জন্তু জানোয়াররা ছটফট করে অনেকটা শারীরিক কারণে। কিছুদিন পর ভুলে যায়। কিন্তু মানুষই ভোলে না। আট দশ বছর পরও নিজের সন্তানের জন্য অন্য জীবন থেকে ছুটে আসা, এর মধ্যে একটা ট্রাজিক নোট আছে। তুই এটা মিস্ করছিস কেন ?

—আমার ওসব এখন ভাবতে ভালো লাগে না। আমি এখন নিজের একটা ব্যাপার নিয়ে বিব্রত।

—আমিও নিজের একটা ব্যাপার নিয়ে বিব্রত। তবু এ ব্যাপারটায় অভিভূত হবো না, এমন পাষণ্ড নই ! নিজের সমস্যা থাকলেই অপরের সমস্যা বেশি চোখে পড়ে। শেখর তো ঐ মেয়েটার জন্য চাকরি–বাকরি সব ভুলে গেছে। অবিনাশের মত নিষ্ঠুর ছেলেও ওখানে আটকে আছে কি জন্য ? মেয়েটা সত্যিই একেবারে আকুলি–বিকুলি করছে ! বলছে না পেলে ফিরে যাবে না, এখানেই থাকবে, যে কোনোভাবে হোক, এমন কি ভিক্ষে করতে হলেও।

আমি আস্তে আস্তে বললুম তা আর সম্ভব নয়। ওকে ফিরতেই হবে। যে গেছে, তার আর ফেরার উপায় নেই। বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ছেলেকে পাবার জন্য এখানে ফিরে এসেছে নূরজাহান, কিন্তু পূর্ব বাংলার মাটির জন্য তোর আমার বুক পোড়ে না ? মনে পড়ে না সেই দুর্গাপুজোর আটচালা, বটগাছে তক্ষকের ডাক আর রাত্তিরবেলা ঘরের পাশে জলের ছলছল শব্দ? আমি আর সেখানে ফিরতে পারবো ? ওসব শেষ হয়ে গেছে। পিছুটান থাকলে এখানেও আমি মন বসাতে পারবো না। নূরজাহানকে বল, মানে মানে কেটে পড়তে। জাত খুইয়ে ও তো ওখানেই ফিরে গেছে, আবার এদিকে লোভ কেন ? ওসব হবে না—দরকার হলে আমিই ওকে তাড়াবো—

—তুই এরকম নিষ্ঠুরের মতন বলছিস কেন ? ও একটা অসহায় মেয়েছেলে, ও জাতধর্মের কি বোঝে ? আমার কী মনে হয় জানিস, নূরজাহানই যেন পূর্ববঙ্গের আত্মা, ভুল করে ফেলে এখন কাঁদছে।

— রাখ, ওসব কবিত্ব করতে হবে না তোকে।

— তোর কি মনে হয় না, দুই বাংলা আবার মিলতে পারে ? আমার তো বিশ্বাস, একদিন না একদিন—

— তোর যদি বিশ্বাস থাকে তো ভালোই। আমি আর ক'দিনই বা বাঁচবো, আমার জীবনে বোধহয় ও জিনিস আর দেখে যেতে পারবো না।

— তুই একটা ড্যাম পেসিমিস্ট ! দেখছিস না, ওখানে নতুন করে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হচ্ছে। আমরা তো মিলতে রাজিই আছি—ওরাও যদি রাজি হয়, তবে কে আটকাবে, পশ্চিমের ঐ একটা ছোট্ট টুকরো !

— সারা পৃথিবী আটকাবে, সারা পৃথিবীর স্বার্থে। আমাদের কথা কে ভাবে ? তাছাড়া পূর্ব বাংলার আন্দোলন আমাদের সঙ্গে মেলবার জন্য মোটেই নয়। যাকগে, এসব কথা ভাবতে আজ আমার একটু ভালো লাগছে না। চল বেরুবি ?

— বেরিয়ে কোথায় যাবো ?

— তোর বাড়িতে তো চা খাওয়াবার সিস্টেম নেই। অন্তত মোড়ের দোকানটায় গিয়ে খাওয়া যাক।

সুবিমল একটু হেসে বললো, বাড়িতে আমার একেবারে প্রেস্টিজ নেই। চা চাইলে বোধহয় মুখ ব্যাঁকাবে। চল বেরিয়েই পড়া যাক।

সুবিমল ধুতিটা ফেরতা দিয়ে পরে, পাঞ্জাবি চড়ালো। আয়নার সামনে গিয়ে যত্ন করে চুল আঁচড়ে নিয়ে, বেরুবার মুখে লেটার বক্সে একবার উঁকি মারলো। কোনো চিঠি নেই। কয়েক পা এগিয়ে বললো, হঠাৎ যে এতদূরে এলি ? আমি বললুম, আজ আমার বড্ড মনটা খারাপ। একদম ভালো লাগছিল না ! — সুবিমল চট করে বললো, আমারও আজ মনটা খুব খারাপ। তুই না এলে বাড়ি থেকে বেরুতাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোর আবার মন খারাপ হলো কিসে ? — সুবিমল আঙুল দিয়ে কোণের একটা একতলা বাড়ি দেখিয়ে বললো, ঐ বাড়িতে একটা মেয়ে থাকে, ঐ মেয়েটার ম্লান মুখখানা খুব মনে পড়ছে সারাদিন। ভাবছি মেয়েটাকে বিয়ে করবো—

আমি সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, আবার একটা মেয়ে ? কেন, সেই মেয়েটা কি হলো ? সেই টেলিফোন অপারেটর ?

সুবিমল রীতিমত অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, কোন্ টেলিফোন অপারেটর ?

—বাঃ, সেই যে অরুণের অফিসে, রোগা আর ফর্সা, যাকে দেখে এক মুহূর্তে তোর জীবন বদলে গিয়েছিল ? মায়ায় উথলে উঠেছিলি একেবারে, মনে নেই ! নাকি বানিয়ে বলেছিলি ?

—ওঃ, সেই মেয়েটা ? ধ্যুৎ ! সেটা বাজে। খালি টাকার দিকে লোভ। অরুণকে ভেবেছিল শাঁসালো মক্কেল, মেয়েটা জানতো অরুণের বিয়ে হয় নি, তাই অরুণের জন্য অমন ন্যাকামি করেছিল। আমি একদিন আলাপ করতে গেলুম, আমাকে পাত্তাই দিল না !

—পাত্তা দেবে কেন ? তোকে চেনে না, শোনে না, অনেক ছেলে নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে—

—উঁহু, অরুণ আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তবু গ্রাহ্য করে নি। তারপর একদিন দেখলুম, অরুণদের বড় সাহেবের সঙ্গে ছুটির পর গাড়িতে উঠছে। আমি আর কি করবো বল, আমি তো ওকে বাঁচাবার চেষ্টাই করেছিলাম।

—আচ্ছা, বুঝলাম, তা এই নতুন মেয়েটার কি ব্যাপার ?

— আঃ, কী ঠাণ্ডা আর সুন্দরী এই মেয়েটা। কী করুণ মুখ ! ছলছলে দুটো বড় বড় চোখ এমন যে, দেখলে —

—রূপ বর্ণনা শুনতে চাই না। ঘটনাটা কি, সাদা বাংলায় বল্—

—আমি আগে চিনতুম না। পাড়ার মেয়ের দিকে কেই বা নজর দেয় ! ক'দিন আগে মাত্র

দেখলুম ওকে।—ওরা বেশ গরীব, বুঝলি ? পরশুদিন মেয়েটাকে বিয়ের জন্য দেখতে এসেছিল একদল লোক। মেয়েটা খুব তোতলা—পাত্রপক্ষের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারবে না, তাই কথাবার্তা বলার জন্য আমাদের বাড়ির একজনকে ডাকতে এসেছিল। আমিই গেলাম। কী নৃশংস ব্যাপার, তোকে কি বলবো ? চারটে হুমদো হুমদো লোক এসেছে, লুচি আলুদ্দম আর সন্দেশ সাঁটালো বেধড়ক, মেয়েটাকে বললো, চুল খোলো তো, হাঁটো তো মা, গান জানো ? রান্না জানো ক'রকম ? ফ্রক সেলাই করতে পারবে ? তারপর ভূদেব মুখুজ্যের লেখা থেকে ডিকটেশান লেখালো, আচ্ছা তুই বল, বাংলাদেশে ক'টা লোক আছে ভূদেব মুখুজ্যে থেকে ডিকটেশান সঠিক লিখতে পারবে ? আর এ একটা সেকেন্ড ইয়ারের কচি মেয়ে, লজ্জায়, অপমানে নীল হয়ে আছে। সেই করুণ মুখ দেখে আমার বুক একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। মুরগি কেনার মতন ওরা মেয়েটার পেট টিপেও দেখতে পারতো, তা দেখে নি অবশ্য, কিন্তু একথা বলেছে, মেয়েটির মুখের তুলনায় হাত–পায়ের রং কালো দেখছি ! তারপর বরের বাবা মেয়ের বাবাকে বললো, মেয়েটার সামনেই, মেয়ের রং তেমন ফর্সা নয়, সুতরাং সোনা কিন্তু কমালে চলবে না ! ঐ বাইশ ভরিই চাই ! ছেলের বাবা কিন্তু যে–সে লোক নয়, একটা ইস্কুলের হেড মাস্টার। আমার ইচ্ছে হলো, লোকগুলোর নাক কামড়ে ছিঁড়ে দিই, পেছনে লাথি মারতে মারতে একেবারে হাত–পা ভেঙে কীচক বধ করে ফেলি। যাই হোক, মেয়েটার সেই অপমান দেখে তখুনি আমি ঠিক করলুম, আমিই মেয়েটাকে বিয়ে করবো।

— তোর সঙ্গে বিয়ে দেবে কেন ?

— জাতে মিল আছে। এবার একটা চাকরি খুঁজে নেবো—

-- তুই আর চাকরি খুঁজেছিস !

— অপমান করিস না। একটা এম এ ডিগ্রি আছে আমার, ভুলে যাস না। নেহাৎ মাস্টারি করার নামে জোচ্চুরি করবো না বলেই এতদিন চাকরি পাই নি। যাক, অপমানের কি আছে ! হরলালবাবুর কোম্পানিতে একটা সেলসম্যানের চাকরি খালি আছে শুনলাম। এবার ওঁকে গিয়ে বলবো। শুধু বলা নয়, ওঁর বাড়িতে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দেবো, হরলালবাবুর পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে জিভ দিয়ে সবটুকু থুতু চেটে নেবো, ওঁর ছেলের গু মোছাবো ! ওঁর হেঁপো রুগী বউয়ের বমি খাবো—তাও চাকরি দেবে না ? কী ভাবিস তুই আমাকে ?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, চাকরি পেলেই তুই এই মেয়েটাকে বিয়ে করবি ? তোর সঙ্গে মেয়েটার আলাপ আছে ?

—আলাপ থাকার দরকার নেই। আমি ওর অপমানে করুণ মুখ দেখেছি। তাতেই যা জানার আমি জেনে নিয়েছি। আমি ওর অপমান মুছে দিতে চাই।

—তারপর একে বিয়ে করার পর তুই আবার একটা মেয়েকে হয়তো দেখলি, এই রকমই অসহায় কিংবা অপমানে করুণ। তখন কি করবি ? তখন তো আবার তাকেও বিয়ে করে বাঁচাতে পারবি না !

সুবিমল চটে উঠে বললো, তুই সবসময় ওরকম যুক্তি দেখাস কেন বল তো ? কি বাজে অভ্যেস হয়েছে তোর—

আমি হঠাৎ আহত বোধ করলুম। একটু অপ্রস্তুতভাবে জিজ্ঞেস করলুম, সত্যিই আমি যুক্তি দেখাই না কি রে সবসময় ? আমি নিজে তো বুঝতে পারি না। আমার নিজের বেলায় তো একটাও যুক্তি মেলে না। একরকম ভাবি, অন্যরকম হয়ে যায়। এই কদিন ধরে আমি যে এত ভাবলুম —

—কী হলো তোর এ ক'দিনে ?

আমি সুবিমলকে যমুনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বললুম। বলার সময় আমার অল্প হাত কাঁপছিল, দু'একটা কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে আটকে যাচ্ছিল কেন জানি না। আমি সামান্য অসহায়ও বোধ করছিলুম। সব শুনে সুবিমল বললো, যাক, তুই বেঁচে গেলি, তোকে মানুষের মতন দেখাচ্ছে। আমি লাজুকভাবে বললুম, কেন রে? সুবিমল হাসতে হাসতে বললো, সত্যি বিশ্বাস কর, এতদিন ছিলি বনমানুষ, এখন মুখোশ ছিঁড়ে মানুষের মতই দেখাচ্ছে তোকে। আমি বললাম, সুবিমল, এ ব্যাপারটা নিয়ে ইয়ার্কি করিস না।

—না, ইয়ার্কি নয়। তুই কোথাও গিয়ে নিজের মনকে খুলে ধরতে পেরেছিস, এই তো যথেষ্ট। মেয়েটা কোথায় ? একদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দে।

— মেয়েটার সঙ্গে আমারই আর দেখা হচ্ছে না যে ! কি করি বল তো ? মেয়েটাকে নিয়ে আমি কি করবো !

— খবরদার একেবারে হাতছাড়া হতে দিস না। ওসব সরলতা-ফরলতা হয়তো বাজে কথা। হয়তো দেখবি মেয়েটা বেশ ডেঁপো, পেকে ঝুনো হয়ে গেছে—কিংবা তুই যত বাচ্চা ওকে ভাবছিস, ততটা বাচ্চা মোটেই নয়, মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হচ্ছে, অল্পবয়েসী বিশেষ একটা মেয়েকে তোর মনে হচ্ছে পবিত্র, তার কাছে গেলে তোরও মন পবিত্র হয়ে যায়, ব্যস, তুই মেয়েটার কাছেই থাকবি— সোজা কথা।

— কি করে থাকবো ? একটা ঐ রকম বাচ্চা মেয়েকে আমার সঙ্গে প্রত্যেকদিন দেখা করতে দিতে ওর বাপ-মা রাজি হবে কেন ?

— মেয়েটাকে বিয়ে করে ফ্যাল।

— দূর ! ঐটুকু মেয়ের বিয়ে হয় নাকি ?

— জোর করে করতে গেলে হয় না, কিন্তু বাপ-মা রাজি হলে ঠিকই হয়। হবে না কেন ? ওর বাপ-মাকে গিয়ে ভজিয়ে ফ্যাল। তুই তো ছেলে খারাপ না।

— তা যদিও বা হয়, কিন্তু পরে যদি আমার এরকম আর না লাগে ? মেয়েটারও যদি ভবিষ্যতে আমাকে ভালো না লাগে ?

কথা বলার সময় আমি ক্রমশই বেশি লাজুক ও কাঁচুমাচু হয়ে যাচ্ছিলুম ! সুবিমল রীতিমত ভারিক্কী চালে আমাকে ধমকে কথা বলতে লাগলো। বললো, তুই বুড়োদের মতন ভবিষ্যৎ ভাবছিস কেন ? বুড়োরা—যারা দু'দশ বছরের মধ্যে মরবেই—তারাই অপরের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চায়। বাপ-মায়েরা ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবে কেন জানিস, নিজেরা তো অতদিন বাঁচবেই না জানে, তাই ছেলেমেয়ের আগাম তিরিশ কি চল্লিশ বছরের জীবনের ছক বেঁধে দিতে চেয়ে কল্পনায় একটু ভবিষ্যৎকে দেখে নেবার সুখ পেতে চায়। আমাদের তো সে ঝামেলা নেই, আমরা আরও চল্লিশ বছরও বাঁচতে পারি, আবার আগামীকালও মরে যেতে পারি। কবে গাড়ি চাপা পড়ে কিংবা অ্যাটম বোমের ঘা খেয়ে মরে যাবো তার ঠিক নেই, আবার বলা যায় না, আরও চল্লিশ পঞ্চাশ বছরও বেঁচে যেতে পারি। আমাদের অনেকটা ইচ্ছামৃত্যু। আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবার দরকার নেই !

— আর না, আর না, চুপ কর, বড্ড বেশি বকছিস।

— না শোন, ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, সেজন্য এখনকার ভালবাসাটা নষ্ট করিস না। এখনকার ভাললাগাটা চেপে রাখলি, তারপর হয়তো ভবিষ্যতেও শান্তি পেলি না, তাতে কি লাভ ? মেয়েটার সঙ্গ তোর পেতে ইচ্ছে হয়, মেয়েটাকে তুই কাছে নিয়ে আয়। এটা বাংলাদেশ, একটা মেয়ের সঙ্গে রোজ সন্ধেবেলা তুই এমনি এমনি দেখা করবি—তা তো সম্ভব নয়। ওকে

বিয়ে করে ফ্যাল।

— ওর কি আমাকে পছন্দ হবে ?

— আরে ইডিয়েট, সেটা তুই আমার এই গোলমুখের সামনে বসে জিজ্ঞেস করছিস কেন ? ওর কাছ থেকেই জেনে নে। বী ক্লিয়ার। পরিষ্কারভাবে এসব জেনে নেয়াই তো ভালো, যদি রাজি না হয়, চুকে গেল। মনে মনে পুষে রেখে লাভ কি ? তুই এরকম ভ্যাদভেদে হয়ে গেলি কী করে ?

— মেয়েটার সঙ্গে যে আমার দেখাই হচ্ছে না। ওর বাড়িতে যেতে আমার কি রকম অস্বস্তি লাগে।

— লাগুক। বাড়িতে না গিয়ে যদি দেখা হবার উপায় আর না থাকে, তবে বাড়িতেই চলে যা। আজই যা, ওঠ।

— আরে, এক্ষুনি নাকি ? বোস।

— নাঃ, চল উঠে পরি। আমার আজ মন ভালো নেই। তোর কথা নিয়ে আমি বেশি ভাবতে পারবো না। তোর সঙ্গে বসে থাকলে এখন তোর ব্যাপারটাই আলোচনা করতে হবে। আর না, আমাকে এখন একটু নিজের কথা ভাবতে হবে।

চায়ের দোকান থেকে বেরুবার মুখেই একটি লম্বা চেহারার যুবকের সঙ্গে সুবিমলের দেখা হলো। রোগা, লম্বা, চোখে সাদা ফ্রেমের চশমা, বেশ একটা সৌখিন চেহারা। সে সুবিমলের কাঁধ চাপড়ে বললো, চলুন, আর একটু চা খাওয়া যাক। সুবিমল বললো, সুনীল, তোর সঙ্গে বোধ হয় এর আলাপ নেই, ইনি হচ্ছেন ভাস্কর চ্যাটার্জি। আমি হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আপনার নাম শুনেছি। যুবকটির মুখে একটু গর্বের ভাব, অনুচ্চিত ছোট জাতীয় গর্ব। সুবিমল বললো, জানিস তো, ভাস্করবাবু বাংলা কবিতা অনুবাদ করতে অ্যামেরিকা গিয়েছিলেন।

ভাস্কর চ্যাটার্জি বললো, দাঁড়ান সিগারেট কিনে আনি।

একটু দূরে যেতেই আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললুম, সেদিন একটা মেয়ের কথা শুনলাম, সে কথাকলি নাচ শিখতে চেকোস্লোভাকিয়া যাচ্ছে ! আজকাল এই হয়েছে একটা ঘোড়ার ডিমের কায়দা ! —সুবিমল আমার হাত টিপে বললো, চুপ শুনতে পাবে। চল আবার চা খাই। ওর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে দ্যাখ্, খুব খারাপ লাগবে না। তাছাড়া এসব লোকের সঙ্গে আলাপ রাখা ভালো ! আমি বললুম, ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে তুই কার কথা ভাববি ? ওর কথা ?

— দেখা যাক।

—আমার ভালো লাগছে না। আমি চলি রে।

ভাস্কর চ্যাটার্জির হাতে সুবিমলকে সঁপে দিয়ে আমি চলে এলাম। সুবিমলের নিজের কথা ভাবার সত্যিই সময় নেই।

১০

বারান্দায় একটা টেনিসের বোর্ড আছে আগের দিন লক্ষ করি নি। বাড়িতে যমুনা স্কার্ট পরে। একটা হালকা নীল রঙা স্কার্ট পরে ব্যাট হাতে যমুনা হরিণীর মত চঞ্চলা। হরিণীর মতন, না, হাওয়ায় গাছের ডালের মতন, না, ইঁদুরের মতন ? আসলে ওর সতর্কতা ও চঞ্চলতার সঙ্গে বাচ্চা

ইঁদুরের ছটফটানিই মেলে, কিন্তু ইঁদুরের সঙ্গে বোধ হয় কোনো রূপসী মেয়ের তুলনা দেওয়া যায় না, না ? যমুনার সঙ্গে খেলছে একটি কুড়ি–একুশ বছরের ছেলে, ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন চেহারা, সাদা ধপধপে প্যান্ট ও সার্ট সমেত। আমাকে দেখে যমুনা খেলা থামালো না, কিছুটা অবাক হয়েও উজ্জ্বল গলায় বললো, আসুন, সুনীলদা, একটু দাঁড়ান, তপনদা আমাকে পরপর দুটো গেম দিয়েছে—এবার আমি, পয়েন্ট, পয়েন্ট, আমার পয়েন্ট !

আমি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখলুম। ওদের দু'জনকেই ভারি সুন্দর ও সাবলীল দেখাচ্ছে। নিজেকে আমার খুব বয়স্ক ও ভারি মনে হলো। আমি জিজ্ঞেস করলুম, মা কোথায় ?

— মায়ের তো অসুখ। দাঁড়ান, দিদি আছে—দিদি—

ডাকার আগেই সরস্বতী এসে হাজির। ভাগ্যিস সরস্বতীও স্কার্ট পরে না।

কি একটা ক্রিম মুখে মাখছিল ঘষে ঘষে, প্রকাশ্য হাসিতে বললো, এলেন তা হলে সত্যি ? জানতুম—

আমার কি রকম ভয়–ভয় করতে লাগলো। কেন যে এত দুর্বল হয়ে পড়ছি বুঝতেই পারছি না। ব্যাপারটা কি ? আমি ক্ষীণভাবে বললুম, কাকীমার অসুখ শুনলাম—

—অসুখ শুনেই বুঝি দেখতে এসেছেন ?

—ঠিক তা নয়, চলো একটু দেখা করে আসি।

—মা তো এখন ঘুমোচ্ছেন। পরে দেখা করবেন, চলুন, আমার ঘরে চলুন।

—ওদের খেলাটা দেখে যাই, এই গেমটায় কী হয়।

—তোর কত পয়েন্ট রে মুন্নি ? এবারেও তপনের কাছে তিন গেম খাবি। চলুন, আমরা ওপরে যাই।

সরস্বতী এসে আমার হাত ধরলো। আমি যমুনার চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। যমুনা ও তপন পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর তপন তাকালো সরস্বতীর দিকে, যমুনা আমাকে দেখলো। যমুনার চোখে সামান্য লজ্জার ছায়া। কিসের জন্য লজ্জা ? যমুনা মুখ নিচু করেই আবার পরক্ষণে তাকালো, এবারো লজ্জা, একটু হাসলো। ওর শরীর কি এবার লজ্জা পেতে শিখছে আস্তে আস্তে ! নীল স্কার্টটার গায় লেগে সাদা বলটা আগুনের ফুলকির মতন ছিটকে উঠেছে, যমুনার ঠোঁট ও নাকের মাঝখানে—যেখানে কোনো কোনো মেয়েরও গোঁফ থাকে—সেখানে সামান্য ঘাম, ঈষৎ ছোটাছুটিতে রঙিন মেয়েলি ছাতার মতন ফুলে উঠছে ওর স্কার্ট, আমি যমুনার উরুর কিয়দংশ দেখতে পাচ্ছি। এতদিন যমুনার শরীরের দিকে একটুও লোভ করি নি, এখন হঠাৎ ইচ্ছে হলো, খেলা থামিয়ে যমুনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরি। ইচ্ছে হলো, বিনা লোভে খুবই শান্তভাবে আস্তে আস্তে ওর ঠোঁটে চুমু খাই, খুবই আস্তে আস্তে ওর উরুর ওপর দিয়ে আমার ঠোঁট দুটো ঘষে নিয়ে যাই, থার্মোমিটারের খাপ খোলার মতন সন্তর্পণে ওর বুকের জামা সরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, তুমি কি সুন্দর যমুনা ! ভর্তি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার সময় মানুষ যেমন একাগ্র হয়ে পড়ে, আমি যমুনাকে সেইরকম প্রবল একাগ্রতায়, ইচ্ছে হয় আদর করি। স্লো মোশান ছবির মতন, যমুনাকে বুকে তুলে নিয়ে আলতোভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। একজন পুরুষের পাশে এই প্রথম আমি যমুনাকে দেখলুম, এই প্রথম যমুনার শরীরের জন্য আমার সর্বশরীর উন্মুখ হয়ে উঠলো। কথাটা সজাগভাবে ভেবেই আমার খুব কষ্ট হলো, বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠলো অকস্মাৎ। যেন আমি এই মুহূর্ত থেকে কিছু একটা হারাতে শুরু করলুম। আমি যে এত অসহায়—সেকথা পৃথিবীতে আর কেউ জানে ? আমি খুবই কাতরভাবে মনে মনে বললুম, সরস্বতী, আমায় আজ ছেড়ে দাও না! আমাকে তুমি দয়া করো, আমাকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দাও যমুনাকে—আমি এর চেয়ে

বেশি কিছু চাই না।

সরস্বতী আমার হাত ধরে সামান্য টান দিল। বারান্দার কোণে এসে প্রায় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, এখানে ওরা একটু প্রেম–ট্রেম করবে, কি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন ? আমার ঘরে আসুন !

আমি যমুনার দিকে আবার তাকালুম। যমুনা এদিকে চোখ ফেরালো না। যমুনা একবার সাদা বল ও একবার তপনের মুখের দিকে চেয়ে দেখছে। হঠাৎ আমার মনে হলো, চিঠি ছাড়া যমুনাকে তপন বোধহয় আরও কিছু দিয়েছে। আমার সঙ্গে মাত্র ক'দিন ওর দেখা হয় নি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, তুমি কতক্ষণ খেলবে ?

যমুনা অতি ব্যস্ততার মধ্যে বললো, দাঁড়ান, আমি ওর গেমটা শোধ দি। আপনি দিদির সঙ্গে ...

সরস্বতী আবার আমার হাতে টান দিল।

সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠেই আড়াইতলায় ছোট ঘরটা সরস্বতীর নিজস্ব। ঘরের সিলিং এত নিচু যে আমার প্রায় মাথা ছুঁয়ে যায়, এসব ঘরে পাখা টানানো বিপজ্জনক, তাই কোণে টেবিল ফ্যান। ঘরের মধ্যেই বেসিন আর জলের কল, দেয়াল আয়না। সরস্বতী বললো, এ ঘরটা আগে দাদা ব্যবহার করতো, এখন আমার, সুন্দর না ?

সরস্বতী মুখে তখনও ক্রিম মাখা হাতটা ঘষছে। বাড়িটা বড় নিস্তব্ধ, কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু পিংপং খেলার টক্ টক্ শব্দ। কিন্তু সে শব্দও পেন্ডুলামের আওয়াজের মতন মনোযোগের আড়ালে চলে যায়। ক্রিম মাখা শেষ করে একটা ফর্সা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে লাগলো, এত জোরে যেন মুখের চামড়া উঠে যাবে। তারপর বেসিনে গিয়ে সাবানে মুখ ধুলো সরস্বতী। অন্য তোয়ালে দিয়ে আবার মুখ মুছতে মুছতে বললো, আপনি আজ ভাগ্যিস এলেন। আজ সারাটা দিন আমার এত খারাপ লাগছিল। দিনরাত বাড়ির মধ্যে আটকে থেকে থেকে—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেন, তুমি বাড়ি থেকে বেশি বেরোও না কেন ?

—বাবার কড়া হুকুম, আমার বেরুনো চলবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কেন ?

কিছুটা কৌতুকময় ভ্রূভঙ্গি করে ও বললো, আমি যে বাড়ি থেকে বেরুলেই যার–তার সঙ্গে মিশে একটা না একটা গণ্ডগোল করি !

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এখন চুল আঁচড়াচ্ছে সরস্বতী। ওর সব কিছুই জোরে জোরে, এত জোরে চিরুনি চালাচ্ছে যে যেন চুলগুলো ও উপড়ে আনতে চায়। হাত দুটো উঁচু করার সময় আমি ওর দু'জোড়া স্তন দেখতে পাই—এক জোড়া স্বচক্ষে ও এক জোড়া আয়নার নারীর। আমার দিকে পাশ ফিরে আয়নায় তাকিয়েই সরস্বতী কথা বলছিল। আমি নিশ্চিত অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই জিজ্ঞেস করলুম, কি গণ্ডগোল ? আয়নার দিকে চেয়েই সরলভাবে হেসে ও বললো, আহা, কিছু বোঝেন না, না ? আমি আপনার সব জানি !

চুল বাঁধা শেষ করে, সরস্বতী মুখে আবার কি একটা ক্রিম মাখছে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপারটা কি বলো তো ? একবার ক্রিম মেখে সাবান দিয়ে ধুলে, আবার ক্রিম মাখছো। সরস্বতী বললো, কিচ্ছু জানেন না, এটা ক্রিম নয়, এটা ফাউন্ডেশন। এরপর পাউডার।—সত্যিই দেরাজ থেকে বার করে গোলাপি রঙের পাউডার মুখে বুলোতে লাগলো, তারপর ঘাড়ে ও গলায়, কানের লতির পিছনে, বুকে অনেকটা ব্লাউজের মধ্যে পাউডারের পাফ ঢুকিয়ে দিল আমার দিকে পিছন ফিরে—কিন্তু আমি যে আয়নায় ওকে দেখছি, ও সেকথা জানে। আবার একটা তোয়ালে দিয়ে মুখ ও গলার সেই পাউডার মুছতে লাগলো। যেন ও আমাকে পরপর খেলা দেখাচ্ছে, যেন

আমি একাই বহু দর্শক, অথবা আমি একটা ক্যামেরা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, তুমি এখন বেরুবে নাকি, এত সাজগোজ ! সরস্বতী তখন ঠোঁট উল্টে ন্যাচারাল কালার লিপস্টিক ঘষছে, সেইভাবেই বললো, উঁহু ! তারপর লিপস্টিক রেখে ওডি-কোলনের শিশি হাতে নিয়ে ফের বললো, কেন, বাড়িতে থাকলে বুঝি সাজ করা যায় না ? সাজতে ইচ্ছে করে মন ভালো করার জন্য !

আয়নার মধ্যে তাকিয়ে মনে হলো, আমি অনেক দূরে বসে আছি। আমি যেন সরস্বতীকে অনেক দূর থেকে দেখছি। একথা নিশ্চিত; আমার এখানে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। খানিকটা লোভ হতেও পারে। কিন্তু লোভ আর ভাললাগা তো এক নয় ! আমি পা দুটো কোনাকুনি করে এমন জোরে চাপ দিলুম যে—বাঁ পাটা ব্যথায় টন্‌টন করতে লাগলো ! একটা সিগারেট জ্বেলে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটা অনেকক্ষণ ধরে রইলুম, আগুন এসে আঙুলে ছ্যাঁকা দিতে লাগলো, তবু ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

প্রসাধন শেষ করে শরীরময় সুগন্ধ মেখে সরস্বতী আমার খুব কাছাকাছি এসে বসলো খাটের ওপর। খাটের স্প্রিংয়ে ঝপ করে শব্দ হলো। মুখ তুলে সরস্বতী বললো, এবার বলুন !

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি বলবো ?

—বাঃ, আমার ঘরে এলেন, এতক্ষণ বসলেন, কিছু কথা বললেন না ? 'আমার ঘরে' কথাটা কানে খট করে লাগলো। খুব চেনা। 'বসলেন' শব্দটাও চেনা। শুধু 'কথা' শব্দটা কেমন যেন অপরিচিত। আমার কাছে ও কথা শুনতে চায় ? আমি দুর্বলভাবে হেসে জিজ্ঞেস করলুম, কি কথা বলবো বলো তো ?

—একটা কিছু অন্তত বলুন !

—একটা কিছু ভালো কথা তা হলে ভাবতে হয় তো। তোমাকে এখন খুব সুন্দর দেখাচ্ছে

—একথাটা তো বলা যায় না, না ? এ তো পুরোনো হয়ে গেছে। অনেকের কাছ থেকেই নিশ্চয়ই শুনেছো।

—অনেক পুরোনো কথাও মাঝে মাঝে শুনতে মন্দ লাগে না। ধ্যাৎ ! আপনি একটা কিচ্ছু না ! আপনি হাত দেখতে জানেন ? তা হলে আমার হাতটাই দেখুন।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, এ জিনিসটা একেবারেই পুরোনো। আজকাল আর চলে না। শোনো সরস্বতী, কাকীমার কী হয়েছে ? কঠিন অসুখ ?

—এমন কিছু না, মা'র মাঝে মাঝে হাঁপানির টান ওঠে। ক'দিন বৃষ্টি পড়েছে তো।

—চেহারা দেখলে তো বোঝা যায় না, ওঁর হাঁপানি আছে ?

—চেহারা দেখলে কি সব কিছু বোঝা যায় ? আপনার চেহারা দেখলে কি বোঝা যায়, আপনি একটা মিটমিটে বদমাশ ?

আমি সত্যিকারের অবাক হয়ে সরস্বতীর দিকে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার বলো তো ? আমার সম্বন্ধে তোমার এ ধারণা হলো কেন ? আমি কি বদমাইশি করেছি ?

—থাক্, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। সব জানি। পুরুষ মানুষের ন্যাকামি আমি একদম সহ্য করতে পারি না। দিন, আমাকে একটা সিগারেট দিন।

—না, মেয়েদের সিগারেট খাওয়া আমি পছন্দ করি না—

সরস্বতী জোরে হেসে উঠলো। ওর হাসিটা হি-হি ধরনের। আমি আগে তেমন শুনি নি। সবারই হাসির আওয়াজ হা-হা বা হো-হো বা খুঁ-খুঁ, সরস্বতীরটা পরিষ্কার হি-হি, কাঠঠোকরা পাখির মতন কর্কশ কিন্তু তেজি। সরস্বতী আমার শরীরের এত কাছে যে আমি ওর উত্তাপ টের পাচ্ছি। সারা বাড়িটা বড় বেশি চুপ, রাস্তা থেকেও কোনো শব্দ আসছে না, এমন কি পিংপং খেলার

শব্দও থেমে গেছে। যমুনা কি এ ঘরে আসবে না ? আমার ইচ্ছে হলো চিৎকার করে যমুনাকে ডাকি। প্রচণ্ড চিৎকার, ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষক যেমন তার হারানো গাভীকে ডাকে। জানি যদি এখন আমি উঠে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করি, সরস্বতী বাঘিনীর মতন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, আমার টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত খাবে। ওর মসৃণ মুখ ও সকৌতুক চোখের আড়ালে আমি সেই বাঘিনীর দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি। আত্মরক্ষার জন্যই আমি সরস্বতীর অলঙ্কারহীন একটি হাত তুলে নিয়ে বললুম, আমি হাত দেখতে জানি না, কিন্তু হাত ধরতে আমার ভালো লাগে।

—তারপর অতর্কিতে দুম্ করে জিজ্ঞেস করলুম, সরস্বতী, তুমি কারুকে ভালবেসেছো ?

নিস্পৃহের মতন সরস্বতী বললো, নাঃ ! সে–রকম মানুষ পেলাম কোথায় ?

—কেন, এই যে বললে, তোমার সঙ্গে অনেক ছেলে–টেলের ভাব ছিল ?

—তারা কেউ ভালবাসতে জানে না। !

—তারা না জানুক, তুমি নিজে থেকেও তো কারুকে ভালবাসতে পারতে। একদিক থেকেও তো ভালোবাসা হয়। সেইটাই আসল ভালোবাসা।

—আমার মনে হয় নিজে কারুকে ভালবাসতে পারবো না। আমায় যদি কেউ সত্যি–সত্যি ভালবাসে তবে আমিও না হয় চেষ্টা করে দেখতুম। কিন্তু সে রকম কারুকে পেলাম না। ফলে, ভালবাসার ব্যাপারটা এখনো বুঝতেই পারি নি। ছেলেরা আমাকে ভালবাসার আগেই—

আমি প্রায় ফিস্‌ফিস্ করার মতন বললুম, শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম ?

সরস্বতী বুঝতে পারলো না, সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো, এর মানে কি ? আমি বললাম, কিছু না, একটা কোটেশান।

আলস্য ভাঙার ভঙ্গিতে সরস্বতী বিছানায় অর্ধেক হেলান দিল। ওর গ্রীবার নিচে একটা ছোট্ট কাটা দাগ এখন চোখে পড়ে, সূর্যমুখী ফুলের মতন ছড়িয়ে পড়ে দুই বুক, ব্লাউজ ও শাড়ির মাঝখানে ফর্সা পেট উন্মুক্ত, সদ্য টিন কাটা কাঞ্চনের মতন উজ্জ্বল, প্রায় নাভি দেখা যায় আর কি। এ মেয়েটা একেবারে পাগল হয়ে গেছে দেখছি। ওর জন্য আমার মায়াই হলো। ইস্ আর দু'মাস আগেও যদি ও এরকমভাবে আমাকে ডাকতো তবে কি ওর নিষ্কৃতি ছিল ! খুব বাঁচা বেঁচে গেছে সরস্বতী। এখন আর আমাকে ওর ভয় নেই, ওকেই আমার ভয় । বুকের মধ্যে এখন সত্যি আমার কষ্ট হচ্ছে, সরস্বতী তো বুঝবে না। আমার হাতে আলতোভাবে তখনও সরস্বতীর হাত, সেই হাতে সামান্য চাপ দিয়ে আমি বললুম, সরস্বতী, আমায় ক্ষমা করো। সরস্বতী ধড়ফড় করে উঠে বসে অবাক হয়ে বললো, ওকি, আপনি কি করেছেন যে, ক্ষমা চাইছেন ?

আমি বললুম, সত্যি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

—কি পাগলের মতন কথা বলছেন ? আপনি ক্ষমা চাইবার মতন কি করেছেন ?

আমি কান্না লুকোবার মতন গাঢ় স্বরে বললুম, সরস্বতী, যদি তোমার কাছে কোনো দোষ না করেও থাকি, তবু অন্য যেখানে যত অন্যায় বা দোষ বা পাপ করেছি, তার জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করবে ?

—আপনার মাথায় কি আছে ? পাগল নাকি আপনি ? ক্ষমার কথা উঠলো কিসে ?

—আমি যে রকমই হই, তুমি আমায় ক্ষমা করবে কথা দাও ?

সরস্বতী এবার কোমল গলায় বললো, কি সব অদ্ভুত কথা ! আচ্ছা সব ক্ষমা করলুম।

—তা হলে আমি এবার যাই !

—কোথায় যাবেন, বসুন না !

—না, এবার যাই, লক্ষ্মীসোনা।

—ধ্যাৎ ! বসুন না।

সরস্বতী আমার হাত হ্যাঁচকা টান দিয়ে বসিয়ে দিল, তারপর আমার চুলের মধ্যে হাত দিয়ে বললো, ছেলেমানুষ একটা।

—আমি আন্তরিক অনুনয়ে বললুম, সরস্বতী, এবার সত্যিই আমাকে যেতে হবে !

—যাবেন তো যান না। আমি কি আপনাকে জোর করে ধরে রেখেছি ?

—তা হলে যাই ?

—আপনি মুন্নির সঙ্গে কিছু করেন নি তো ?

আমি প্রবলভাবে চম্‌কে উঠে বললুম, কী বলছো যা-তা !

সরস্বতী সে কথায় কান না দিয়ে বললো, ওর সঙ্গে কিছু গণ্ডগোল করতে যাবেন না, ওর কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, তাছাড়া, তপনের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

—কী বলছো কি ? এ তোমার অন্যায়, ছি-ছি !

—আহা রাগ করছেন কেন ! এমনি বললুম। মুন্নিটা দেখতে দেখতে আমার কমপিটিটার হয়ে উঠলো।

—যমুনাকে আমার খুব ভালো লাগে।

—ঐ পর্যন্তই থাক্। আর বেশি না।

—আমাকে এবার যেতেই হবে, উপায় নেই।

—একটু বসুন না। কী এমন রাজকার্যে যাবেন ! একা থাকতে আমার ভালো লাগে না। একটু গল্প করি।

আমি বললাম, যমুনাকে একবার ডাকো না। ওকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

সরস্বতী স্থিরভাবে আমার দিকে তাকালো।—ও এখন তপনের সঙ্গে আছে, ওকে ডাকলে তপন কী মনে করবে ?

—তপনকেও ডাকো। আমরা সবাই মিলে গল্প করি।

আমার এ কথার কোনো যুক্তি না দেখিয়েই ও বললো, না। আমার সঙ্গে কথা বলতে বুঝি আপনার ভালো লাগে না ?

—কিন্তু তোমার সঙ্গে তো কথা বলার আরও অন্য অনেকে আছে।

—না, আমার কেউ নেই।

আমি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। সরস্বতী আমার ঊরুতে প্যান্টের ওপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগলো। তারপর আমার একটা হাত তুলে নিয়ে বললো, বেশ শক্ত হাত ! হঠাৎ আমার একটা আঙুল ওর মুখে পুরে কুট করে কামড়ে দিল। আমি অনড় হয়ে লক্ষ করছি। সরস্বতী বললো, কী চুপ করে রইলেন যে ? ছেলেমানুষ, যে-ক'জনকে দেখলুম, সবাই ছেলেমানুষ।

সরস্বতী আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। আমি তৎক্ষণাৎ দু'হাতে ওর মাথাটা তুলে ধরে বললুম, এই, কি অসভ্যতা করছো ?—অবাক হয়ে ও মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হলো ?—আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, না, ওসব নয়, আমি চলি—

সেইরকম অবাক ভঙ্গি রেখে ও বললো, এর মধ্যে অসভ্যতার কি হলো ?

সারাদিন আমার মনটা কিরকম ভিজে নরম ছিল। এবার ধুৎ তেরিকা ভাবটা ফিরে এলো। আমি রুক্ষ গলায় বললুম, ওসব আমি ঢের জানি। আমার দ্বারা হবে না, আমি চললুম।

—আপনি একটা ইতর।

—না হয় হলুমই ইতর, কিন্তু তুমি আমায় ক্ষমা করবে বলেছিলে।

—আপনার মনটাই নোংরা, তাই সব জিনিসকে আপনি খারাপ দেখেন।

—আমি যা-ই হই, তুমি আমায় ক্ষমা করবে বলেছিলে।

—আপনি একটা ছোটলোক !

আমি সরস্বতীর দিকে খর চোখে তাকিয়ে ছিলাম। একবার আমার শরীরটা দুলে উঠেছিল, দু'এক মূহূর্ত আমার মাথার মধ্যে ওলটপালোট হয়ে গিয়েছিল, আমি সামান্য নিচু হয়েছিলাম ঝুঁকে পড়ার জন্য, ভেবেছিলাম, ঝুঁকে সরস্বতীকে দু'হাতে ধরে তুলে এনে বুকের মধ্যে পিষে ধরি, দাঁত দিয়ে ওর ঠোঁট কামড়ে ধরে বলি, শরীর, তুমি কতটা শরীরের খেলা খেলতে পারো, এসো দেখাচ্ছি। কিন্তু, দু'এক মুহূর্ত মাত্র। ঝুঁকে পড়েও আমি সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিরুত্তাপ গলায় বললুম,—আমার ছোটলোক থাকাই ভালো। ভদ্দরলোক হয়ে আমার দরকার নেই।

ঝট করে দরজা খুলে আমি বেরিয়ে এলুম, সরস্বতীও পিছন পিছন এলো। সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমেছি এমন সময় বাইরে থেকে জগদীশ রায় ঢুকলেন। রেন্ কোট গায়, মুখ গম্ভীর। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখলেন, গ্রাহ্য করলেন না, ভারি গলায় প্রশ্ন করলেন, সতী, ডাক্তার এসেছিল ?

সরস্বতী আমার পিছন থেকে উত্তর দিলো, হ্যাঁ ! মাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন।

—দেখি প্রেসক্রিপশনটা।

বারান্দায় যমুনারা নেই। টেবিলের দু'পাশে দুটো ব্যাট, হালকা সাদা বলটা হাওয়ায় একটু একটু গড়াচ্ছে। আমি অবসন্ন শরীরে বেরিয়ে এলাম। হাত দুটো বারবার মুঠো করতে আর খুলতে ইচ্ছে হয়।

১১

—কী, পাগল হয়ে গেছে ?

কেউ আমার কথার কোনো উত্তর দিলো না। দেখলে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড, নূরজাহান বেগমের পরনে নীল চুমকি বসানো শাড়ি, কিন্তু ব্লাউজ নেই, শুধু ব্রেসিয়ার, সমস্ত চুল এলোমেলো, চোখের জল আর সুরমায় মুখ মাখামাখি, দেয়ালে মাথা ঠুকছে আর বুক নিঙড়ানো গলায় বলছে, চিনতে পারলো না, চিনতে পারলো না !

শেখর আর অবিনাশ খাটের ওপর নীরব হয়ে আছে পা ঝুলিয়ে, খাটের মাঝখানে চিন্তামণিবাবু, আবদুল হালিম সান্ত্বনার হাত এগিয়ে নিবিড়ভাবে বলছে, সাধনা, শোনো, শোনো—। তাকে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে নূরজাহান। এবার চোখ পড়লো খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা দশ-এগারো বছরের বাচ্চা ছেলে, ফ্যাকাশে মুখ।

দেয়ালে এতো জোরে কপাল ঠুকছে নূরজাহান যে দুমদুম করে শব্দ, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে বললো, জিতু, চিনতে পারলি না ! ছেলেটা কোনো উত্তর দিল না। নূরজাহান তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করলো, জিতু—। ঐতিহাসিক নাটকের করুণ ভূমিকায় অভিনয়ের সময় নূরজহান নিশ্চয়ই এইরকম কণ্ঠস্বর বার করে, আতিশয্যময় কিন্তু আন্তরিক ও মর্মভেদী। ঘরের হাওয়ায় অনেকক্ষণ ধরে ওর করুণ চিৎকার ভাসতে লাগলো।

চিন্তামণিবাবু অপ্রসন্নভাবে বললেন, আস্তে—। একটা সম্ভব অসম্ভব আছে তো। কি করে চিনতে পারবে—আট ন'বছর বাদে দেখছে, তখন ওর বয়েস দু'বছর না তিন বছর ছিল।

—আমি তো চিনতে পেরেছি, আমি—

— সে কথা আলাদা। এখানে ওই ছেলেটাকে আনা মোটেই উচিত হয় নি, এই পরিবেশের

মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলেকে আনা—

— আপনি চুপ করুন ! জিতু—চিনতে পারলি না, আঃ বড্ড কষ্ট হচ্ছে, আঃ, জিতু, কেন আমি মরে যাই নি !

— ও কি, ছেলেটাকে অত জোরে চেপে চেপে ধরছো কেন ? দম আটকে যাবে যে।

—আপনি চুপ করুন ! ঐ লোকটাকে তোমরা চুপ করতে বলো না। ! আঃ বড্ড কষ্ট হচ্ছে, বড্ড কষ্ট হচ্ছে আমার।

আবদুল হালিম বললো, সাধনা, সেই ওষুধটা খেয়ে নাও একবার।—চিন্তামণিবাবু অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, ওষুধে আর কি হবে ? নূরজাহান চেঁচিয়ে উঠলো, আঃ, এতো কথা কেন, চুপ করুন না, ওঃ, কেন মরে যাই নি—

চিন্তামণিবাবু রেগে উঠে বললেন, এটা আমার ঘর, এখানে আমি ওসব সহ্য করবো না। বীণা, বীণা—

বীণা বাইরে থেকে এসে চুপ করে দাঁড়ালো। বীণাও আড়ালে কাঁদছিল। চিন্তামণিবাবু বললেন, বীণা, এখান থেকে এসব বিদায় করে দাও। আমার এসব পছন্দ হয় না ! কাল এসে এদের কারুকেই দেখতে চাই না আমি।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা ভদ্দরলোকের ছেলে, আপনাদেরও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়া উচিত হয় নি। এখানে একটু আনন্দ–ফুর্তি করতে আসা, তা না, এখানেও ঝঞ্ঝাট আর কান্নাকাটি। কাল এসে এসব কিছু দেখতে চাই না !

নূরজাহান হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, আঃ, এত কথা কেন ? ওকে চুপ করতে বলো না ! আঃ—

—তুই চুপ কর মাগী !

কান্না থামিয়ে নূরজাহান এবার ঘাড় উঁচু করে তাকালো। অবিকল রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গি। শান্ত–গম্ভীর গলায় বললো, এই ঘরটার জন্য আপনার কত টাকা খরচ হয়েছে ? আমি এক্ষুনি সব দিয়ে দিচ্ছি। আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে। আব্দুল, টাকা দিয়ে দাও তো লোকটাকে!

চিন্তামণিবাবুর মুখখানা অপমানে বেগুনি হয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কি, আমাকে টাকার গরম দেখাচ্ছে ! আমাকে ! আপনারা সবাই সহ্য করছেন। আপনারা কিছু বলছেন না?

আমরা কেউ–ই চিন্তামণিবাবুর কথার কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করলুম না। পানের ডিবেটা ফটাস করে বন্ধ করে পকেটে ভরে চিন্তামণিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর, আর একটিও কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আবদুল হালিমের মুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন। বীণার মুখে ভয়। বাচ্চা ছেলেটার মুখে ভয়। একমাত্র অবিনাশ নিরেট মুখে বসে আছে। নূরজাহান সমানভাবে দাপাদাপি করতে লাগলো, পাগল হয়ে যাবার চিহ্ন পুরো ফুটে উঠছে। ব্রেসিয়ার পরা তীক্ষ্ণবুক দুলে দুলে উঠছে প্রতিটি নিঃশ্বাসে, যেন দম টানতে ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। চোখ দুটি সম্পূর্ণ বিস্ফারিত ও লাল, হাত যখন ছড়াচ্ছে হাত ভর্তি জড়োয়ার গয়নার ঝুমঝুম শব্দ। আবদুল হালিম দু'হাতে ধরে আছে ওকে, নূরজাহান ব্যাকুলভাবে ছটফট করতে লাগলো, বারবার হাত ছাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে ছেলেটাকে, ছেলেটা মুখ–চোখ শুকনো করে তাকাচ্ছে ঘরের সবার মুখের দিকে সাহায্যের আশায়। অসম্ভব জোরে ছেলেটাকে চেপে ধরে তার মুখখানা উঁচু করার এমন প্রবল চেষ্টা করছে নূরজাহান যে, আবদুল হালিমই ছেলেটাকে ছাড়িয়ে দিল। দু' হাতে হাওয়া আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে নূরজাহান ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। পড়ার সময় ওর মাথাটা এমনভাবে ঠুকে গেল মেঝেতে যে, আমি শিউরে উঠলুম। বীণা আর শেখর গিয়ে তাড়াতাড়ি ওর মাথাটা কোলে তুলে নিল, আবদুল হালিম

উদ্‌ভ্রান্তের মতন বললো, কেটে গেছে নাকি ? রক্ত বেরিয়েছে !

শেখর ওকে বললো, না, ঠিক আছে ? এখন কি করবেন ! কোনো ওষুধ।

—এখন তো ওষুধ খাওয়ানো যাবে না। দাঁতে দাঁত চাপা।

—কি করা হবে তা হলে এখন ?

—চোখে মুখে একটু পানি ছিটিয়ে দিলে, একটু পরেই ভালো হয়ে যাবে।

বাচ্চা ছেলেটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রোগা পাতলা ছেলেটা, মুখখানা সুন্দর, মাতৃস্নেহহীন ছেলেরা সাধারণত অল্প বয়সেই বখে যায়, কিন্তু ওর মুখে সে ছাপ নেই। আমি অবিনাশের সঙ্গে চোখাচোখি করলুম। তারপর ওর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম, ছেলেটা এখানে কি করে এলো ?—অবিনাশ নির্লিপ্তভাবে বললো, চুরি করে আনা হয়েছে।

—আমি আঁতকে উঠে বললুম, চুরি ?

অবিনাশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, তা ছাড়া আর তো উপায় ছিল না। অজয়টা একটা স্কাউন্‌ড্রেল, নূরজাহানের কাছ থেকে খালি টাকা খিঁচতে চায়। কিন্তু ছেলেটাকে দিতে চায় না, ছেলেটির জন্য না-কি ওর নিজের খুব মায়া। সে লোকটার যা চেহারা, দেখলে তো মনে হয় না দয়া মায়া বলে শরীরে কোনো পদার্থ আছে। এদিকে নূরজাহানের তো এই অবস্থা, প্রত্যেক দিন চারবার-পাঁচবার করে ফিট হচ্ছে, কেঁদে-ককিয়ে একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড !

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেটাকে কে আনলো ? অবিনাশ বললো, আমিই।—তারপর একটু থেমে আবার বললো, এখন মনে হচ্ছে, ওকে আমার আনা উচিত হয় নি। ওর জন্য আমার মায়া হচ্ছে। ছেলেটার মুখখানা দেখ, কী রকম অসহায়ের মতো। অবিনাশের মুখে আমি কখনো কোনো ভুল স্বীকার শুনি নি। অবাক হবার মতই কথা।

আমি মুখ ফিরিয়ে আলতো করে ছেলেটার কাঁধে হাত দিলুম। ছেলেটা ভয়ে চমকে উঠলো। আমি বললুম, খোকা, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, শোনো, এদিকে এসো, খাটের ওপর উঠে বসো। তোমার নাম কি?

ছেলেটা শুকনো গলায় বললো, শ্রীইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত, বাবার নাম শ্রীঅজয় সেনগুপ্ত।

—তুমি কোন ক্লাশে পড়ো ?

—ক্লাশ সেভেন।

—তোমার মাকে তুমি চিনতে পারছো না ?

—এ আমার মা নয়। মা বাড়িতে আছে।

—বাড়িতে সে তোমার সৎ মা। আচ্ছা, আচ্ছা, না, সৎমা নয়, সেও তোমার মা। তোমার সেই মা তোমাকে ভালবাসে ?

—হ্যাঁ।

—তোমার বাবা তোমাকে ভালবাসে ?

—হ্যাঁ।

— আচ্ছা, এই যে এ বলছে এ তোমার মা, একে তোমার ভালো লাগছে না ?

—না। আমি বাড়ি যাবো।

—হ্যাঁ, বাড়িতে তো যাবেই, ভয় নেই। শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি তো বেশ বড়ো হয়েছো, ভেবে দ্যাখো। তোমার বাড়িতে তো তোমার একজন মা আছেন, আর এই যে এ, এও তোমার আরেকজন মা। অনেকদিন দেখো নি তো, তাই চিনতে পারছো না। তোমার এই মা ঢাকা শহরে থাকে, অনেক দূরে, সেখানে মস্তো বড় বাড়ি, অনেক খাবার-দাবার, সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পাবে, সেখানে গেলে এই মা তোমাকে যত্ন করে রাখবে খুব, তুমি সেখানে

যাবে ?

—না, আমি বাড়ি যাবো।

—বাড়িতে আমরা তোমাকে রেখে আসবো। আমাদের কি তুমি ভয় পাচ্ছো ? কিচ্ছু ভয় নেই। এই মায়ের কাছে তোমার থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না ? দেখো, তোমার জন্য ওর কত কষ্ট !

ছেলেটা চুপ করে রইলো। আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম, কি করবে ? ঐ যে অজ্ঞান হয়ে গেছে, ওকে তোমার একটুও মনে পড়ে না ?

ছেলেটা কান্নার উপকণ্ঠে বললো, আমাকে বাড়িতে দিয়ে আসুন না !

আমি বললুম, যাবে, এক্ষুনি যাবে। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে ?

—না।

আমি মুখ ফিরিয়ে ছেলেটা যাতে বুঝতে না পারে, এই জন্য ইংরেজিতে অবিনাশকে বললুম, মুশকিল কি জানিস, নূরজাহানের মুখের মধ্যে কোনো মায়ের ছাপ নেই, সেই জন্যই ওকে চেনা যাচ্ছে না। তাকিয়ে দ্যাখ, ওকে কেউ মা বলে ভাবতে পারে ? মনে হয় না, ঐ দেহটা শুধু পুরুষেরই জন্য, কোনো শিশুর জন্য নয় !

অবিনাশ বললো, কিন্তু ছেলের জন্য ওর এতো ব্যাকুলতা, সেটা খাঁটি। এতো কান্নাকাটি আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

—ওর ব্যাকুলতা যাই থাক, ছেলেটার কথাও তো ভাবতে হবে। ছেলেটার পক্ষে ওকে মা বলে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, সৎমা সম্বন্ধে আমাদের যা-ই ধারণা থাক, আমার মনে হয়, ওর সৎমা ওকে ভালবাসে। ছেলেটার মুখ দেখলে বোঝা যায়, ও একেবারে স্নেহবঞ্চিত নয়।

নিচ থেকে শেখর বললো, কয়েকদিন নূরজাহানের সঙ্গে একসঙ্গে থাকলেই ও চিনতে পারবে। মা-কে ঠিক চেনা যায়, কুড়ি পঁচিশ বছর পরে দেখলেও চেনা যায়।

অবিনাশ ধমকে উঠলো, বাজে বকিস নি। ওসব নভেল-নাটকের কথা, বাজে যত সব ! ছেলেটার মনে যখন মায়ের অভাব নেই, তখন ওর এখানে থাকারও দরকার নেই। তাছাড়া চুরি করে একটা ছেলেকে লুকিয়ে রাখা সোজা নাকি ? ঝঞ্ঝাট !

নূরজাহানের জ্ঞান ফিরে আসছে। বীণা চামচে করে ওষুধটা ঢেলে দিল। বোবার মতন চোখ চেয়ে নূরজাহান ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।

আবদুল হালিম আমাদের কাছে এসে বললো, এখন কি করা যায় বলুন তো ?

আবদুল হালিমের জন্য আমার বেশ মায়া হলো। লোকটির মুখ সত্যিকারের অসহায়ের মতন। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে বলেই পায়ে জোর নেই। এই নাটকীয় ঘটনায় ওর ভূমিকাটা ঠিক করে নিতে পারছে না। আমার একবার ইচ্ছে হলো বন্ধুর মতো ওর কাঁধে হাত রাখি।

অবিনাশ ভুরু কুঁচকে বললো, ওকে আপনি কলকাতায় আনলেন কেন ? বিষণ্নভাবে আবদুল হালিম বললো, না এনে উপায় ছিল না। কত অসুবিধে করে আনতে হয়েছে, তা কল্পনাও করতে পারবেন না। কিন্তু না আনলে সাধনা ওখানে মরে যেতো।

—বেশ তো, এখন তো দেখলেন কোনো সুবিধে হচ্ছে না। বরং ছেলেকে চোখের দেখা দেখতে পেল এই যথেষ্ট, এখন ফিরে যাক।

—কিন্তু ও যে ফিরতে চাইছে না। ও বলছে, ছেলেকে না পেলে ও এখানেই থেকে যাবে।

আমি বললুম, না, তা সম্ভব নয়, ওকে ফিরতেই হবে। ওর এখানে আর থাকা চলবে না।

অবিনাশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন, তুই একথা বলছিস কেন ?

আমি বললুম, তা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়, সাধনার পক্ষে এখানে থাকা মানায় না। ও একবার এখান থেকে পালিয়েছে, আর ওর ফেরা অসম্ভব। ভোগসুখ আর টাকা-পয়সার লোভে একদিন সব ফেলে পালিয়েছিল, তাতো পেয়েছেই—এখন আবার সন্তানের স্নেহটুকুও চাই—এক জীবনে সব পেতে হবে তার কোনো মানে নেই।

আবদুল হালিম হঠাৎ আমাকে বললে, আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, না ? সেদিনও আমার মনে হয়েছিল।

—আমি যে-কোনো মেয়েরই তৃতীয় পক্ষের স্বামীকে ঘৃণা করি, সেটা কোনো কথা নয়, বোম্বের কোনো ভুঁড়িদাস হলেও করতুম, আপনি এখন ওকে নিয়ে চলে যান বরং—

—আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না। আমি সত্যিই ওকে ভালোবাসি। ও যেতে চাইছে না, ওকে ফেলে আমি একাও যেতে পারবো না। এখন এই অবস্থায় ওকে দেখে আমার আরও... বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই ওকে ভালবাসি।

অবিনাশ বিরক্তভাবে বললো, ধুত্তুরি নিকুচি করছি ভালবাসার। এখন এই জট ছাড়াবেন কী করে ?

নূরজাহান আস্তে আস্তে বললো, চলে গেছে ? বীণা ও চলে গেছে ? জিতু—আঃ আমি কেন মরে যাই নি ?

শেখরের বুকে ভর দিয়ে নূরজাহান ফোঁপাতে লাগলো। শেখর আস্তে আস্তে বললো, বীণা, ওকে একটু ধরো তো, আমার মাথা ঘুরছে আবার।

আমি ছেলেটির কাঁধে হাত দিয়ে বললুম, ইন্দ্রজিৎ, লক্ষ্মী ছেলে, তুমি একবার ওর কাছে যাও তো ! এমনিই, মনে করো তোমার কেউ হয় না; তবু একবার কাছে গিয়ে বসো।

চোখ দিয়ে শেখরকে ইশারা করলুম, নূরজাহানের শাড়িটা ঠিক করে দিতে। বিস্রস্ত, এলোমেলো, ফর্সা উরু পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে, ছেলের পক্ষে এ দৃশ্য দেখার নয়। ছেলেটি ভয়ে বিহ্বলতায় তবু চুপ করে বসে রইলো। অবিনাশ বললো, চলো, আমার সঙ্গে, চলো, একটু পাশে বসবে—।

হাত ধরে ছেলেটিকে খাট থেকে নামাতেই নূরজাহান ওর ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আকুলভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলো, জিতু, জিতু, উঃ, হ্যাঁরে, উনি, তোর বাবা তোকে মারে না তো ? ওঃ, তুই আমার সঙ্গে যাবি না ? সোনা, সোনা, তোর জন্য আমি কত বড় বাড়ি বানিয়ে রেখেছি, ওঃ, ওঃ, বুকে বড় লাগছে, আর বাঁচবো না বেশিদিন, তুই আমার সঙ্গে থাকবি, কাছে কাছে।

ছেলেটা এতক্ষণ বাদে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। ওর কান্নায় মুহূর্তে সারা ঘর স্তব্ধ হয়ে গেল। সেই সময় আমরা ঘরের সকলেই বোধ হয় একসঙ্গে ভেবেছিলাম, তাহলে কি ছেলেটা ওর মাকে চিনতে পেরেছে ? মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়েই শিশু যেমন কাঁদে সেইরকম দ্বিতীয়বার মাকে পেয়ে ছেলেটা কেঁদে উঠলো ? আমাদের সকলেরই বোধ হয় চোখ জলে ভিজে আসছিল।

ছেলেটা অবিনাশকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলুন, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলুন, আমি আর এখানে থাকবো না।

অবিনাশ বললো, আর এতো কান্নাকাটি সহ্য হয় না। খোকা তুমি সত্যিই এখানে থাকতে চাও না ?

—না।

—ঠিক আছে, চলো আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি !

হাঁটু গেঁড়ে বসে নূরজাহান ছেলেটার কোমর চেপে ধরে বললো, না, না, না, যাবে না, যাবে না !

অবিনাশ নিচু হয়ে কোমল গলায় বললো, নূরজাহান, তুমি ওকে চোখের দেখা দেখলে এই তো যথেষ্ট। এবার ছেড়ে দাও, ও এখানে থাকবে না—

—না, না, না, না, আমি পারবো না।

অবিনাশ জোর করে নূরজাহানের হাত ছাড়িয়ে বললো, এসো খোকা। শেখর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললো, না, এখন নিয়ে যাস নি, আর একটু থাক।

অবিনাশ বললো, কি করছিস, আর ওকে এখানে রাখার কোনো মানে হয় না। ঘণ্টা তিনেক হ'ল এনেছি, ছেলেটা একটা কিছু খাবার মুখে দেয় নি, বারবার বলছে, বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো। নূরজাহান ওর মা নয়, বাড়িতেই ওর মা আছে।

—আমি বলছি ও এখানে থাকবে। দেখছিস না নূরজাহানের কি অবস্থা ? অবিনাশ বললো, নূরজাহানের যা অবস্থা তাতে ওর ছেলের দরকার নেই, চিকিৎসার দরকার।

ছেলেটা জোর করে অবিনাশকে ধরে আছে, শেখর ওকে ছাড়িয়ে নিতে গেল। অবিনাশ চোয়াল কঠিন করে বললো, শেখর, যদি পাগলামি করিস, তোকেও আমি মারবো বলছি। আমি ছেলেটাকে এনেছি, আমি ওকে ফেরত দিয়ে আসবো। ছেড়ে দে—

তবু শেখর আর নূরজাহান দু'জনেই ছেলেটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করলো। প্রবল শক্তিতে ওদের ধাক্কা দিয়ে অবিনাশ বললো, সুনীল, তুই ওদের আটকা তো। আমি দ্রুত এসে শেখর আর নূরজাহানকে প্রতিরোধ করে দাঁড়িয়ে আবদুল হালিমের দিকে চেয়ে শান্তভাবে বললাম, আপনি এর মধ্যে আসবেন না। আবদুল হালিম বিমর্ষভাবে দেওয়ালের দিকে সরে যেতে যেতে বললো, না, আমার এতে কিছু করার নেই। নূরজাহান তবু চেঁচিয়ে উঠলো, আবদুল, ওকে ধরো, জিতুকে আমার চাই—

কিছুক্ষণ ঝটাপটি হলো। নূরজাহান ছেলেটার হাত এমনভাবে চেপে ধরেছিল যে মুচড়ে গেছে হাতটা, আমি এক হ্যাঁচকায় নূরজাহানকে ছাড়িয়ে নিলাম, অবিনাশ ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিল। ছেলেটাকে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল অবিনাশ। নূরজাহান দরজা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়লো। অবিনাশের ধাক্কা খেয়ে ঘুরে পড়তে গিয়ে খাট ধরে সামলে নিয়েছিল শেখর, দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

আমি ফিরে এসে চেয়ারে বসে, আবদুল হালিমকে বললাম, সিগারেট আছে আপনার কাছে ? আমার ফুরিয়ে গেছে।

চুপ করে সিগারেটটা টানতে লাগলাম। বীণা গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া নূরজাহানের পাশে গিয়ে বসলো। আবার ফিট হয়েছে বোধ হয়। বীণার মুখে আজ কোনো কথাই নেই প্রায়। এ বাড়ির প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটই হাফ-গেরস্তদের, চেঁচামেচি একটু-আধটু লেগেই আছে—তাই অন্যরা কেউ এসে উঁকি মারে নি।

শেখরকে দেখে মায়া লাগে। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, মাথার চুল জট পাকানো গোছের। এই বুঝি শেখরের চেঞ্জে আসা ? মনে মনে ঠিক করলুম, ওকে আজ এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, ওর মাকে কথা দিয়েছিলুম। আমার তো আর কোথাও ফেরা হলো না ! হঠাৎ যমুনার কথা ভেবে অল্প বুক ব্যথা করতে লাগলো। যমুনাদের বাড়ি থেকে আসার পর দু'দিন পর্যন্ত কোথাও আর যাই নি, সন্ধেবেলা চুপ করে বাড়িতে এসে শুয়ে থাকতাম। আমি যা ভাবি, তার প্রত্যেকটাতেই ভুল হয়ে যায়। যমুনাকে পেয়ে আমি বেঁচে উঠেছিলাম, সেই বেঁচে ওঠার মধ্যে কোনো দোষ ছিল কি ? তবু কেন ভুল হলো, যমুনাকে আর আমি কিছুতে পেলাম না !

আরও দু'বার ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম, দু'বারই ফোন ধরেছে সরস্বতী, আমি বিরক্তিতে ফোন নামিয়ে রেখেছি। তখন বুঝতে পেরেছিলাম, যমুনাকে আমি পাবো না, কিন্তু সন্ধেবেলা একা বাড়ি ফিরে ঘরে শুয়ে থাকাও আমার নিয়তি নয়। দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে আমি বললাম, চল শেখর, আজ বাড়ি চল।

অবিনাশ চলে যাবার পর দশ মিনিটও কাটে নি, সারা বাড়ি জুড়ে ভারি ভারি পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, একতলায় অস্পষ্ট গোলমাল, বীণার ঘরের দরজা ধাক্কাতেও হলো না। দরজা খোলাই ছিল, পুলিশ এসে ঢুকলো।

পুলিশের সঙ্গে যে রোগা লোকটা সে নূরজাহানকে দেখিয়ে উত্তেজিতভাবে বললো, এই তো, এই তো সেই মাগীটা।

নূরজাহান অবাক চোখ মেলে লোকটার দিকে তাকালো। সেই চাহনি দেখলেই বোঝা যায়, লোকটার নাম অজয়।

ঘরের মধ্যে দু'জন ইন্সপেক্টর, রিভলবার টিভলবার সমেত, বাইরেও কয়েকজন পুলিশ। এদের মধ্যে একজনকে আমি চিনি, সেই ডগলাসি গোঁপ, সরস্বতী একে সান্যালদা বলে ডেকেছিল, একদিন ওর জিপ গাড়িতে আমি উঠেছিলাম। আমি হাসি হাসি মুখে লোকটির দিকে তাকালাম, কিন্তু সে চিনতে পারার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখালো না। কর্কশ গলায় জনসাধারণের উদ্দেশে বললো, ছেলেটা কোথায় ?

কেউ কোনো উত্তর দিল না। শুধু নূরজাহান পাগলাটে ধরনের খিলখিল হাসি দিয়ে বললো, ছেলে নেই, ছেলে তো নেই ! কোনো ছেলে নেই ? কেউ ছেলে পাবে না !

বীণাও বললো, কার কথা বলছেন ? আমার কোনো ছেলে-টেলে তো নেই ! একজন ইন্সপেক্টর ওকে এক ধমক দিল। সঙ্গের লোকটা বললো, জিতু ? জিতু—বেরিয়ে আয় !

কোনো সাড়া নেই। ইন্সপেক্টর সান্যাল ঝট করে আবদুল হালিমের জামার কলার চেপে ধরে বললো, ছেলে কোথায় লুকিয়েছো ? বার করো !

বেপরোয়া ভঙ্গিতে ইন্সপেক্টরের হাত চেপে ধরে দৃঢ় স্বরে আবদুল হালিম বললো, গায় হাত দেবেন না ! ইচ্ছে হয় থানায় নিয়ে চলুন, সেখানে যা বলার বলবো !

আমি আর শেখর আবদুল হালিমের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। শেখর কড়া গলায় বললো, ভদ্রভাবে কথা বলুন।

রান্নাঘর সমেত বীণার ফ্ল্যাট ও বাড়ির অন্যান্য জায়গাও খুঁজে দেখা হলো। তারপর ইন্সপেক্টর আবার ঘরে ঢুকে জনসাধারণের উদ্দেশে বললো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিন। আপনাদের সবাইকেই থানায় যেতে হবে।

জাল বসানো কালো ভ্যানে চড়িয়ে আমাদের নিয়ে আসা হলো জোড়াবাগান থানায়। খুব আস্তে আস্তে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শেখর বীণার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে নামলো গাড়ি থেকে, ওর এখনো মাথা টলটল করছে। আবদুল হালিম নূরজাহানকে ধরে ধরে নামালো। ওর এখন আচ্ছন্নের মতন অবস্থা। প্রথমেই হাজতে না ঢুকিয়ে বড়বাবুর সামনের কাঠের বেঞ্চিতে আমাদের বসতে বলা হলো। বড়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, আপনারা নিজেদের মধ্যে এখন কোনো কথা বলবেন না।

শেখর তবু সরলভাবে প্রশ্ন করলো, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি দয়া করে বলবেন ?

বড়বাবু চোখ তুলে শুধু শেখরের দিকে তাকালেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। আবার ফাইল ও ডাইরিবুকের মধ্যে ডুবে গেলেন। আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। সিগারেট খাওয়াও সমীচীন হবে কিনা বুঝতে না পেরে সিগারেটও ধরালুম না।

বহু লোকজনের আনাগোনা, এমন কি পুলিশদের মধ্যে হাসাহাসিও হতে লাগলো নানা বিষয়ে। একজন হাজতের বিচারাধীন কয়েদী নাকি রোজ সকালবেলা রামধুন গান গেয়ে ঘুম ভাঙায় সবার, এই নিয়ে দু'জন দারোগা খুব হাসতে লাগলো। কথাটা শুনে আমারও হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু দারোগার কথায় আসামীর বোধ হয় হাসা উচিত নয় ভেবে হাসি গিলে ফেলছিলাম। একজন দারোগা আমাদের সম্পর্কেই বললো, স্যার, এদের কি রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে নাকি ! বড়বাবু চকিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। একটা নেমন্তন্ন লাগিয়ে দাও ! তারপর আবার বললেন, এখনো লালবাজার থেকে ডিরেকশন পাই নি !

দু' তিনটে টেলিফোনের দু' তিনরকম আওয়াজ শুনতে শুনতে ঝিমুনি এসে যাচ্ছিল, একটু বাদে আবার গাড়িতে তুলে লালবাজারে আনা হলো আমাদের। গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকেই থেমে গেল। এর আগে আমি দু'তিনটে থানায় গেছি, লালবাজারে কখনো আসি নি। আমার ধারণা ছিল, গেট দিয়ে ঢুকে বোধ হয় বহুদূরে কোথাও গারদখানা। কিন্তু গারদখানার মতো দেখতে নয়, কাছেই একটা বাড়ির একতলার একটি সাধারণ ঘরে আমাদের বসতে দেয়া হলো, ঘরটার দরজায় শুধু লোহার রেলিং দেয়া। তারপর সেখানে বহুক্ষণ বসে রইলাম, যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। সিগারেটও সব শেষ।

প্রথম কিছুক্ষণ চুপ করেই ছিলাম সবাই। একটু বাদে শেখর বললো, মন্দ লাগছে না কিন্তু। এখন শরীরটাও একটু ভালো লাগছে। এ ঘরটায় বেশ আলো–হাওয়া আছে। হ্যারে সুনীল, জেলটেল হবে নাকি রে আমাদের ?

আমি বললুম, কী জানি !

—জেল হলে চাকরিটা যাবে ! একদিনের জেল হলেও চাকরি যায় শুনেছি। তোর অবশ্য ভয় নেই, তোর তো জামাইবাবুর অফিস !

আমি হাসলুম। তারপর বললুম, যদি জেল কারুর হয়, তা হলে বীণার হবে।

—কেন, বীণার কেন ? ওর কি দোষ ?

—ওর কোনো দোষই নেই। সেই জন্যই তো। একজনের অপরাধে আরেকজন শাস্তি পায়, তাই তো পৃথিবীর নিয়ম।

—কিন্তু দোষটা কি ?

—তা কে জানে !

—ভাগ্যিস অবিনাশ ঠিক সময় ছেলেটাকে নিয়ে গিয়েছিল !

—তা যাই হোক না, বীণার অন্তত কয়েক বছর জেল কেউ আটকাতে পারবে না।

বীণা চেষ্টা করেও হাসতে পারলো না। শেখর আবদুল হালিমের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনাকেই মিছিমিছি এতদূরে চলে এসে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে হলো। বেশ তো ছিলেন ঢাকায় !

আবদুল হালিমের চোখ মুখ কোণঠাসা বিড়ালের মতন। তবু চেষ্টা করে হেসে বললো, না, তা কেন, আমার তো ইয়ে, স্ত্রীর ব্যাপার, আমার তো দায়িত্ব আছেই। আপনারাই বরং মিছিমিছি নিজেদের এতে জড়িয়েছেন। এখন কী বিপদ হয় দেখুন !

শেখর উদাসভাবে বললো, আমাদের আর বিপদ কি হবে ? জেলখাটার মধ্যে বিপদের কি আছে ? কি রে সুনীল ?

আমি বললুম, তুই যাই বলিস্, আমার একটু যে ভয় ভয় করছে—সেটা আমি স্বীকার করতে

বাধ্য। একটা মান-সম্মানেরও ব্যাপার আছে তো ! নূরজাহান হঠাৎ গুম মেরে গেছে, আবদুল হালিমের গা ঘেঁষে বসে আছে। একবার আবদুলকে ও ফিসফিস করে কি যেন বললো। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আবদুলও শেখরকে কাছে ডেকে ফিসফিস করলো। শেখর আবার দরজার কাছে পাহারাদারকে ডেকে ফিসফিস করে বললো সেই কথা। পাহারাদার জোরেই উত্তর দিল, এখন চুপ করে থাকতে বলুন। এখানে মেয়েদের বাথরুম নেই !

শুনে আমার মনে হলো, মেয়েদের বাথরুম আর ছেলেদের বাথরুম আলাদা লেখা থাকে বটে, কিন্তু ভেতরটাও কি আলাদা ? কি জানি, আমি কখনো মেয়েদের বাথরুমের ভেতরটা কী রকম হয়, দেখি নি।

আরও খানিকটা পর করিডোরে নালপরানো জুতোর শব্দ হলো। যেন বহুক্ষণ ধরে বহুদূর থেকে একটা লোক হেঁটে আসছে। তারপর একজন জমাদার এসে আমাদের ঘরের সামনে দাঁড়ালো। দরজা খুলে বললো, সুনীল গাঙ্গুলী কিস্‌কা নাম ? আইয়ে হামারা সাথ।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। প্রথমেই আমার ডাক ? কেন ? ওরা সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। শেখর জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার রে ? আমি বললুম, গিয়েই দেখা যাক্ ! বেরিয়ে এলাম। লোকটা খপ করে আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে নিয়ে চললো। আমি বললাম, হাত ছাড়ো না, এমনিই যাচ্ছি। লোকটা শুধু একবার তাকালো, কিন্তু হাত ধরেই নিয়ে চললো।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে একের পর এক ঘর পেরিয়ে একটা জায়গায় এসে থামলাম। ঘরের মধ্যে টেবিলের সামনে বসে থাকা লোকটিকে দেখে আমার চমকে ওঠা উচিত হয় নি। একথা তো আমার আগেই মনে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু আমি একবারও এ সম্পর্কে ভাবি নি। যমুনার বাবা জগদীশ রায় আমাকে একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, বোসো।

তারপর আর কোনো কথা নেই। ইনডেক্স লাগানো একটা মোটা ফাইলের পাতার পর পাতা উল্টে যেতে লাগলেন। টেবিলের পাশে আরেকজন লোক মুখ নিচু করে খসখস করে কি লিখে যাচ্ছে, জমাদারটা তখনো নিঃশব্দে পিছনে দাঁড়িয়ে। শুধু দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ। বসে থাকতে খুবই অস্বস্তি লাগতে লাগলো। দু'একবার উসখুস করলুম, কারুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। জগদীশ রায় একবার মুখ না তুলেই জমাদারকে বললেন, ফরেনার্স এনটি ফাইলটা নিয়ে এসো। জমাদার বেরিয়ে গিয়ে একটু বাদেই ফাইল নিয়ে ফিরে এলো। ফাইলটা সে আস্তে টেবিলের ওপর রাখতেই সেইরকম মুখ না তুলেই তিনি বললেন, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। আজ আর রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারবো কি না, কে জানে। একটা টেলিফোন করে দিলে হতো। একটু নড়েচড়ে বসে সঙ্কোচ কাটিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, কাকাবাবু, এখান থেকে একটা টেলিফোন করা যাবে ? বাড়িতে একটা খবর দেবো।

জগদীশ রায় ঠাণ্ডাভাবে চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। কোনো উত্তর নেই। টেবিলের অন্য লোকটিও অবাক হয়ে একবার চেয়ে দেখে আবার লিখে যেতে লাগলো। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে কোনো উত্তর দেয় না, শুধু চোখের দিকে তাকায়—সব পুলিশের লোকেরই এই স্বভাব দেখছি। টেলিফোন করার সাহস হলো না। আবার বসে বসে দেয়াল ঘড়ির টকটক শব্দ শুনতে লাগলুম।

খানিকটা বাদে অন্য লোকটি বললো, হয়ে গেছে, স্যার। জগদীশ রায় তার হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে মনোযোগ দিতে পড়তে লাগলেন। আমি বুঝতে পারলুম, আমাকে অপেক্ষা করিয়ে করিয়ে অসহিষ্ণু আর নার্ভাস করে দেবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এমন কী ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য এতো উদ্‌যোগ-আয়োজন ! এদের এতো গাম্ভীর্য ও পারিপাট্য দেখলে মনে হয় যেন পৃথিবীর অস্তিত্বই এখন ওদের ওপর নির্ভর করছে।

—ঠিক আছে আপনি যান !—জগদীশ রায় সেই লোকটিকে বললেন। লোকটি উঠে, কাগজপত্র গুছিয়ে কলমটা পকেটে ভরে, বেরিয়ে যাবার সময় জগদীশ রায় আবার বললেন, মিঃ সোম, আপনি আমার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবেন তো !

এবার খালি ঘরে আমরা মুখোমুখি। আমার বুকের মধ্যে একটু গুরগুর করতে লাগলো। যদিও জানি, কোনো অপরাধ করি নি, কিন্তু জগদীশ রায়ের চেহারায় এমন ব্যক্তিত্ব আছে যে, এসব লোককে পথেঘাটে দেখলে কিছুই মনে হয় না—কিন্তু ওদের টেবিলের উল্টো দিকে বসলে ভয় করে।

তখনো কোনো কথা না বলে উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। একটুক্ষণ ঘুরে একেবারে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি মুখ তুলে তাকালাম। ওঁর মুখটা থমথমে হয়ে আছে। মেঘ ডাকার মতন ভারি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে তুমি কি করছিলে ?

গলার আওয়াজে সত্যিই খানিকটা ভয় পেয়ে আমি বললাম, আপনাকে আমি সত্যি ঘটনাটা বলছি। গোড়া থেকে...

—তোমার কাছ থেকে আমি কোনো ঘটনা শুনতে চাই না। তুমি ওখানে কি করছিলে ?

—সবটা না বললে কি করে বোঝাবো ? মানে, আমি...

—আমার কথার জবাব দাও ! ঐ নোংরা জায়গায় তুমি গেলে কি করে ? নাকি প্রায়ই যাও?

আমি তবু দুর্বলভাবে বলার চেষ্টা করলুম, না, ব্যাপারটা শুনুন, মানে আমি... । তিনি আবার ধমকে বললেন, এক কথায় উত্তর দাও ! এ জঘন্য জায়গায় তুমি উপস্থিত ছিলে কী করে ?

অনেকদিন কারুর কাছ থেকে ধমক শোনার অভ্যেস নেই। তাছাড়া ও জিনিসটা খানিকটা আমার অ্যালার্জির মতন, শুনলেই অজান্তে শিরা-উপশিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আমি খানিকটা দৃঢ়ভাবে বললুম, কোনো জায়গাই তো জঘন্য নয়।

দাঁতে দাঁত ঘষে জগদীশ রায় বললেন, রাস্কেল, তোমাকে আমি জেলে পুরবো ! সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিরাট জোরে আমাকে একটা থাপ্পড় মারলেন। সারা গাল জুড়ে সেই চড়, আমার মুখটা বেঁকে গেল। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, একি, আপনি আমাকে বিনা দোষে মারছেন কেন ?

—বিনা দোষে ? উঃ, এখনো মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরুচ্ছে। সব গুণই আছে দেখছি!

এ কথা শুনে আমার হাসি পাবার কথা। গত সাতদিনে আমি এক ফোঁটা খাই নি, অথচ উনি আমার মুখে ভক্‌ভকে গন্ধ পেলেন। একেই বলে নিয়তি ! ওঁর প্রচণ্ড থাপ্পড়ে আমার সমস্ত মুখে জ্বালা করছে। তবু আমি অনুনয়ের মতো স্বরে বললুম, কাকাবাবু, আপনি ভুল শুনেছেন...

—ডার্টি সোয়াইন, স্কাম, স্কাউন্ড্রেল, তুমি আমার বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকেছিলে, এতো সাহস—টেবিলের ওপর থেকে একটা কালো রুল তুলে নিয়ে তিনি আমাকে মারতে এলেন। আমি ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যতায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিলুম। আত্মরক্ষার জন্য সরে যাবারও সময় পাই নি। উনি আমার কলারটা চেপে ধরে সপ্‌সপ্ করে মারতে লাগলেন।

যন্ত্রণায়, রাগে আমার শরীর বেঁকে যাচ্ছিল, চোখে অন্ধকার দেখছিলুম। আমি হাত দিয়ে ওঁর রুলারটা চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, পারা গেল না। আমি টেবিলের ওপাশে ঘুরে গিয়ে চট করে একটা ভারি পেপার-ওয়েট তুলে নিলাম। তারপর প্রতিটি শব্দকে বিশ্বাস করে উচ্চারণ করে বললাম, খুন করে ফেলবো! আরেকবার মারতে এলে আপনাকে আমি খুন করে ফেলবো ! আমাকে চেনেন না, আমি বাঙাল, খুন করে ফাঁসিতে যেতেও আমার আপত্তি নেই !

দু'জনে চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলাম। জগদীশ রায়ের মুখে রাগ ছাড়া সামান্য

একটা দুঃখের চিহ্ন দেখা গেল। আমি হিংস্রভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। আর এক পা এগোলে আমি যে পেপার ওয়েটটা ওঁর কপালে ছুঁড়ে মারবো, সে সম্পর্কে কোনো ভুল নেই। ঈষৎ ভাঙা গলায় জগদীশ রায় বললেন, তুমি আমার সংসারেও সর্বনাশ করতে এসেছিলে, তোমার এতো সাহস ! তুমি আত্মীয় সেজে বাড়িতে ঢুকেছিলে—

—আপনার কী সর্বনাশ আমি করেছি ? আমি শুধু নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম—

আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম জগদীশ রায়ের দিকে। ওঁর কপালের দুটো শিরা ফুলে গেছে। সমস্ত মুখের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও হতাশা মাখানো। যেন ওঁর কি একটা বিষম বিপদ হয়ে গেছে। একবার আমার মনে হলো যমুনার মায়ের অসুখ খুব বেশি হয় নি তো ? না, তাহলে এতো রাত পর্যন্ত উনি থানাতেই বা থাকবেন কেন ? আমার সারা শরীর জ্বলছে।

—তুমি আমার মেয়েকে অপমান করতে গিয়েছিলে ! নষ্ট, কুলাঙ্গার, কত কিছু আশা করেছিলাম তোমার সম্বন্ধে। আর তুমি এদিকে কতগুলো গুণ্ডা, বেশ্যা আর স্পাইয়ের সঙ্গে মিশে—উচ্ছন্নে গিয়ে বসে আছো ! আমার মেয়ের বোকামির সুযোগ নিয়ে—

—কি করেছি আপনার মেয়েকে ?

—তুমি যমুনার সর্বনাশ করতে গিয়েছিলে ?

—মিথ্যে কথা !

—ঐটুকু একটা ফুলের মতন মেয়ে, তুমি এতো বড় পাজি, তার—

—মিথ্যে কথা ! মিথ্যে কথা ! আমি চেঁচাতে লাগলুম, আমার দম আটকে আসতে লাগলো, তবু প্রাণপণে মনে হলো, একবার রুখে দাঁড়ানো উচিত, জীবনে একবার অন্তত সমস্ত শরীর দিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত। আমি চিৎকার করতে লাগলুম, মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।

—সরস্বতী যা বলেছে, তা যদি সত্যি হয়, আমি তোমাকে সারা জীবন জেলে পচাবো।

সরস্বতীর নামটা শুনে আমি যেন হতভম্ব হয়ে গেলুম। সরস্বতীর কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। আবার ঐ নাম শুনে আমার শরীর অবশ হয়ে এলো। আমি ক্লান্তভাবে পেপার ওয়েটটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বললুম, সরস্বতী ! ওঃ ! আপনি আমাকে জেলেই দিন ! আমি আর পারছি না !

খবর পেয়ে বড় জামাইবাবু সেই রাত্রেই আমাকে জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। শেখরেরও জামিনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের নামে কোনো মামলা ওঠে নি। অবিনাশের বুদ্ধিতে ও কৃতিত্বে ব্যাপারটা বেশ সহজেই মিটে যায়। অবিনাশ অজয়কে হাত করেছিল এবং সেই বাচ্চা ছেলেটা ইন্দ্রজিৎ, অবিনাশের এমন ভক্ত হয়ে পড়ে যে, সে কিছু স্বীকার করতে চায় না, বারবার শুধু বলে যে অবিনাশের সঙ্গে সে সন্ধেবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিল এবং তারপরও অবিনাশ ওকে কয়েকদিন বেড়াতে নিয়ে যায়। সুতরাং ছেলে–চুরির কোনো কেস্ উঠতে পারে নি।

আবদুল হালিম আর নূরজাহান দু'জনেরই পাকিস্তানের পাসপোর্ট কিন্তু ভিসার ব্যাপারে কি একটা গণ্ডগোল ছিল, সেইজন্য পুলিশ ওদের কিছুদিন অন্তরীণ করে রাখে। সেই অবস্থায় নূরজাহান একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পারে নি। কিছুদিন পর ছাড়া পেয়ে ওরা দু'জনে ফিরে চলে যায়। বীণা সেই ঘর ছেড়ে দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

বেশ কয়েকদিন পর অরুণের ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন খেতে এসে সব বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা হয়। আমার শরীরের ব্যথা মরে গেছে, শেখরের স্বাস্থ্য ফিরেছে, সুবিমল একটা

উপন্যাস লিখে প্রকাশককে গছাতে পেরে বেশ খুশি। আমাদের সকলেরই দাড়ি কামানো, ফর্সা পোশাক পরা, উজ্জ্বল মূর্তি। পৃথিবীতে কোথাও কোনো গ্লানি নেই। মাঝখানে বড় জামাইবাবুর সঙ্গে আমার একটা ঝগড়া বাধবার উপক্রম হয়েছিল এবং আমাকে চাকরি ছাড়িয়ে দেবেন বলে ভয় দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বড়দিকে খোশামোদ করে একমাস সময় চেয়েছিলাম, এই একমাস আমি বিশ্বসংসার ভুলে এমন উঠে পড়ে অফিসে কাজ করেছি যে, বড় জামাইবাবুর মন না গলে পারে নি। কারণ এর মধ্যে তাপসের চাকরি যাওয়ায় ও আমার কাছে টাকা ধার করতে আসে—এবং ওকে দেখে চাকরি হারাবার বীভৎস রূপ বুঝতে পেরে—আমি নিজে চাকরি হারাতে কিছুতে রাজি হই নি।

এখন পৃথিবীতে কোথাও আর কোনো গ্লানি নেই। ম্যারাপ বাঁধা ছাদে নেমন্তন্ন খেতে বসে আমরা প্রবল হুল্লোড়ের সঙ্গে কাটলেট ও শোনপাপড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করি। ভিড়ের মধ্যে মনীষার সঙ্গে আমার দেখা হয়। মনীষাকে দেখে আমার চোখের একটি পাতাও কাঁপে না। মনীষা আন্তরিকভাবে আমার গায় গোলাপ জল ছিটিয়ে দিতে এলে, আমিও খুবই আন্তরিকভাবে হাসতে হাসতে ওর খোঁপা থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিই। জানি, মনীষার সঙ্গে আমার কখনো একা দেখা হবে না। কারুর সঙ্গেই আর একা দেখা হবে না !

বহু আত্মীয়স্বজনেরও ভিড় ছিল বলে আমরা বন্ধুরা অরুণের বাড়ি থেকে একটু আগেই বেরিয়ে আসি। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পান–সিগারেট খেতে খেতে খুব এলোমেলো আড্ডা হতে লাগলো। বিবাহিত বন্ধুরা এক একজন করে আস্তে আস্তে কেটে পড়তে থাকে। আমি সুবিমলের সঙ্গে ওর লেখা বিষয়ে কথা বলছিলুম, একটি ভিখিরি স্ত্রীলোক দু'তিনটে বাচ্চা নিয়ে বহুক্ষণ ধরে ঘ্যান ঘ্যান করছে। সুবিমল হঠাৎ পকেট উপুড় করে অনেকগুলো খুচরো সেই ভিখারিণীকে দিয়ে দিল। অবিনাশ তাই দেখে এগিয়ে এসে বললো, কি রে কি ব্যাপার, তুই হঠাৎ খাঞ্জা খাঁ হয়ে উঠলি যে ?

সুবিমল হাসতে হাসতে বললো, দ্যাখ্ আমি নিজেই ভিখিরি, আমার কাছেও কেউ ভিক্ষে চাইলে দিতে আমার ভালো লাগে। দু'তিনজনের সঙ্গে থাকলে, ভিখিরিরা সাধারণত আমার কাছে ভিক্ষেই চায় না। চিনে ফ্যালে। তাছাড়া, আজকের গুড টার্নটা সারা হয় নি।

—ভিক্ষে দেয়া বুঝি ভালো কাজ ?

—আমার খারাপ লাগে না !

—আমার তো গা জ্বলে যায়। সেদিন রাত্তিরে পার্ক সার্কাস দিয়ে—

—আহা বেচারারা থাক্ না। যে–যেমনভাবে বাঁচতে পারে।

—শোন্ না, সেদিন পার্ক সার্কাস দিয়ে আসছিলুম, পার্কের পাশে ভূত দেখলুম। একটা জ্যান্ত ভূত। একটা কালো কুচকুচে রঙের আধবুড়ো ভিখিরি প্লাস পাগল, হাঁটারও শক্তি নেই, উবু হয়ে বসে ঘষড়াতে ঘষড়াতে আসছে। আমার কি মনে হলো জানিস ? ওর বেঁচে থেকে কি লাভ ? রোজ একটু একটু করে মরা ? আমার হাতে দু'খানা ছবির ব্লক ছিল, বেশ ভারি জিঙ্ক ব্লক, ইচ্ছে হলো ওর মাথায় এক ঘা মারি, তাহলেই শেষ হয়ে যাবে ! কিন্তু ধরা পড়লে নিশ্চয়ই আমার নরহত্যার দায়ে ফাঁসি হতো ! ভেবে দ্যাখ্ ! মার্সি কিলিং জিনিসটা চালু হওয়া উচিত। ওকে মারলে ওর উপকারই করা হতো না ?

—ওর হয়তো উপকার করা হতো, কিন্তু তোর একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতো। তুই সারাজীবন আর ঐ লোকটাকে ভুলতে পারতি না।

—আমার ওসব বাজে সেন্টিমেন্ট নেই। রাস্তা ভর্তি এণ্ডিগেণ্ডি ভিখিরি দেখলে আমার এতো রাগ হয় ! এ রকমভাবে বেঁচে লাভ কি ? আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি কলকাতার সবক'টা

ভিখিরি মেয়েকে ধরে ধরে লুপ পরিয়ে দিতুম ! ঐ বাচ্চাগুলোর দিকে চেয়ে দ্যাখ, চিরকালই ভিখিরি থাকবে, ওদের জন্মে লাভটা কি ?

—ওরকম নিষ্ঠুরের মতোন কথা বলিস্ কেন ? নতুন ভিখিরির জন্ম বন্ধ করতে পারলে ভালোই, কিন্তু যারা জন্মে গেছে, তারা থাক্ না, আহা !

আমি বললুম, সত্যিই অবিনাশটা মাঝে মাঝে একেবারে দয়ামায়াশূন্য হয়ে যায়। ভিখিরি হোক আর যা-ই হোক, ঐ বাচ্চা মেয়েগুলো—মুখে কেমন সরল সরল ভাব—ওদের দেখে তোর মেরে ফেলার ইচ্ছে হলো ?

অদ্ভুত ধরনের হেসে অবিনাশ বললো, বাচ্চা মেয়ে দেখলেই সুনীলের দয়ামায়া উথলে ওঠে। তোর সেই বাচ্চা মেয়েটার খবর কি ? বেশ ভালো মাল ছিল—

মুহূর্তে আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। আমি ক্রূর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, অবিনাশ, তুই খবরদার ঐ মেয়েটা সম্পর্কে এরকমভাবে কথা বলবি না !

একটু থতমত খেয়ে অবিনাশ কিছুটা পাংশু হয়ে যায়। তারপর দুর্বলভাবে বলে, আহা রাগ করছিস কেন ? খারাপটা কি বললুম, হাওড়া ব্রিজের পাশে ফুলের হাটে গিয়ে দ্যাখ, ওরা ফুলকেও মাল বলে। গাদা করা রজনীগন্ধার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, এ মালটা আজ কতো করে ডজন ? ফুলেরই যখন এই নাম।

আমি বললুম, থাক্ থাক্ হয়েছে। তারপর মনে পড়তেই আমি সুবিমলকে জিজ্ঞেস করলুম, তুই যে তোর পাড়ার সেই মেয়েটিকে বিয়ে করবি বলেছিলি, তার কি হলো ?

—আরে, আমি তো বিয়ে করতে রাজিই ছিলুম। কিন্তু মেয়েটার বাবা কুষ্ঠি মেলাতে চায়, জাত নিয়ে খুঁতখুতুনি। তারপর মেয়েটা ওর গানের ইস্কুলের এক নমঃশূদ্র মাস্টারকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে। এখন বুঝুক ঠ্যালা।

—যাক্, বাঁচা গেছে।

—কিন্তু, আমি আগামী মাসে একটা চাকরি পাচ্ছি, জানিস।

—তাই নাকি ? সেইটা ? তাহলেও আমাদের গ্রুপের ব্যালেন্স ঠিকই রইলো। তুই চাকরি পেলি আর তাপসের চাকরি গেল।

অবিনাশ উদ্‌গ্রীব হয়ে বললো, চাকরি পাচ্ছিস্ ? সেলিব্রেট কর্ ! চল্, এখন কোথাও গিয়ে বসা যাক!

—এখন মাসের শেষে আমি টাকা পাবো কোথায় ? জয়েনই করি নি। কেউ ধার দে।

— বিমলেন্দুর কাছে যা না।

—বিমলেন্দু আর শেখর দূরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। বিমলেন্দুর কাছে সুবিমল গিয়ে টাকা চাইতেই ও অবাক হয়ে গেল। বললো, এখন আবার কি খাওয়া ? এই তো নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম?

অবিনাশ বললো, দূর, দূর, আজকাল নেতন্তন্ন খেয়ে পেট ভরে নাকি ? তাছাড়া ও খাওয়ার কথা কে বলছে ?

বিমলেন্দু গম্ভীর হয়ে বললো, ও তোমরা সব খেতে যাবে, তার জন্য আমি টাকা দেবো ? মোটেই না। আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।

অবিনাশ হাসতে হাসতে বললো, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কী আছে ? টাকা চাইছি থাকলে দিবি, না থাকলে দিবি না।

—থাকলেও দিতুম না। ওসব খেলো বোহেমিয়ানিজমের জন্য টাকা খরচ করা আমি খুব অপছন্দ করি। আমাকে দ্যাখ না, আমিও লেখাপড়া শিখেছি, চাকরি করছি, বিয়ে করে সংসার পেতেছি, সাহিত্যশিল্প বুঝি, জীবন সম্বন্ধেও আমার অভিজ্ঞতা তোদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু

আমার তো মদ খাওয়ার দরকার হয় না।

সুবিমল ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, বিমলেন্দু, তুই খুব ভালো, নমস্য লোক, কিন্তু সবাই কি একরকম হয় ? তুই বল না—

জড়িয়ে ধরার ছুতো করে সুবিমল আসলে বিমলেন্দুর পকেট থেকে টাকা তুলে নেবার চেষ্টা করছিল। বুঝতে পেরে মোটা চেহারার বিমলেন্দু ঝটকা মেরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বললো, এই, কী হচ্ছে কি ! তোদের সব গেছে দেখছি !

সুবিমল কাতরভাবে বললো, সত্যি ভাই, সবই গেছে। দে না তিরিশ টাকা ! খুব তো জমাচ্ছিস। শুনলুম সল্ট লেকে জমি কিনবি—

—বেশ করবো। তোদের টাকা দিয়ে বাজে খরচ করবো কেন ? যত রাজ্যের মাতাল কোথাকার—

—হাৎ তেরি ! কে কে আসবি আয়—। অবিনাশ একটা চলন্ত বাসের দিকে ছুটে যায়। দল থেকে আমরাও কয়েকজন গিয়ে টপাটপ উঠে পড়ি।

এসপ্লানেডে এসে দেখা যায় ছ'জন। তার মধ্যে তাপস নামতে চায় না, তাকেও জোর করে নামানো হলো। একটা দোকানে ঢুকে এক রাউন্ডের অর্ডার দেবার পর, শেখর খুব উদ্ভাসিত মুখে বলে, অনেক দিন পর এলাম। বেশ ভালো লাগছে আজ। আয়, একটা কোরাসে গান ধরা যাক্।

সুবিমল বললো, দাঁড়া, আগে কিছু পেটে পড়ুক।

নূরুল বললো, উঁহু, গান করবেন না, গান শুরু করলে পাশের টেবিল থেকেও গান ধরবে, তখন সেটা আমাদের পছন্দ হবে না। আমরা যা করি, অন্য লোকেরাও যদি সেটা করে, তখন সেটা আমাদের সহ্য হয় না।

আমি নূরুলকে বললুম, আপনি নিজেকে সবসময় অন্যের চেয়ে আলাদা মনে করতে চান কেন?

নূরুল বললো, ঐটুকু ভুল ধারণার জন্যেই তো বেঁচে থাকা।

সুবিমল নূরুলকে একটা খোঁচা দিয়ে পাশের টেবিলের একটা মোটা লোককে দেখিয়ে বললো, তোর ধারণা ঐ লোকটা গান গাইবে ?—আমরা সবাই আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম। সত্যি, লোকটাকে দেখলে হাসি পায়। বিশাল মোটা চেহারা, কোটের এখানে সেখানে ঝোল লেগেছে, চুলগুলো কপালে, অত্যধিক নেশায় লোকটার মুখের রং মেটে সিঁদুরের মতন। টেবিলে শুধু একা ও বসে আছে, টেবিলে ছড়ানো খাবারের প্লেট আর সোডার বোতল, অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছে নিজের গেলাসে। আর একটা খালি গেলাসে ওর এক গাদা বিল জমা করা।

শেখর বললো, আহা, লোকটা খুব দুঃখী। একা কেউ মদ খেতে আসে ?

নূরুল লোকটার দিকে ফিরে বললো, দাদা, একখানা গান গাইবেন নাকি ?

লোকটা চোখের পাতা উল্টে পুরো দু'টি পাকা লিচুর মতন লাল চোখ দেখিয়ে বললো, এসো, এসো ব্রাদার, গান হবে, নাচ হবে, ফুর্তি হবে ! নূরুল বললো, একটু ফুর্তি হোক না আজ !

লোকটা মাথা ঘুরিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টায় উচ্চারণ করলো, ব্র-উ-উ, ব্র-উ-উ—

আমি নূরুলকে বললুম, সরে আসুন, সরে আসুন, বমি করবে !

তিন রাউন্ড হুইস্কি খাবার পর, সুবিমলই প্রথম খেয়াল করলো, আমাদের বিল দেবার মতন পয়সা আছে কি না। কারুর পকেটেই বিশেষ টাকা নেই, সুবিমল আর তাপস নিঃস্ব, বাকি আমাদের প্রত্যেকের পকেটে চার-পাঁচ টাকার বেশি না। সবেমাত্র জমে উঠেছে, এর মধ্যেই শেষ করতে হবে, তাছাড়া দামও মেটানো যাচ্ছে না। অবিনাশ বললো, দাঁড়া, এখানে আমার চেনা আছে, আমি ম্যানেজারকে বলে ধারের ব্যবস্থা করছি !—উঠে গিয়ে একটু বাদেই অবিনাশ

অপমানিত মুখে ফিরে এলো। বললো, দিলো না ! শালা আমায় চিনতেই পারলো না। শালার উচিত শ্মশানের পাশে গিয়ে ব্যবসা করা, তা না, চৌরঙ্গিতে দোকান ফেঁদেছে। একদিন এমন শিক্ষা দেবো !

সুবিমল বললো, এ বিলগুলোর কি করবি ?

অবিনাশ বললো, কিছু না হয়, বিল না দিয়েই স্রেফ বেরিয়ে যাবো। আমরা ছ'জন যদি রুখে দাঁড়াই, তবে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে—কলকাতা শহরে এমন কেউ আছে ?

তাপস জিজ্ঞেস করলো, তবে আমরা সকলের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়াচ্ছি না কেন বল তো ?

আমি বললাম, এক কাজ কর না !— বলে, পাশের টেবিলের দিকে ইশারা করে চোখ টিপলাম। অবিনাশ হাসলো এবার ! এ জিনিস আমরা আগেও দু'চারবার করে ফল পেয়েছি। পাশের টেবিলের মোটা লোকটা একটু আগেই থপ্ থপ্ করে টলতে টলতে বাথরুমে গেছে। অবিনাশ এদিক–ওদিক তাকিয়ে চট করে একটা বিল পাশের টেবিলের গেলাসের মধ্যে রেখে দিল। তারপর আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলুম।

লোকটা আবার ফিরে এলো। ওর গেলাস থেকে সব বিল তুলে তাসের মতন হাতে ছড়ালো, মনে মনে কি গুনলো কে জানে, চেঁচিয়ে ডাকলো, বেয়ারা ! বেয়ারা আসতেই তার হাতে বিলগুলো দিয়ে বললো, জোড়ো, কিৎনা হুয়া ! বেয়ারাটা গুনতে গুনতে একবার অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকালো। এখানে ছ'জোড়া চোখ ওকে ভস্ম করে দেবার মতন চেয়ে আছে ! চোখ ফিরিয়ে বেয়ারাটা বললো, আটাত্তর রূপিয়া ! মোটা লোকটা মুচকি হেসে বললো, ঠিক ! আমার ঠিক হিসেব আছে! কত ? আটাত্তর ? আটাত্তর ? আট দশকে আশি। ঠিক।

লোকটা পকেট থেকে এক তাড়া দশ টাকার নোট বার করে, আটখানা নোট বার করে বললো, জলদি ট্যাক্সি ডাকো !

আমরা বড় নিঃশ্বাস ছাড়লুম। বেয়ারাটাও নিশ্চয়ই টাকা দশেক আরও বাড়িয়ে বলেছে। ওরও কিছু হলো, আমাদেরও কিছু হলো ! লোকটার টাকার তাড়ার দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে অবিনাশ ফিসফিসিয়ে বললো, ইস্, আর কয়েকখানা যদি খসানো যেত।

সুবিমল বললো, বেশি লোভ করিস না। যা পাওয়া গেছে, তাই যথেষ্ট।

অবিনাশ বললো, ওর আর কি ! চেহারা দেখলেই, বোঝা যায় ব্ল্যাক মানি, ওর তো খরচ করাই সমস্যা।

বাইরে বেরিয়ে অবিনাশ অস্বস্তিতে নিশপিশ করতে লাগলো। ইস্, মাত্র দশটা বাজে, এর মধ্যেই শেষ! আর একটু না খাবার কোনো মানে হয় ? তোদের ইচ্ছে করছে না ?

স্বীকার করতেই হলো, আমাদেরও ইচ্ছে আছে। কিন্তু উপায় কি ? যা টাকা আছে, তাতে বাইরে থেকে একটা বোতল কিনতে গেলেও কুলোবে না। সুবিমল বললো, কোথায় ধার পাওয়া যায় বল্ তো ?

কারুরই কোনো উত্তর জানা নেই। সবেমাত্র শরীরটা চাঙ্গা লাগছে, এখনই দল ভাঙতে যদিও কারুর ইচ্ছে হচ্ছে না। জানবাজারের পানের দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দু'বোতল দিশি খাওয়া হলো। তবু তৃষ্ণা মেটে না। এতদিন পর বন্ধুবান্ধবরা সব একসঙ্গে মিলেছি। সত্যি ভালো লাগছে। মরিয়া হয়ে সুবিমল বললো, চল্ পার্ক স্ট্রিটের ঐ দোকানটায় যাই। ওখানে চেনাশুনো কারুকে পাওয়া যেতে পারে !

—কাকে পাওয়া যাবে, যে আমাদের ছ'জনকে খাওয়াবে ?

—চল না, আমার দু'একজন চেনা আছে, যদি পাওয়া যায় !

হাঁটতে হাঁটতে পার্ক স্ট্রিটে চলে এলাম। সে দোকানেও কারুকে চেনা পাওয়া গেল না। পার্ক

স্ট্রিটের মুখে ফিরে এসে, আমরা ছ'জন বিষম চঞ্চল হয়ে উঠলুম। ছ'জনের মধ্যে কারুর সাহস নেই মুখ ফুটে বলে, তাহলে চল্, বাড়িই ফেরা যাক্ ! সঙ্গে সঙ্গে সে কাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। বারবার ব্যর্থ হয়ে অবিনাশ খুব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল, বললো, তোরা একটা জায়গা ভাবতে পারছিস না, যেখানে ধার পাওয়া যায় ? হোপলেস্ !

শেখর বললো, দ্যাখ না, আমার ঘড়িটা নিয়ে যদি কিছু হয়।

সুবিমল বললো, না, না, ওসব ঝামেলায় যাবার দরকার নেই। তার চেয়ে আয় ভিক্ষে করা যাক।

অবিনাশ দাঁত খিঁচিয়ে বললো, এটা একটা জন্ম-ভিখিরি ! ভিক্ষে করে গাঁজা খাওয়ার পয়সা উঠতে পারে, কিন্তু মদ খাওয়ার পয়সা উঠবে ?

—দ্যাখ্ না !

ট্রাফিকের লাল আলোয় অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়েছে, সুবিমল সেদিকে হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে একটা গাড়ির লোকদের সঙ্গে কি কথা বলতে লাগলো। একটু বাদেই হাসতে হাসতে হাত উঁচিয়ে ফিরে এলো, ওর হাতে পতাকার মতন উড়ছে একটা পাঁচ টাকার নোট। আমরা দু'তিনজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলুম, কী করে পেলি, কেউ চেনা ছিল ?

সুবিমল বললো, চেনা-ফেনা কেউ না। স্রেফ ভিক্ষে চাইলুম। ইংরেজিতে বললুম, ভদ্দরলোকের ছেলে, টাকা হারিয়ে গেছে, ট্রেনে ডায়মন্ড হারবারে ফিরতে হবে—ব্যস্ দিয়ে দিল !

আমরা হৈ-চৈ করে উঠলুম। অবিনাশ বললো, আচ্ছা আমি দেখি তো ! অবিনাশও ছুটে গেল একটা গাড়ির দিকে। একটু বাদে ফিরে এলো আধা খুশি হয়ে, ও তিন টাকা পেয়েছে। সুবিমল বললো, দেখলি ! ভিক্ষে হচ্ছে এ দেশের একমাত্র সৎ জীবিকা ! দেখলি তো !

গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক করে নিলুম পার্ক স্ট্রিটের এখানে ট্রাফিকের আলোয় অনেকক্ষণ গাড়ি থামে, প্রত্যেকবার লাল আলোয় এক একজন করে যাবে। এক সঙ্গে সবাই গেলে সন্দেহ করবে। ভিক্ষে চাইতে হবে ইংরেজিতে—কেননা, এখন যারা গাড়িতে ফিরছে, তারা ইংরেজি না শুনলে খুশি হয় না। তাপস আপত্তি তুললো—। অবিনাশ এক ধমক দিয়ে বললো, দেখুক না ! ভিক্ষে চাইবি তাতে লজ্জার কী আছে ? তোর চাকরি নেই—তোরই অফিসের লোকের ভয়।—শেখর কিন্তু বললো, আমি বনেদি বংশের ছেলে, আমি ভিক্ষে চাইতে পারবো না। আমি ঘড়ি বিক্রি করে দিতে রাজি আছি।

সুবিমল বললো, যা, যাঃ ! এখানে আমার চেয়ে বড় বনেদি বংশের আর কেউ নেই ! মৈমনসিং-এ আমাদের কত বড় জমিদারি ছিল অবিনাশকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ। অবিনাশরা আমাদের প্রজা ছিল !

অবিনাশ আদর করার মতো সুবিমলের থুতনি ধরে বললো, জমিদারি, না রাজত্ব ? রাজকুমার আমার, আহা, বড় ভালো ছেলে—মাঞ্চু মাঞ্চু—

যাই হোক, শেখর রাজি হলো না কিছুতেই। শেখরকে আমাদের ক্যাশিয়ার করা হলো। আমরা এক একজন ট্রিপ দিয়ে এসে শেখরকে টাকা জমা দিতে লাগলুম। আমি প্রথমবার গিয়ে পড়লুম, একদল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের গাড়ির সামনে ! ওরা পাত্তাই দিল না। সেটা ছেড়ে পরের গাড়িটায় চেষ্টা করতেই লাল থেকে সুবজ হয়ে গেল। খালি হাতে ফিরতে হলো আমায়। পরের বার একজোড়া সুখী চেহারার দম্পতির গাড়িকে ধরলুম, খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে, আমার একটু লজ্জা করছিল, তবু চোখে-মুখে যথেষ্ট কাতরতা ফুটিয়ে বললাম, বিলিভ মি স্যার, কমপ্লিটলি স্ট্র্যান্ডেড, উইল গো টু ডায়মন্ড হারবার, ফাইভ রুপিজ—। মহিলাটি হাত নেড়ে

বললেন, হবে না, হবে না ! পুরুষটি কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুক পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে দিলেন।

ওরা কিন্তু বেশ টাকা পাচ্ছিল। সুবিমল আর নূরুল যাচ্ছে আর চট্‌চট্‌ করে টাকা নিয়ে আসছে। অবিনাশটা নাছোড়বান্দা হয়ে দৌড়োচ্ছে পর্যন্ত অনেক গাড়ির সঙ্গে। ফিরে এসে অবিনাশ বলছে, এক এক সময় যা রাগ হচ্ছে না ! শালা, চোস্ত ইংরেজিতে ভিক্ষে চাইছে, তা–ও কিনা দু'একটা লোক দু'আনা, চার আনা দিতে আসে ! ইচ্ছে হয়, মুখে মারি একখানা স্কোয়ার কাট্‌ !

সুবিমল বললো, উঁহু, ওসব করিস্‌ না, অনেস্টলি ভিক্ষে করতে এসে আবার গুণ্ডামি কেন ?

আমাকে ওরা বললো, তুই একটা কোনো কম্মের না ! কিছুই পাচ্ছিস না ! যাঃ—।

আমি ছুটে গেলাম একটা মাড়োয়ারিদের গাড়ির সামনে, মুখের ভঙ্গি কাতর থেকে কাতর করে বললাম, কিছু দিন ! মেহেরবানি ! — সেবারও কিছু পেলাম না।

শেষ পর্যন্ত, ভিখিরি হিসেবে কে কতখানি কৃতিত্ব দেখাতে পারে তাই নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল আমাদের মধ্যে। শেখরের পকেট ভরে উঠতে লাগলো, আমি বারবারই ব্যর্থ হতে লাগলুম যদিও। আজ আমার কপালটা খারাপ। এত চেষ্টা করছি, কিছুই হচ্ছে না ! তিনজন সত্যিকারের ভিখিরি চেহারার ভিখিরি পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে কাণ্ডকারখানা দেখছিল আমাদের। শেখর হাসতে হাসতে আমাদের ফান্ড থেকে তিনজনকেই একটা করে টাকা দিয়ে দিল।

সুবিমল বললো, এক একটা গাড়ির মধ্যে যা সব দৃশ্য দেখছি না, ভিক্ষে চাইবো কি, হাঁ করে চেয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে। ঐসব দেখে ফেলার জন্যই অনেকে দিয়ে দিচ্ছে।

তাপস বললো, আমাকে তো একটা পাঞ্জাবি ছোকরা মারতেই এসেছিল জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছি বলে। দেখলুম, মেয়েটার—

অবিনাশ একটা গাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে এসে বললো, সুনীল, তুই যা, তোর টার্ন। ঐ নীল গাড়িটা—

অবিনাশ আমাকে ধাক্কা দিল, সেই ঝোঁকেই আমি ছুটে গেলাম, মুখের চেহারা খুবই করুণ করে তুলে। নীল গাড়িটার পাশে এসে কথা বলতে তখনো শুরু করি নি, দেখলুম জানালার পাশে যমুনা। সঙ্গে সঙ্গে আমি চট্‌ করে ফিরে এলাম। অবিনাশ যমদূতের মতন দাঁড়িয়েছিল কাছেই, বললো, চেষ্টা না করেই ফিরে এলি যে! যা! আমি বললুম, না, আমি এবার যাবো না। যা-না— বলে অবিনাশ আমাকে ঠেলে দিল আবার গাড়িটার কাছে। আমি কোনোক্রমে গাড়ির বডিতে হাত রেখে ঝোঁক সামলে নিলাম। যমুনা দেখতে পেয়ে বললো, একি সুনীলদা !

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে বললাম, যমুনা, তোমায় কতদিন পর দেখলুম । ভালো আছো?

গাড়িতে যমুনা ও সরস্বতী, আর একজন অচেনা বিবাহিতা নারী এবং একজন পুরুষ। যমুনা আজ আবার লাল রঙের পোশাক পরেছে, শরীরে সেই লাল আভা। পুরুষটি প্রশ্ন করলো, আপনি গাড়িতে উঠবেন ? সরস্বতী বললো, ড্রাঙ্ক ড্রাঙ্ক ! মুন্নি, কাঁচ তুলে দে।

যমুনা বললো, সুনীলদা, গাড়িতে আসবেন ? আসুন না !

আমি যমুনার দিকে খুবই স্নেহময় হাসি দিয়ে বললুম, যমুনা, আমার টাকা হারিয়ে গেছে, আমাকে পাঁচটা টাকা দাও তো ! গাড়িতে উঠবো না।

—পাঁচ টাকা তো নেই। এক টাকা আছে —

—মুন্নি, কাঁচ তুলে দে—

—না, আমার পাঁচ টাকাই চাই—

—মুন্নি, কাঁচটা তুলে দে না !

আর সময় নেই, আর সময় নেই এক্ষুনি লাল থেকে সবুজ হবে। মজার ব্যাপার এই, সরস্বতীও আজ পরেছে সবুজ শাড়ি, একেবারে মিলে যায় দেখছি। আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, ঠিক আছে যমুনা, তুমি একটা টাকাই দাও ! ওতেই হবে।

কিন্তু আর কথা শোনা গেল না, হুস করে গাড়ি ছেড়ে দিল। পেছন থেকে অসংখ্য গাড়ির হর্ন ; চাপা পড়ার ভয়ে আমি দৌড়ে ফুটপাথে উঠে এলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এবারেও টাকা পেলুম না। ভিখিরি হিসেবেও বন্ধুদের কাছে হেরে যাচ্ছি। ধুৎ !

সুবিমল বললো, কি রে, এবারও পেলি না ?

অবিনাশ বললো, পাবে না, জানতুম।

এইরকম ভাবেই দিনটিন কেটে যায় আর কি। মানুষের মুখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে তারও হাসিমুখ দাবি করি, অধিকাংশ মুখই ভাবলেশহীন। আকাশে যখন মেঘ থাকে না, তখন সব মানুষের মুখেই এক ধরনের নীলচে ছায়া পড়ে, সেই ছায়া দেখতে পেলে যে-কোনো অপরিচিত মানুষকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, কেমন আছেন ? কিন্তু সবাই প্রশ্ন করতেই চায়, কেউ উত্তর দিতে রাজি নয়। এ পর্যন্ত যে কত লোক আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন—কিন্তু কেউ উত্তর শোনার জন্য এক মুহূর্ত দাঁড়ায় নি। সুতরাং আমার বলতে ইচ্ছে হয়, আপনি যদি ভালো থাকেন, তাহলেই আমি ভালো আছি।

আমি নানারকম ভুল ভাঙতে ভাঙতে আরও নতুন নতুন ভুলের মধ্যে প্রবেশ করি। বেশ ভালো লাগে। বেঁচে থাকার মধ্যে ক্রমশই বেশি করে সুখ পাচ্ছি আজকাল। একটা কমলালেবু কিংবা চিনেবাদাম খেতে গিয়ে মনে হয়, এদেরও প্রাণ আছে, ফিসফিস করে ওরা বলে যায় আমাদের প্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখছি, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। না, অকৃতজ্ঞ হই নি, পৃথিবীর যাতে একটুও আঘাত না লাগে, এমন সন্তর্পণে মাটিতে পা ফেলি এখন।

যমুনার সঙ্গে আরও দু'বার দেখা হয়েছিল আমার। একবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মঞ্চে ও নাচতে এসেছিল। দূর থেকে দেখলুম ওকে, শরীরময় ফুলের গয়নায় অপ্সরী সেজেছিল। দেহের ভঙ্গিতে খানিকটা চটুলতা এসেছে, তা হোক, তবু সেই টিয়াপাখির মতন দৃষ্টি, পৃথিবীর রহস্য কিছুটা জেনে নিয়ে এখনও পৃথিবীকে নিজের রহস্য দেখাতে চায়। বুকটা সেদিন মুচড়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়বার দেখা হয় এয়ারপোর্টে, যমুনা তপনের সঙ্গে বম্বে যাচ্ছিল। ছোড়দি আর কল্যাণদা বিলেত যাচ্ছে বলে দমদমে আমিও গিয়েছিলাম। যমুনাদের দলে ওর বাবাও ছিল, কিন্তু আমি জগদীশ রায়কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গিয়ে আলতোভাবে যমুনার কাঁধ ছুঁয়ে বললাম, কেমন আছো ? যমুনা চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি ?

আমি কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করলে না ? তপন বললো, সত্যি এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, এক সঙ্গেই হলো কিনা ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, এক সঙ্গে মানে ? যমুনা বললো, মার খুব শরীর খারাপ বলে বাবা আমার আর দিদির একই দিনে বিয়ে দিয়ে দিলেন ! আপনি বম্বেতে এলে দেখা করবেন কিন্তু !

যমুনার হাসিটা খুব অন্যরকম সুন্দর লাগলো, আমিও সুন্দরভাবে হাসলুম। সেই রকম করেই জিজ্ঞেস করলুম, যমুনা, আমি কি রকম আছি, তুমি জিজ্ঞেস করলে না ? যমুনা বললো, আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়, আপনি ভালো আছেন।

তারপর একদিন সকালবেলা পরিতোষ আবার এলো। অভিমানমাখা মুখ। তখনো আমার খবরের কাগজ পড়া শেষ হয় নি, তৃতীয় কাপ চা খাওয়া হয় নি। ক্ষুব্ধ গলায় পরিতোষ বললো,

কাল আপনি কোথায় ছিলেন ?—আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলুম, কেন, শেখর আবার কাল রাত্রে বাড়ি ফেরে নি নাকি ? পরিতোষ বললো, না, কাল আপনাকে খুব খুঁজছিলাম, আপনাদের বাড়ির টেলিফোনটা বোধহয় খারাপ। আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু খুঁজছিলে কেন ?

—দাদা তো আবার একটা পাগলামি শুরু করেছে। কার কাছ থেকে শুনে এসেছিল যে, সাতদিন উপোষ করে প্রাণায়াম করলে কি সব নাকি অলৌকিক অভিজ্ঞতা-টভিজ্ঞতা হয়। তাই তিনদিন ধরে উপোষ করে ধ্যানে বসে আছে। কাল রাত্তির থেকে দেখা যাচ্ছে টলে টলে পড়ে যাচ্ছে। জ্ঞান নেই, কিরকম যেন আচ্ছন্ন অবস্থা। কি সব কাণ্ড বলুনতো আপনাদের ! যাই হোক, মা আপনাকে খবর দিতে বললেন।

—তিন দিন ধরে না খেয়ে আছে কী করে ?

—সেই তো। যত সব সিলি ব্যাপার ! মায়ের ধারণা আপনি গিয়ে বললে হয়তো খাবে।

—ডাক্তার ডাকলেই পারতে ! আমি গিয়ে কি করব ? যাক্‌গে, ও বোকা ছেলে নয়, সেরকম খিদে পেলে ঠিকই খাবে। সামনে কয়েকটা সন্দেশ আর এক গ্লাশ শরবত রেখে দাও না। এক সময় টপ করে খেয়ে ফেলবে ঠিক।

—আপনি আসবেন না ?

— দুপুরে অফিস থেকে টেলিফোন করে খবর নেবো আমি। যদি শুনি তখনো খায় নি, তাহলে বিকেলের দিকে যাবো। মাকে বলো, ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।